ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

চক্ষুদান

বা

সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য।

(প্রথম সংস্করণ।)

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

কঠোপনিষৎ ।৩।১৪।

(উঠ, জাগ, সদ্গুরু লাভ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে নিজের সত্য স্বরূপ অবগত হও।)

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৪।

(বলহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।)

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।২।৩।

(হে অর্জ্জুন, দুর্ব্বল হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে; হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া উঠ।)

ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
ব্রহ্মচারী ওঙ্কার নাথ।

সন ১৩৩৪ সাল।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না দ্বারা মুদ্রিত।
মিত্র প্রেস
৩১।১নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
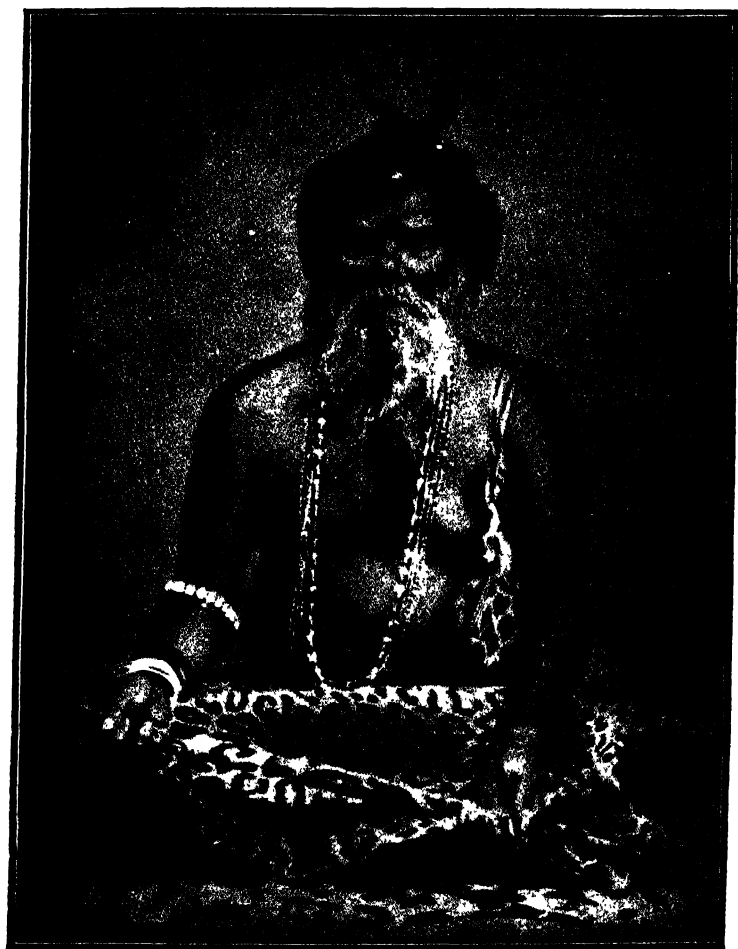
শ্রীমন্নিত্যানন্দ চৈতন্যঘন শ্রীসাধু মহারাজ।

আর্য্যঋষিকুল শ্রীসাধু আশ্রম, সন্দ্বীপ।

প্রার্থনা।

—:•:—

প্রাণের দেবতা, গুরো, বাপ হে আমার,
ভুলিব না এ জীবনে তোমার করুণা,
অযাচিত স্নেহরাশি—তাপিত এ প্রাণে
একই অমৃতধারা, শান্তি-পারাবার।

সে স্নেহেতে আত্মহারা হয় অগ্রসর
তোমার অযোগ্যতম অধম সন্তান
—বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে প্রয়াস—
পালিতে আদেশ তব বিশ্বহিতকর।

প্রাচীন ঋষির তুমি পুণ্য অবতার,
প্রাচীন ঋষির শাস্ত্র-রহস্য গভীর
প্রচারিতে শতমুখে নির্ভয়হৃদয়ে,
তীব্র সাধনায় ভেদি প্রহেলী-আঁধার।

মনে পড়ে, এখনও দেখি এ নয়নে,
সে গম্ভীর তেজোদীপ্ত বদনমণ্ডল,
যে দিন শশীর (১) গৃহে করিলা আদেশ
এ অধমে মেঘমন্দ্রে, সত্যান্বেষী জনে

---

(১) লেখকের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সুর। নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খোলাবাড়িয়া নামক গ্রাম।

বিতরিতে তব তপোলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান,
তুলে দিতে আবরণ পুরাণ-তন্ত্রের—
রূপক অথবা রম্য বর্ণনা-সম্ভার—
যেন সত্য ভেসে উঠে তপন সমান।

জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র আমি নিবেদি কাতরে
নমি ও চরণে, নাথ হৃদয়-বিহারী,
হৃদয়ে থাকিয়া মম শুনাও জগতে,
আর্য্যঋষি-পুণ্যগাথা যুক্তির ঝঙ্কারে।

মা আমার স্নেহময়ী, সন্দ্বীপ-বাসিনী,
জ্ঞানানন্দময়ী দেবী অভয়া-রূপিণী,
শুনিতেছি সদা এই সুদূর প্রদেশে
দূরাগত তোমার সে বরাভয়-বাণী।

"মাভৈঃ মাভৈঃ" রব তব মুখাগত
ঝঙ্কারিছে এ হিয়ার পরতে পরতে
উদ্দীপনা-অগ্নি জেলে প্রাণের মাঝারে-
স্নিগ্ধ বিদ্যুতের ছটা খেলিছে নিয়ত।

বন্দি আমি মন্দ-মতি সন্তান তোমার
চরণ-কমলে, মাগো, করি এ প্রার্থনা,
যতদিন ধরাধামে থাক এই ভাবে
উজ্জ্বল অন্তর, হোক সত্যের প্রচার।

মুখবন্ধ।

—:০:—

মদীয় গুরুদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ চৈতন্যঘন শ্রীসাধু মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য, তাঁহার উপদেশে সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই যুক্তি ও প্রমাণাদি সহ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি কোন স্থানে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়া থাকে তাহা আমার মলিন বুদ্ধির দোষে হইয়াছে,—তাঁহার বাক্যের ভাব আমি যথার্থরূপে বুঝিয়া সে স্থানে প্রকাশ করিতে পারি নাই। কোন সদাশয় সাধক বা পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ ভ্রান্তি আমার গোচর করিলে, আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব, এবং সে দোষ বারান্তরে সংশোধন করিয়া দিব।

দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্ম চান, আর এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্ম জিনিসটীর কোন সংবাদ রাখেন না বা রাখার আবশ্যকতা বোধ করেন না, অথবা উহা বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেন। ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই, লেখাপড়া জানেন বা লেখাপড়া জানেন না এমন লোক, দুইই আছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের নিকট ধর্ম্মের কাহিনী বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য জানিতে ইচ্ছুক অথচ কোন সুযোগ পাইতেছেন না, তাঁহাদের জন্যই শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এরূপ দেখা যায় যে, অনেক সাধক মোটামুটি একটা একদেশী সিদ্ধান্তে

পৌঁছিয়া উহাই চরম বলিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহারাও এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

উপনিষৎ ও দর্শন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি ও স্বরূপ লইয়াই রচিত। যাঁহারা ঐ সকল তত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে পারেন না বা শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারেন না, তাঁহাদের চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয়, এবং বিষয়গুলি সহজে বোধগম্য হয়, এরূপ করিবার জন্য পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, উপনিষৎ ও দর্শনের তত্ত্বগুলি পুরাণ তন্ত্র ইত্যাদির মধ্য দিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই শ্রম স্বীকারও অতি কম লোকেই করিতে চান। এক দল সাধক, পুরাণ প্রভৃতিতে নীতি-উপদেশের বা ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য যত কথা যে ভাবে গল্পচ্ছলে লেখা আছে, সবই কোন না কোন অতীত কালের বাস্তব ঘটনার বিবরণ মনে করিয়া, উহার আধ্যাত্মিকতা বুঝিতে বা স্বীকার করিতে চান না; আর একদল সাধক ওগুলিকে গাঁজাখোরের গল্প বলিয়া গ্রাহ্যই করেন না। ইহা ছাড়া, বিষয়-রাজ্যে যে প্রকার লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ও পরের ধন আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদাই বিবাদ করে, সেইরূপ ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য না বুঝায়, ধর্ম্মের বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এটুকু বুঝিতে চেষ্টা করেন না যে, সকলেরই লক্ষ্য পদার্থ এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ও প্রকৃতি ভেদে তাঁহাদের বাহ্য আচরণ মাত্র পৃথক্ পৃথক্, এবং তাঁহারা যতই সরলচিত্তে ও হৃদয়ের আবেগের সহিত লক্ষ্য পদার্থের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহাদের পার্থক্য কমিয়া যাইবে। লোকে যাহাতে পরম সত্য লাভ করিয়া সংসারের ত্রিবিধ জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পায় ও পরা শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহাই প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার

উদ্দেশ্য ছিল, অথচ তাহা বুঝিতে না পারায়, সেই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেই তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা ত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল বাহিরের আচার মাত্রকে সার ভাবিয়া, বিপথগামী হইতেছেন। ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য বুঝাইয়া দিয়া তাহা নিবারণ করাই এ গ্রন্থের লক্ষ্য, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ এক জন মহাসমন্বয়াচার্য্য ছিলেন। তিনি, প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সময়ে, অতি সুকৌশলে, পুরাণ ও তন্ত্রের ধর্ম্মের মধ্যে যে উপনিষদের নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিয়া, সুন্দররূপে সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় করিয়া দিতেন, এবং প্রকৃত সাধনা কি তাহাও দেখাইয়া দিতেন। ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা তিনি সাধারণকে আবশ্যকমত বুঝাইতেন, যাহাতে সকলেই উচ্চ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের প্রত্যেক স্থানেই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করা হইয়াছে, সুতরাং সমন্বয় এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশই ইহার মূল নীতি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "সর্ব্ব জীবে সমভাবে যিনি অবস্থিত আছেন এবং ভূতগণের বিনাশেও যিনি নাশ প্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন তিনিই সম্যক্ প্রকারে দর্শন করেন অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী (১)।" "ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব একই বস্তুতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই বস্তু হইতেই পুনরায় বিস্তার লাভ করে, ইহা যখন দেখা যায় তখনই ব্রহ্ম-বস্তুকে

---

(১) সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৩।২৭।

লাভ করা যায় (১)।" জগতের অসংখ্য বৈষম্যের মধ্যে একটা সাম্য (Unity in diversity) দেখাই প্রকৃত দর্শন, এবং ইহা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারাই হওয়া সম্ভব। এইভাবে পুরাণ ও তন্ত্রের গুহ্য রহস্য সাধককে বুঝাইয়া না দিলে, নিম্ন স্তরের সাধকদিগের কোনই উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না, কখনও তাহাদের কাহারও উন্নতি হইলেও তাহা অতি বিলম্বে ঘটে।

হিন্দুর মূল ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ। কিন্তু, তাহা হইলেও বেদের ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বহু ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে, এবং লোকের অধিকার ও রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাদের সাধনার সুবিধার জন্য, তাহাতে বহু পথের কথা বলা হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে সকল পথ বা সকল মতের কথা বলা সম্ভব নয়। তবে, প্রধান প্রধান বিষয়গুলি এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে, এবং সচরাচর যে সকল বিষয় লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ দৃষ্ট হয়, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা ও সমন্বয় করা হইয়াছে। ইহা পাঠে এই উপকার হইবে যে, চিন্তা করিলে অন্যান্য মত বা পথেরও গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে, এবং সংশয়ের কোনও কারণ থাকিবে না। সংশয়ই ধর্ম্মপথের প্রবল অন্তরায়,—তাই বলিয়া কিছু না জানিয়া না বুঝিয়া সন্দেহশূন্য হওয়াও পরিতাপের বিষয়। সকল পথই এক মহাপথে গিয়া মিশিয়াছে, সূক্ষ্ম-চিন্তা দ্বারা ইহা জানিলে, "একদিন সেখানে গিয়া, সেই পথে গন্তব্য স্থানে নিশ্চয়ই পৌছিব" এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, এবং নিজের অবলম্বিত পথেরও অবান্তর শাখাগুলি পরিত্যাগ করিয়া তীব্রবেগে লক্ষ্য স্থানের দিকে ধাবমান হওয়া

(১) যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৩।৩০।

যায়। লক্ষ্য বিষয়টী যথাযথরূপে জানিতে না পারিলে এরূপ হইবার আশা নাই। সে জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সূক্ষ্ম চিন্তা ও ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অংশের উপর বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন, নচেৎ আজীবন কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিয়াও অনেকে কিছুমাত্র অগ্রসর নাও হইতে পারেন। যেমন কোন বৃক্ষে দৃঢ়রূপে কোন নৌকা বাঁধা থাকিলে, যতই কৌশলে বা বলের সহিত ক্ষেপণী প্রয়োগ করা (দাঁড় টানা) যাউক না কেন, দীর্ঘ সময় পরও উহা একই স্থানে থাকিয়া যাইবে, তেমনি ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার প্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা শত শত অনুষ্ঠানের দ্বারাও অগ্রসর হইতে পারিবেন না। এজন্য লক্ষ্য বিষয়ের কথা ও অনুষ্ঠানের রহস্য যথাসম্ভব এ গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে আবশ্যকমত দর্শনের আলোচনা করিলেও, নীরস ভাব বর্জ্জনের উদ্দেশ্যে, দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ কূট তর্ক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

উপরিলিখিত উদ্দেশ্যসকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বলিয়া, ইহার নাম "চক্ষু-দান" বা "সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য"। "সনাতন' শব্দের অর্থ "সদা বর্ত্তমান"। তাহা হইলে "সনাতন ধর্ম্ম" অর্থ "চিরন্তন ধর্ম্ম"। ধর্ম্মই জগতের মূল নীতি, সুতরাং জগৎ যতদিন আছে ও থাকিবে, ধর্ম্মও ততদিন আছে ও থাকিবে। ধর্ম্ম এক। জাতিবিশেষের বা প্রবর্ত্তকের নাম-অনুসারে ধর্ম্মের বিবিধ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং স্থানবিশেষের বা জাতিবিশেষের উপযোগী আচারাদি সম্পন্ন হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া লোকে মনে করিয়া থাকে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সকল শান্তির মূল প্রস্রবণ ভগবান্‌কে লাভ করিয়া, দেহান্তে অনন্ত শান্তি এবং ইহ জীবনেও বিমল সুখ ও শান্তি উপভোগ করা। ধর্ম্মের আচরণসমূহের চরম লক্ষ্য বস্তু যে এক, এবং তাহা বুঝিতে পারিলে যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে

বিবাদের কোনই কারণ থাকেনা, ইহা প্রতিপাদন করিয়া জগতে সাম্য মৈত্রী ও শান্তি স্থাপন করাই গ্রন্থকারের প্রাণের কামনা।

এই গ্রন্থে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দ বেদ-প্রতিপাদ্য সেই এক সচ্চিদানন্দ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, তত্ত্বজ্ঞানিগণ অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, ইহা ব্রহ্ম পরমাত্মা বা ভগবান্ বলিয়া কথিত হয় (১)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দের এইরূপ পার্থক্য দেখাইয়াছেন :—

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিন্।

* * *

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তা'রে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥

* * *

আত্মান্তর্যামী যা'রে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়॥

* * *

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥
বেদ ভাগবত উপনিষৎ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁ'রে কহে যাঁ'র নাহি সম॥

* * *

---

(১) বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ।১।২।১১।

এক মুখ্য তত্ত্ব তিন তাহার প্রচার ॥
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তা'র রূপ ॥

দ্বৈত-বিরহিত জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তবে ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্ তাঁহার তিনটী রূপ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের বিশুদ্ধ কিরণমণ্ডলকে উপনিষৎ ব্রহ্ম বলেন, যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে অন্তর্যামী আত্মা বলা হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ; এই বলিয়া তিনি এই তিনটী রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, এবং শেষ রূপটীকে স্বরূপ বলিয়াছেন, ও অপর দুইটী রূপকে উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক হিসাবে, ভক্ত-সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠা বাড়াইবার জন্য, বোধ হয় এরূপ করা হইয়া থাকিবে ; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, বিচার করিলে দেখা যায় যে, স্বরূপ বস্তুকেই জ্ঞানিগণ "ব্রহ্ম" শব্দ দ্বারা, যোগিগণ "আত্মা" শব্দ দ্বারা এবং ভক্তগণ "ভগবান্" শব্দ দ্বারা, লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কঠোপনিষৎ ও শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা-স্বরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে, "সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ অথবা অগ্নি তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না, ইহারা সকলে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হইতেছে ; নিয়ত-প্রকাশমান তাঁহার দীপ্তিতেই নিখিল জগৎ প্রকাশ পাইতেছে (১)।" শ্রুতি আরও

---

(১) ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥
কঠোপনিষৎ ।২।২।১৫। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ।৬।১৪।
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ। বেদান্তসূত্রম্। ।১।১।২৪।

বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ" (১) ; "যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং যাঁহাতে আবার বিলীন হইবে, তাঁহাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম (২)"। "ব্রহ্ম রস-স্বরূপ, সেই রস-স্বরূপকে লাভ করিয়া জীব পরমানন্দ অনুভব করে, তাঁহাকে অনুভব করা ব্যতীত পরমানন্দ লাভের আর অন্য উপায় নাই (৩)।" ইহাই ত হইল বেদের কথা ; ইহাতে ব্রহ্ম যে শুধু কিরণ মাত্র, জড় জ্যোতির মত কোন বস্তু, তাহা ত প্রমাণ হয় না। আবার "আত্মা" শব্দ দ্বারাও ঐরূপ বস্তু বুঝায়। আত্মা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা বেদে বহু স্থানে আছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে, পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ খণ্ডে, আত্মার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে (এই গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহরাজ জনককে বলিয়াছিলেন, "পরমাত্মার সহিত মিলনে সাধক যে আনন্দ অনুভব করেন তাহার কোন তুলনাই হইতে পারে না, অন্য ভূতসকল সেই আনন্দের মাত্রা অর্থাৎ সামান্য অংশ মাত্র লাভ করিয়া আনন্দযুক্ত হইয়া থাকে (৪)। আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্, এ কথা

(১) "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম"। শ্রুতিঃ।

(২) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।৩।১।

(৩) "রসো বৈ স রসং লব্ধ্বানন্দী ভবতি নান্যথা।"

পঞ্চদশী। ।১১।২।

(৪) সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।৪।৩।৩২।

বেদান্তদর্শনেও স্পষ্ট উক্ত আছে (১)। বেদান্তগ্রন্থ পঞ্চদশীতে "আত্মা" ও "ব্রহ্ম" শব্দ দ্বারা একই বস্তুকে বুঝান হইয়াছে (২)। বেদেও বহু স্থানে ঐ উভয় শব্দ একই পরম পদার্থকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। "ভগবান্" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ষড়ৈশ্বর্য্যবান্. এ কথা সত্য। কিন্তু "ব্রহ্ম" বা "আত্মা" শব্দ দ্বারা ঐশ্বর্য্যবিহীন, শক্তিবিহীন, আনন্দবিহীন বা খণ্ড কোন পদার্থ যে বুঝায় না তাহা ত উপরের প্রমাণ-সমূহ দৃষ্টেই জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে "স্বয়ং ভগবান্" বলা হইয়াছে (৩)। আবার "কৃষ্ণ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—"কৃষ্" ধাতু আকর্ষক সত্তা বুঝায় এবং "ণ" নির্বৃতি বা আনন্দ বুঝায়, অতএব এই দুইয়ের ঐক্য করিলে যে সচ্চিদানন্দ বা পরব্রহ্ম হয়, তাঁহাকেই কৃষ্ণ বলা হয় (৪)। ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণকে "সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ" বলা হইয়াছে (৫)। শ্রীকৃষ্ণের প্রণামেও

---

(১) আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। বেদান্তদর্শনম্।২।১।২৮।
সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। ঐ।২।১।৩০।

(২) ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো বৈ স রসং লব্ধ্বানন্দী ভবতি নান্যথা॥
পঞ্চদশী।১১।২।

(৩) এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।৩।২৮।

(৪) কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ মহাভারতম্।

(৫) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥ ব্রহ্মসংহিতা।

তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে (১)। সুতরাং ভগবান্‌কে সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম, আত্মা এ সব বলা হয় দেখা যাইতেছে।

স্বরূপ বস্তু যখন "অদ্বয় জ্ঞান", তখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্তুর অনুভূতি হয়, তাহাই স্বরূপ বস্তু বা নিত্য-সত্য বস্তু। নিত্য-সত্য বস্তু যখন সর্ব্বদাই একভাবে থাকে, তখন যিনিই সেখানে পৌঁছিবেন তিনিই তাহা সেই একইরূপে দেখিবেন, ভিন্নরূপে দেখিতে পারেন না। জড় জগতে অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রিয়ের শক্তির তারতম্য-অনুসারে বা ব্যতিক্রমবশতঃ একই বস্তু কিঞ্চিৎ ভিন্ন-ভিন্নরূপে অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু বিষয়ের পরপারে যেখানে কোন ইন্দ্রিয় প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানকার একমাত্র বস্তু কখনই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়া অনুভূত হইতে পারে না (২)। যদি ভাব-সমাধির কথা ধরিয়া বলা যায়, তবে সে অন্য প্রকার কথা। সেখানে স্বরূপ বস্তুর অনুভূতি হয় না, সেখানেও, অনুলোমক্রমে নির্ব্বিকল্প সমাধি

---

(১) "কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

(২) তদিদং ভগবন্ রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্।
অন্তরোঽনন্তরো ভাতি পশ্য তং মায়য়োরুধা॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১।১৩।৪৮।

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে।
মায়ামাত্রমিদং রাজন্ নানাত্বং প্রত্যগাত্মনি॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১২।৪।২৫।

নহি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে।
নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষো র্বাতয়োরিব॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১২।৪।৩০।

হইতে নামিবার পথে স্বরূপের যে বিবিধ লীলা-অবস্থা দেখা যায়, তাহাই অনুভূত হয়। শ্রেষ্ঠতম বস্তুই সকলে চায় যে, শ্রেষ্ঠতম আনন্দ লাভ হইতে পারে। "অদ্বয় জ্ঞানই" শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য পদার্থ, আর ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্ এ তিনটী তাঁহারই নাম।, অতএব ভেদবুদ্ধির আশ্রয় না লইয়া, সেই পরম বস্তুকে 'ব্রহ্ম' 'আত্মা' বা 'ভগবান্' শব্দে অভিহিত করিলে, কোন দোষ হইতে পারে না।

সমগ্র গ্রন্থখানিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে স্বরূপ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ সাধনের, দ্বিতীয় খণ্ডে সাধনাঙ্গের ও তৃতীয় খণ্ডে সমন্বয় এবং পরা শান্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত-সকল যে আর্য্য ঋষিদিগের মতবিরোধী নহে, এবং চিরদিনই ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যরূপে আছে ও থাকিবে, ইহা দেখাইবার জন্য, নানা শাস্ত্র হইতে মূল সংস্কৃত শ্লোক সূত্র প্রভৃতি পাদটীকারূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অল্পশিক্ষিত লোকেও যাহাতে বুঝিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার ভাষাও যথাসম্ভব সরল করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে সরল বাঙ্গালা ভাষায় পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে, ইহা পাঠে যদি মানবগণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয়, তাহা হইলে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে বুঝিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, সাধকশ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বরদা-কান্ত রায় বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ও সাধকাগ্রগণ্য ধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বনিধি মহাশয়, বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের বা সংযোজনের পরামর্শ দিয়া, আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আর, যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি ইহার মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় বহন জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের

প্রত্যেককেই আমি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের বদান্যতা ব্যতীত দীন ভিক্ষুক আমি কখনই এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

কাশীধাম।
৩রা কার্ত্তিক। ১৩৩৩ সাল।

ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ ।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায়, এবং নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় আমাকে প্রুফ্ সংশোধন করিতে হইয়াছে বলিয়া, স্থানে স্থানে ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। এজন্য, যতটা সম্ভব ভ্রমসংশোধনের নিমিত্ত একটা শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইয়াছে, এবং পাঠকগণ যদি তদনুসারে ভুলগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লয়েন তাহা হইলে তাঁহাদের পাঠের সুবিধা হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে এই দোষ পরিহারের ইচ্ছা থাকিল। ইতি।

কলিকাতা।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল।

ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ ।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড।

(সাধনাঙ্গ।)

ভক্তিমার্গের নিম্নস্তরের অনুষ্ঠান ও আচারে পার্থক্য আছে—উভয় সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তিদের একত্ব।

পরা ভক্তির (অর্থাৎ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভগবানের প্রতি অহৈতুক অনুরাগের) আলোকে শ্রেষ্ঠ ভক্তের রসাস্বাদন—রস, যাহা আস্বাদন করা যায়, যাহা আস্বাদ্য—সংসারে বিবিধ সম্বন্ধযুক্ত লোকের সংশ্রবে রসাস্বাদনের ন্যায়, ধর্ম্মাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ভগবানের সহিত বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক রসাস্বাদনের ব্যবস্থা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরস—তপস্যাপ্রভাবে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাম্যাবস্থা আসায় নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত প্রশান্ত ভাব অনুভূত হয়, তাহা শান্ত ভাব—প্রত্যেক কার্য্যেই সাধক কোন অদৃষ্ট হস্ত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছেন, এরূপ দর্শনে দাস্যভাব—ঘনিষ্টতায় সখ্যভাব—স্নেহরসের প্রাবল্যে সকলের কল্যাণে পিতা-মাতার ন্যায় চেষ্টা, বাৎসল্যভাব—চরমে ঐ তিন ভাবের সহিত স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঐকান্তিক ভালবাসার ন্যায় ভালবাসা যুক্ত হওয়ায়, নানা ভাবে ভগবানের সেবা, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর বলিয়া মধুরভাব—ঐ ঐ ভাবে যে যে রসের আস্বাদন হয় তাহা ঐ ঐ রস নামে খ্যাত—প্রাচীন কালে ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর সংসারে প্রবেশ করিতে হইত—পিতা, মাতা প্রভৃতিকে ব্রহ্মের স্থূল প্রকাশরূপে সেবা করিতে করিতে বিশ্বে সেই প্রেম ছড়াইয়া পড়িত—ক্ষুদ্র "আমি, আমার" জ্ঞান ও ভোগ-কামনা লইয়া সংসারে লিপ্ত থাকায় মানবের যাতনা ভোগ।

শাক্তের পশ্বাচার বীরাচার ও দিব্যাচার অনুসারে তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক পঞ্চ মকার—তামসিক পঞ্চ মকারে ফল মূল প্রভৃতি দ্বারা চারি মকারের অনুকল্প ব্যবস্থা এবং কূর্ম্ম-মুদ্রা দ্বারা

তৃতীয় খণ্ড।

—:•:—

(সমন্বয় ও পরা শান্তি।)

সংশয় প্রভৃতি অপর চতুর্দ্দশ বিধ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রমেয় ও প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যার্থে আবশ্যক—রাগ, বিদ্বেষ ও মোহ হইতেই জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি—মিথ্যা জ্ঞান ঐ ত্রিবিধ দোষের মূল—মিথ্যা জ্ঞানের নাশে দুঃখের চির অবসান—(৩) পূর্ব্বমীমাংসায় শব্দের নিত্যত্ব স্বীকৃত—বেদস্থ কর্ম্মকাণ্ডের বিবিধ বচনের সামঞ্জস্য—স্বর্গে নিত্য সুখ—বেদোক্ত যজ্ঞই স্বর্গলাভের উপায়—দেবতা গৌণ, যজ্ঞ মুখ্য, দেবতা মন্ত্রাত্মক—কর্ম্ম-ফলদাতা পৃথক্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই—কর্ম্মই ফল দানে সমর্থ—যজ্ঞফলে স্বর্গে দেহাতিরিক্ত আত্মার অপূর্ব্ব আনন্দভোগ; ইহা প্রতিপাদনই, এ দর্শনের মতে, বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য—নিম্নস্তরের সাধক বিষয়-সুখের অধিক বুঝে না, এই নিমিত্ত অক্ষয় স্বর্গ-সুখের লোভ দেখাইয়া অলস ও অজ্ঞ কর্ম্ম-বিমুখ লোকদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্মে প্রবর্ত্তনই বোধ হয় জৈমিনীর গূঢ় উদ্দেশ্য—(৪) বৈশেষিকদর্শন ও পূর্ব্বমীমাংসা অপেক্ষা উচ্চ স্তরে উঠিয়া সূক্ষ্মতর তত্ত্ব লইয়া সাংখ্য-দর্শন রচিত—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকে মোক্ষ—পুরুষ প্রকৃতির পরিণামিত্ব ও দুঃখিত্ব দোষ দর্শন করিলে প্রকৃতি নিরস্তা হন—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব—জগৎ রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় একেবারে মিথ্যা নহে—বহু আত্মা—স্বতন্ত্র নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার—মহদাদি তত্ত্বে বিরক্ত, অথচ সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন নাই, এরূপ সাধক মুক্ত না হইয়া প্রকৃতিতে লীন হয়েন; পর কল্পে তাঁহার সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর হওয়ার কথা স্বীকার—শ্রবণ মনন ধ্যান ধারণাদি সাধনা, এবং সমাধি সুষুপ্তি ও বিদেহ কৈবল্যে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি, স্বীকার—বেদান্তদর্শনের অধিকারী অপেক্ষা নিম্ন অধিকারীর জন্য লিখিত বলিয়া এই ভাবে বিচার—কৈবল্য মুক্তিতে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি স্বীকারে প্রকারান্তরে বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত স্বীকার—(৫) পাতঞ্জল

দৃষ্টান্তস্বরূপে শিবপুরাণোক্ত বর্ণনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—(সর্ব্বাগ্রে অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মতেজ ছিলেন—সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা—প্রকৃতি ও পুরুষ—তাঁহাদের তপস্যা—দ্বাবিংশতি জড় তত্ত্ব—পুরুষ বা নারায়ণের নাভিতে পদ্ম—ব্রহ্মা সেই পদ্ম হইতে উৎপন্ন—ব্রহ্মার নিজ উৎপত্তির হেতু অন্বেষণ ও তপস্যা—নারায়ণের আবির্ভাব—নারায়ণের সহিত ব্রহ্মার বিবাদ—জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব—নারায়ণ ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তাঁহার তথ্য নির্ণয়ে চেষ্টা এবং অপারগ হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ—প্রথমে ওঙ্কার, তৎপর দশভুজ পঞ্চানন এবং শ্বেত-বর্ণ যুক্ত মূর্ত্তি, সর্ব্বশেষে অক্ষর-গ্রথিত শব্দময় মূর্ত্তির প্রকাশ—ইহাই মহাদেব—নির্গুণ হইয়াও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে সগুণ—অভেদদর্শী হইবার জন্য নারায়ণ ও ব্রহ্মার প্রতি উপদেশ—লক্ষ্মী সরস্বতী ও কালী যথাক্রমে বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্রের শক্তি—ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে লিঙ্গ পূজা করিবার জন্য উপদেশ দান—সকল লোকের ভুক্তি ও মুক্তিদাতা, কার্য্যসাধক এবং প্রাণস্বরূপ হইবার জন্য বিষ্ণুকে বরদান—বিষ্ণু ও শিব অভিন্ন—ব্রহ্মার এক শত বৎসর পর্য্যন্ত এই লীলা চলিবে—শিব ও বিষ্ণুর অন্তর্দ্ধান—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিজ বীর্য্য নিক্ষেপ—অচৈতন্য অণ্ডের উৎপত্তি—সেই অণ্ডে অনন্তরূপে বিষ্ণু প্রবেশ করায় তাহা সচেতন হইয়াছিল—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ঋষি সৃষ্টি—ব্রহ্মার আদেশে ঋষিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্টি-বর্দ্ধন)—বিষ্ণুভাগবতের মতে সর্ব্বাগ্রে একমাত্র বিষ্ণুই ছিলেন—বিষ্ণুর স্বরূপ লইয়া মত ভেদ, কেহ বলেন তিনি নির্ব্বিশেষ, কেহ বলেন তিনি সবিশেষ—বৈষ্ণবগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ—ঐ সকল প্রমাণে আদি বিষ্ণু নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন—দেবীভাগবতের মতে সর্ব্বাগ্রে এক অনির্দ্দেশ্য বস্তুই ছিলেন—পুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের রূপক ভাঙ্গিলে উহা বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত অভিন্নই দেখা যায়—পুরাণে ব্রহ্মেরই নাম রাখা হইয়াছে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ভগবতী, কালী ইত্যাদি—

পুরাণের যুগে কথোপকথনের ছলে গ্রন্থ লেখার প্রথা ছিল বলিয়া বোধ হয়—পুরাণে অনেক স্থলে রূপকের আবরণ আছে, কোথায়ও তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, কোথায়ও বা নাই—রূপকের দৃষ্টান্ত : (১) ধৌম্য-উপমন্যুর উপাখ্যান, (২) উতঙ্ক মুনির বৃত্তান্ত, (৩) জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, (৪) পুরঞ্জনের পুরী ও ভরত কর্ত্তৃক ভবাটবী বর্ণনা, (৫) পৃথু কর্ত্তৃক পৃথিবীর বধোদ্যোগ, (৬) ত্রিপুর-দহন, (৭) নারদ কর্ত্তৃক দক্ষ প্রজাপতির হর্য্যশ্ব নামক সহস্র পুত্রের প্রতি উপদেশ—কোন কোন স্থলে একই ঘটনা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নভাবে বর্ণিত দেখা যায়, তাহার সামঞ্জস্য—এইরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত, যথা (১) তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুবৃত্তান্ত, (২) শুকদেবের বৃত্তান্ত, (৩) প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত—বেদের ক্ষুদ্ররূপক পুরাণে বহুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে—দেবতা ও অসুরে যুদ্ধ হওয়ার প্রকৃত অর্থ—পৌরাণিক আখ্যায়িকার বীজ বেদে নিহিত আছে, তাহার দৃষ্টান্ত, যথা, (১) কেনোপনিষদে "উমা ও হৈমবতী," (২) শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ, অথর্ব্বশির-উপনিষৎ প্রভৃতিতে "শিব, নীল-লোহিত, রুদ্র, গিরিশ," (৩) মুণ্ডকোপনিষদে "কালী", (৪) ছান্দোগ্য-উপনিষদে "দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ", (৫) কঠোপনিষদে "বামন" এবং ঋগ্বেদের সবিতাসূক্তে "বিষ্ণুর তিন প্রকার পাদক্ষেপ" এইগুলির উল্লেখ দেখা যায়—পুরাণেও উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব পৃথগ্ ভাবে বর্ণিত আছে।

তন্ত্রে ধর্ম্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত—স্থানে স্থানে পরমাত্মতত্ত্ব-প্রকাশের চেষ্টাও আছে।

একই বৃক্ষের প্রধান প্রধান বিভিন্ন শাখা একই মূলের রসে পরিপুষ্ট—ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, ভগবানের দিকে মুখ ফিরাইয়া, তাঁহার ভজনা

দ্বারা অমৃতত্ব লাভ সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য ও মূল নীতি—(সকল ধর্ম্মেই সত্য বাক্য বলা, অহিংসা, পরহিতৈষণা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি পুণ্য কর্ম্ম, আর মিথ্যা বাক্য বলা, চৌর্য্য, পরপীড়া, পরদার-গমন ইত্যাদি পাপ কার্য্য)—(১) হিন্দুধর্ম্মে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"কে পাইবার জন্য সাধনা —পরমাত্মা স্বরূপে এক, লীলায় বহু—জীব ও পরমের মিলন চরম ফল—(২) বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিন অপবাদ, যথা, নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিকতা, আত্মার নশ্বরত্ব—তৎকালে ঈশ্বরের নামে যজ্ঞে পশু হনন, সোমরস পান ইত্যাদি এবং অন্তর্নিহিত মহাসত্যের প্রতি লক্ষ্যের অভাব দর্শনে, ঐ দোষ-নাশের জন্য বুদ্ধদেব নূতন পথ অবলম্বন করায়, তাঁহার ধর্ম্মে ঈশ্বরের কথা উল্লিখিত না হওয়া—তাঁহার প্রচারিত "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই মত নব সুরে, নব রাগে, সকলকে মোহিত করায় হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অবতারত্ব স্বীকার—তাঁহার ধর্ম্মে বৈদিক যজ্ঞ নিন্দিত, কিন্তু শম দম প্রভৃতি (যাহা বৈদিক ধর্ম্মের প্রাণ, তাহা) গৃহীত—ধর্ম্মপদের জরাবগ্‌গে "দেহরূপ গৃহের নির্ম্মাণকর্ত্তাকে দর্শন করায় তাঁহার আর জন্ম হইবে না" বলায় তিনি বাহিরে "ঈশ্বর, ঈশ্বর" না বলিলেও নিরীশ্বরবাদী নহেন—তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের মূল ভিত্তিরূপে বেদের নাম উল্লেখ না করিলেও, পশুহনন ও সোমরসপান যুক্ত যজ্ঞ ব্যতীত, বৈদিক অন্য সাধনোপদেশের গ্রহণ ও প্রচার করায়, তিনি বেদবিদ্বেষী নহেন, সুতরাং নাস্তিক নহেন—কোন দ্রব্যের রূপান্তর গ্রহণে যে অর্থে তাহার নাশ বলা যায়, সেই অর্থে কর্ম্মানুসারে জীবাত্মার উচ্চ বা নীচ যোনিতে ভ্রমণ হেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার নাশে তাহার নাশ বলা হইয়াছে—আত্মা একেবারে নষ্ট হয়, ইহা বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়—বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্ম্মে "অষ্টাঙ্গিক পথ" অবলম্বনের উপদেশ—ঐ "অষ্টাঙ্গিক পথ" হিন্দুধর্ম্মের সাধনা হইতে ভিন্ন নহে—বুদ্ধদেবের "নির্ব্বাণ" হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারকর্ত্তা শঙ্করের "নির্ব্বাণ" হইতে ভিন্ন নহে—নির্ব্বাণই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য—(৩) খ্রীষ্টান ধর্ম্ম—অতি

প্রাচীন কালে মিশরে আর্য্য-দেব-দেবীর পূজা—মিশর হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া আসিয়া, তাহার বাহ্যাড়ম্বর বাদ দিয়া, সার ভাগ মোজেস্ কর্ত্তৃক আরবে প্রচার—"জন"-প্রচারিত ধর্ম্মে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশের সারভাগ গৃহীত—"জনের" মন্ত্রশিষ্য যিশু য়িহুদি ধর্ম্মে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন মাত্র, নূতন কোন ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই—যিশু সময় সময় বলিতেন যে তিনি ও ভগবান্ এক, তিনি যাহা করেন তাহা ভগবানেরই কার্য্য ও তাহা ভগবানের শক্তিতেই নিষ্পন্ন হয়, তিনি যাহা বলেন তাহা তাঁহার কথা নহে, ভগবানেরই কথা—ভগবানের সত্তায় আত্মসত্তা ডুবাইতে না পারিলে ইহা হয় না—জীব ও পরমের মিলন-বোধ ভিন্ন ইহা অনুভূত হয় না—সেই সময়ে উচ্চ অধিকারী খুব কম ছিল বলিয়া তিনি ঐ সব কথা সাধারণের মধ্যে বড় প্রচার করেন নাই—য়্যাডাম্-ইভের বৃত্তান্তে যাহা দোষশূন্যতা (innocence) তাহা পরম জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে—অহংজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই ভেদজ্ঞান আসে—এই ভেদজ্ঞান আসাই য়্যাডাম্ ও ইভের স্বর্গচ্যুতি—(৪) মুসলমানগণের ধর্ম্ম গ্রন্থ কোরাণের এখলাছ্ সুরায় এক এবং অদ্বিতীয় ভগবানের তত্ত্ব বর্ণিত আছে—কোরাণ শরিফের প্রথম সুরায় "বেছ্মেল্লা হেররহমা" ইত্যাদি আয়াতের বেছ্মেল্লা শব্দের "বে" এই অক্ষরে, মৌলানা সাহ আব্দুল্ আজিজ্ সাহেবের মতে, খোদা তাল্লার সঙ্গে জীবের মিলিয়া যাওয়া বুঝায়—শরিয়ৎ, তরিকৎ, হকিকৎ ও মারফৎ, চারিটী স্তর—মারফতিতে আল্লাকে সর্ব্বত্র ও নিজের মধ্যে দেখা—ইহা জীব ও পরমের মিলন—মহাত্মা মনসুর বলিতেন "আমিই আল্লা"—সুফিশ্রেষ্ঠ সাম্ছে তেব্রিজের একটী অদ্বৈতভাবজ্ঞাপক কবিতা—বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচারিত বলিয়া, তাহাদের আচার ও রুচি অনুসারে সাধনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে, নচেৎ সব ধর্ম্মেরই মূল উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণতি এক।

ফাল্গুন মাসের পৌর্ণমাসী রজনীতে নীরব নিস্তব্ধ উন্মুক্ত প্রান্তরের শান্ত শোভা—তথায় আগত পবিত্র ও সরল হৃদয় ব্যক্তির ভিতরে ও বাহিরে পরমানন্দপূর্ণ এক প্রশান্ত ভাব অনুভব—সাধক ভিতর-বাহিরে পরমানন্দময় এই শান্তি চায়—ইন্দ্রিয়গণের কোলাহলই তাহা লাভের অন্তরায়—সাধক যখন রাজরাজেশ্বর অমৃতের সন্তান, তখন সে সকল ইন্দ্রিয়কে বশ করিয়া অন্তরাত্মার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে সক্ষম—এই সাধনায় উপাধিনাশ ও সর্ব্বত্র চিদানন্দময় সত্তার প্রকাশ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের নাশে পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ—ইহাই পরা শান্তি।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	শুদ্ধ
১১	১	যাঁহাতে	"যাঁহাতে
১৪	২২	যাহার	যাঁহার
১৫	১৬	ঈঙ্গিত	ইঙ্গিত
১৮	১১	শ্রীমদ্ভগবতগীতা	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
২৭	১৯	জানেন্দ্রিয়	জ্ঞানেন্দ্রিয়
৩৫	২২	অভিব্যস্তিং	অভিব্যক্তিং
৪৯	১৯	শিরঃপ্যাণ্যাদিষু	শিরঃপাণ্যাদিষু
৫০	২৫	অর্থাৎ	তাহার অরি অর্থাৎ
৮৫	৬	এইরূপ	এই রূপ
১০৭	১৬	মানুষ্য	মানুষ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	শুদ্ধ
১০৮	১৪	নিরুদ্ধ	নিরুদ্ধ
১২৪	১৯	বিজ্ঞাতারং	বিজ্ঞাতারং
১৪৩	৩	হইবে (১)।	হইবে (১)।"
১৫৮	৮	হয় (১)।	হয় (১)।"
১৭৬	২৪	ভার্য্যাং পুত্রপিণ্ডং প্রয়োজনম্	ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্
১৮৬	১৬	তপস্তপ্তা	তপস্তপ্তা
১৯৭	১০	অসক্ত	অশক্তে
২৩৩	২৫	করিতে থাকে	করিতে থাকে,
২৪২	৬	উদ্ধত	উদ্ধৃত
২৪৯	২৪	কৃষ্ণবর্ত্মে ভূবয়	কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়.
২৫০	১	করে (১)।	করে (১)।"
২৬৪	১৫	সাথক	সার্থক
৩০৬	১৫	উচিত (২)।	উচিত (২)।"
৩০৮	৩	হয় না (১)।	হয় না (১)।"
৩৪৪	২	পলায়মান	কুণ্ডল সহ পলায়মান
৩৪৭	২৫	মায়াবীময় দানব	মায়াবী ময়দানব
৩৫৩	৭	ঋাষদ্বয়	ঋষিদ্বয়
৩৫৯	১৯	হইবে,	হইবে ;
৩৬০	১৭	বিবিধরূপ	বিবিধ রূপ
৩৬৫	৮	ধর্ম্মপদ	ধর্ম্মপদের
৩৬৫	২৩	ধর্ম্মপদ	ধর্ম্মপদ,
৩৬৯	৬	করিলে	করিলে,

চক্ষুদান

বা

সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য।

অবতরণিকা ঃ

—:*:—

১। আত্ম-দর্শনের অনুকূল অবস্থা।

পরমাত্মা সর্ব্বভূতে আছেন লুকায়ে,
তাই তাঁরে স্থূল দৃষ্টি না পায় দর্শন,
একাগ্র মানস আর সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-বলে
দেখেন তাঁহারে সূক্ষ্ম-বুদ্ধি জ্ঞানিগণ (১)।

উপনিষদ্-জাত ধনু মহাস্ত্র সহায়ে,
উপাসনা-তীক্ষ্ণীকৃত মন-বাণ দিয়া,

---

(১) এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥
কঠোপনিষৎ ।১।৩।১২।

তদ্গত-হৃদয়ে, সব ইন্দ্রিয় সংযমি,
লক্ষ্য বস্তু ব্রহ্ম, সৌম্য, ফেলহ বিদ্ধিয়া (১)।

গিছে দূরে মান মোহ আসক্তি যাঁ'দের,
নিভেছে কামনা, আত্ম-ধ্যানেতে মগন,
মোহ-মুক্ত, সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বহীন যাঁ'রা,
সে অব্যয়-পদ-রূপ লভেন রতন (২)।

বুদ্ধিভ্রংশকরী, অহো! রাজসী তামসী
প্রকৃতি আশ্রয় যা'রা ক'রেছে ধরায়,
বৃথা আশা, বৃথা কর্ম্ম আর বৃথা জ্ঞানে
রত যা'রা, যাহাদের চিত্ত স্থির নয়,

সেই সব মূঢ় নর, না জানি আমার
বিমল পরম তত্ত্ব ভূত-মহেশ্বর,

---

(১) ধনু গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধীয়ত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ। ২।২।৩।

(২) নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৫।৫।

নরদেহাশ্রিত আত্মরূপী সে আমারে
অবজ্ঞা করিয়া, দুঃখে ভ্রমে নিরন্তর (১)।

দেহ-রূপ যন্ত্রে সমারূঢ় সর্ব্ব জীব,
মায়া দ্বারা তাহাদেরে করায়ে ভ্রমণ
—নিজ নিজ কার্য্যে তাহাদিগে নিয়োজিয়ে—
ঈশ্বর সবারি হৃদে স্থিত সর্ব্বক্ষণ।

তাঁহারি—সেই হৃদগত দেবের—শরণ
লও, পার্থ, দিবানিশি কায়-মন-প্রাণে,
তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি হবে লাভ,
গতাগতি নাহি রবে, যাবে নিত্য স্থানে (২)।

---

(১) অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৯।১১-১২।

(২) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৮।৬১-৬২।

২। বেদের (উপনিষদের) ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠ অবলম্বনীয়।

শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ যে আছে শাস্ত্রচয়,
তামস বলিয়া তাহা জানিবে নিশ্চয়।
বাম কাপালক আর কৌলক ভৈরব
আগম যতেক আছে, তাহা দেব-দেব
ক'রেছেন প্রণয়ন জীব-মোহ-তরে ;
অন্য হেতু নাহি কিছু তাহার ভিতরে।
দক্ষ ভৃগু দধীচির শাপে দগ্ধ যত
ব্রাহ্মণ সে বেদমার্গ হ'তে দূরে গত,
তা'দের সোপানক্রমে উদ্ধার-কারণ
সৌর শাক্ত পঞ্চাগম শিবের রচন (১) ;

---

(১) অন্যানি যানি শাস্ত্রাণি লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ,
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্ব্বশঃ।
বামং কাপালকঞ্চৈব কৌলকং ভৈরবাগমঃ
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতো নান্যহেতুকঃ।
দক্ষশাপাদ্ ভৃগুশাপাদ্দধীচস্য চ শাপতঃ
দগ্ধা যে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ;
তেষামুদ্ধরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা,
শৈবাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চৈব সৌরাঃ শাক্তাস্তথৈব চ,
গাণপত্যা আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেণ তু।

দেবীভাগবতম্। ৭।৩৯।২৬-৩০।

সেই সব আগমের অংশ কোন কোন
করে নাই উল্লঙ্ঘন বেদের বচন ;
বেদ অনুসারে যাঁ'রা করেন সাধন
পারেন সে সব তাঁ'রা করিতে গ্রহণ ;
বেদবিরুদ্ধাংশে দ্বিজ নহে অধিকারী,
অনধিকারীরা তাহা রহিবে আচরি।
অতএব বৈদিকেরা সর্ব্বপ্রযত্নেতে,
ধর্ম্ম আচরিবে আস্থা স্থাপিয়া বেদেতে।
তা' হ'লে হইবে ধর্ম্ম, প্রকাশিবে জ্ঞান,
দেখিবে পরম ব্রহ্ম হৃদে ভাসমান (১)।

---

(১) তত্র বেদাবিরুদ্ধাংশোঽপ্যুক্ত এব ক্বচিৎ ক্বচিৎ,
বৈদিকৈ স্তদ্গ্রহে দোষো ন ভবত্যেব কর্হিচিৎ।
সর্ব্বথা বেদভিন্নার্থে নাধিকারী দ্বিজো ভবেৎ,
বেদাধিকারহীনস্তু ভবেত্তত্রাধিকারবান্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈদিকো বেদমাশ্রয়েৎ,
ধর্ম্মেণ সহিতং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়েৎ।

দেবীভাগবতম্। ৭।৩৯।৩১-৩৩।

চক্ষুদান

বা

সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অন্বেষণ।

মানুষ চায় সুখ, মানুষ চায় শান্তি। এই সুখ ও শান্তির লালসায় মানুষ সৃষ্টির সময় হইতেই নানা প্রকার অন্বেষণ আরম্ভ করিয়াছে। এই অন্বেষণ চলিতেছে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যত দিন থাকিবে ততদিন চলিবে। মানুষের কথা বলি কেন, জীবমাত্রেই সুখ চায়। বৃক্ষ লতার দিকে চাও, সেখানেও সুখ দুঃখের ভাব দেখিবে। তাহারাও সুখ চায়।

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গদের বুদ্ধি নিতান্ত অল্প, কিন্তু তাহাদের যতটুকু বুদ্ধি বিবেচনা আছে, ততটুকু দ্বারা যে পরিমাণে আরাম লাভ করার সম্ভাবনা, তাহার জন্য তাহারা চেষ্টা করে। সাধনা দ্বারা বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তি-সুখ পাইবার অধিকার কেবল মানুষেই পাইয়াছে। মানুষের মধ্যেও যাহাদের বুদ্ধি অল্প, অর্থাৎ যাহারা স্থায়ী সুখের বা পবিত্র সুখের ধারণা করিতে পারে না, তাহারা সামান্য সামান্য সুখের জন্য অল্প আয়াসে যতটুকু যাহা করা সম্ভব কেবল তাহাই করে। আর যাহারা এই প্রকার অস্থায়ী সুখের

আস্বাদ বিশেষরূপে পাইয়া উহাকে দুঃখ-মিশ্রিত বলিয়াই বোধ করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা ঐ প্রকার সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া লোকের যে দুর্দ্দশা হয় তাহা দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং ঐ সুখে তৃপ্তি হইতে পারে না বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়াও স্থায়ী সুখের অন্বেষণ করেন। এই যে দুই শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে সংসারে প্রথম শ্রেণীর লোকই পনর আনা।

সংসারে সকল বস্তুই অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল। সংসারের সুখও অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল। সংসারের দুঃখ দূর করার এবং সুখ লাভ করার নিমিত্ত যে চেষ্টা তাহার দৃষ্টান্ত, ধনী দরিদ্র, বুদ্ধিমান নির্ব্বোধ, পাপী পুণ্যবান, সকলের মধ্যেই অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চেষ্টার ফলে বিবিধ জড়-বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়াছে ও অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। সেই সকল উপায়ে সুখ লাভ হয় সত্য, কিন্তু তাহা স্থায়ী নয়। ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী বস্তু বা বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট যে সুখ তাহাও ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী। অনন্ত ও স্থায়ী সুখ অনন্ত ও স্থায়ী বস্তুতে ভিন্ন অন্য বস্তুতে থাকিতে পারে না। জগতে যাবতীয় বস্তুর ও ঘটনার পশ্চাতে এক মহাশক্তির খেলা চলিতেছে। সেই মহাশক্তি আবার এক জ্ঞান ও আনন্দময় নিত্য অনন্ত সত্তাকে আশ্রয় করিয়া স্ফুরিত হইতেছেন। তাঁহাকে জানিতে হইবে ও পাইতে হইবে। তাঁহাকে জানিলে এবং তাঁহাকে পাইলে তবে স্থায়ী সুখ বা শান্তি লাভ হয়। তাঁহার শরণ না লইয়া, তাঁহার পূজা না করিয়া, মানুষ শুধু জড় জগতের বিষয় লইয়া থাকিলে জগৎ দস্যু ও দৈত্যের আবাস-স্থান হইয়া উঠে, সুতরাং সুখরাশি অসুখের তরঙ্গে ডুবিয়া যায়।

দূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, আদিম ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র শক্তি প্রতিনিয়তই বাধা প্রাপ্ত

হইতেছে, প্রকৃতির অধীনতায় থাকিয়া মন তৃপ্তি বোধ করে না, মন চায় প্রকৃতি-রাজ্যের উপর আধিপত্য করিতে, এক কথায় মন চায় স্বাধীন ভাবে চলিতে। প্রথম স্তরে মানুষের পক্ষে যাহা হওয়া সম্ভব তাঁহাদেরও তাহাই হইল। তাঁহারা ভাবিলেন প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশে, বিভিন্ন কার্য্যের পশ্চাতে, মানবের শক্তি অপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসকল কার্য্য করিতেছে। তাহাদের দ্বারাই গ্রহ, নক্ষত্র, দানব, মানব, বৃক্ষ, লতা কীট, পতঙ্গ সকলেই পরিচালিত হইতেছে, সুতরাং সেই সকল শক্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের কৃপা লাভ করিতে পারিলেই তাঁহাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। ঐ সকল শক্তিকে তাঁহারা দেবতা বলিতেন। তাই তাঁহারা বিপদ-নিবারণ ও শত্রু-নাশের জন্য এবং অভীষ্ট সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভের নিমিত্ত সরলপ্রাণে দেবতাদিগের নিকট নিজেদের প্রার্থনা জানাইয়া নানা ভাবে স্তব করিতেন ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে হোম করিতেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ঐ প্রণালীর উপাসনায় তাঁহাদের মন তত তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল না। তাঁহারা দেখিলেন সাময়িক বিপদ নাশ হয়, সাময়িক দুঃখ দূর হয়, কিন্তু আবার বিপদ আসে, আবার দুঃখ আসে। কিসে দুঃখ ও বিপদের আত্যন্তিক নাশ হয়, কিসে মানব জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, কিসে পরম শান্তি লাভ হয় তাহারই উপায় জানিবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এইরূপ কিছু কাল চলিতে চলিতে, জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহারা ক্রমে বুঝিলেন, যাঁহাদিগকে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ভাবিয়া আরাধনা করিতেছেন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন নহেন, তাঁহারা একই মহাশক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। তাঁহাদের চিন্তা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে লাগিল। এই বিচিত্রতাময় জগৎ কোথা হইতে আসিল, কোথায়ই বা যাইবে; মানুষ কোথা হইতে আসিয়াছে, কি জন্য আসিয়াছে,

কেনই বা নানাবিধ ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছে, অবশেষেই বা সে কোথায় যাইবে, এই প্রকারের বিবিধ প্রশ্ন তাঁহাদের মন অধিকার করিয়া বসিল। "সেই ব্রহ্মই কি পরিদৃশ্যমান জগতের কারণ, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোন হেতু বশতঃ জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি, আমাদের আশ্রয়-স্থানই বা কি? হে ব্রহ্ম-বিদ্‌গণ, তোমরা কি বলিতে পার আমরা কি জন্য সুখ দুঃখের ব্যবস্থার অধীন হইয়া রহিয়াছি?" (১) এই হইল অতৃপ্ত হৃদয় হইতে উত্থিত প্রশ্ন।

বাহিরে ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সেই সময়ের ঋষিগণ মনকে ভিতরে ঘুরাইয়া আনিলেন। জগতের সকল বাসনা ও সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, সকলের কারণ স্বরূপ সেই এক মহা শক্তির ও সেই এক মহা সত্যের সন্ধান লইবার জন্য ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। বহুকাল ধ্যানের ফলে প্রাতঃকালে সূর্য্য যেমন পৃথিবী আলোকিত করিয়া উদিত হয়েন, সেইরূপ সেই মহা সত্যও তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন। তখন তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া গেলেন, অমৃত-ধারায় তাঁহাদের জীবনের চির পিপাসার শান্তি হইল। তাঁহারা ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট মানবের সমক্ষে প্রচার করিলেন, "যিনি ভূমা অর্থাৎ মহান্ বা বৃহৎ তিনিই সুখ, অল্পে অর্থাৎ ক্ষুদ্রে সুখ নাই। সেই ভূমাই সুখ স্বরূপ, সুতরাং ভূমাই বিশেষরূপে জানিবার

---

(১) কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ১।১।

বিষয়" (১)। যাঁহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না (অর্থাৎ যাঁহাতে কোনও প্রকারের ভেদ দর্শন হয় না) তিনিই ভূমা; আর যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু জানা যায় (অর্থাৎ যাহাতে নানা প্রকারের ভেদ দর্শন হয়, সুতরাং যাহা খণ্ড খণ্ড, অতএব সীমাবদ্ধ ও পরিবর্ত্তনের অধীন) সেই বস্তুই অল্প বা ক্ষুদ্র। যিনি ভূমা তিনি অমৃত (অবিনাশী), যাহা অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র তাহা মরণের অধীন। তিনি নিজ মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন, আবার তাঁহার মহিমায় ও তাঁহাতে কোন পার্থক্য নাই বলিয়া তিনি মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত নয় এরূপও বলিতে পারা যায়" (২)। "ইহলোকে মহিমা ও মহিমাশালী ব্যক্তি পরস্পর ভিন্ন। গো, অশ্ব, স্বর্ণ, রৌপ্য, ভৃত্য, স্ত্রী, ক্ষেত্র, গৃহ প্রভৃতিকে লোকের মহিমা বা ঐশ্বর্য্য বলা যায়, কিন্তু ব্রহ্মের সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না। জগতে বস্তুসকল সসীম, সুতরাং একটী আর একটীতে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহা ছাড়া কোন বস্তু নাই, অতএব তাঁহার মহিমা তাঁহারই স্বরূপভূত বা অন্তর্ভুক্ত, এই হেতু ব্রহ্ম বা ভূমা আপনা হইতে ভিন্ন মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত নহেন (৩)।"

---

(১) "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" ছান্দোগ্যোপনিষৎ। সপ্তমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশখণ্ডঃ।

(২) যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমাথ যত্র অন্যৎ পশ্যত্যন্যৎ শৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতং যদল্পং তৎ মৃতম্। (স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি) স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি। ঐ ঐ চতুর্ব্বিংশখণ্ডঃ।

(৩) গো অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। ঐ ঐ চতুর্ব্বিংশখণ্ডঃ।

এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা আর এক পদ অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান এবং অমৃতের খনি ভূমা, তাঁহাদের নিজ-আত্মরূপে, তাঁহাদের ভিতরেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের ভিতরে ও বাহিরে একই অমৃত-ধারা, একই চৈতন্যময় সত্তা। তখন তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, 'তিনিই অধোভাগে, তিনিই উপরিভাগে, তিনিই পশ্চাদ্ভাগে, তিনিই সম্মুখভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই সমস্ত। "অহং" অর্থাৎ "আমি" শব্দ দ্বারাও তাঁহাকেই বুঝায়। অতএব আমিই অধোভাগে, আমিই উপরিভাগে, আমিই পশ্চাদ্ভাগে, আমিই সম্মুখভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই সমস্ত (১)।' "ভূমাকে আত্মাও বলা যায় (২)। আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উপরিভাগে, আত্মাই পশ্চাদ্ভাগে, আত্মাই সম্মুখভাগে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই সমস্ত। ঐ ভূমা পুরুষকে এইভাবে দর্শন করিলে, চিন্তা করিলে এবং অনুভব করিলে সাধক আত্মাতেই আসক্ত, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল, আত্মাতেই একীভাবাপন্ন, আত্মাতেই আনন্দিত এবং স্বপ্রকাশ হয়েন। তিনি সকল লোকেই ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারেন; আর যিনি ভূমাকে দর্শন না করিয়া অন্য প্রকারের বস্তু দর্শন করেন তিনি অন্যের অধীন হয়েন, ক্ষয়শীল লোকে গমন

---

(১) স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি অথাতঃ অহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্ব্বমিতি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ। সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশখণ্ডঃ।

(২) ভূমা, অহং বা আমি ও আত্মার একত্ব বিষয়ে এই খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করেন এবং সকল লোকে ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারেন না (১)।” “যিনি ভূমা পুরুষকে এইভাবে দর্শন, মনন এবং অনুভব করেন, তিনি জানেন যে, আত্মা হইতেই প্রাণ, আশা, স্মৃতি, আকাশ, তেজ, জল, আবির্ভাব, তিরোভাব, অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাক্য, নাম, মন্ত্র, আত্মা হইতেই সমস্ত হইয়াছে (২)।” “সেই ভূমা বা পরমেশ্বর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় এবং মায়াবী, তিনি নিজের শক্তিসমূহ দ্বারাই এই লোকসকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। তিনি ঐ সকল শক্তি-প্রভাবেই এই বিশ্বের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হইয়া থাকেন। সৃষ্টি ও পালন কার্য্য একমাত্র তাঁহারই, অর্থাৎ তিনিই সকল কার্য্যের হেতু, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় হেতু নাই। ইহা

---

(১) অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এয এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি তস্য সর্ব্বেযু লোকেষ কামচারো ভবতি। অথ যেহন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি, তেযাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশখণ্ডঃ।

(২) তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবৌ আত্মতোহন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্ম্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্ব্বমিতি।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। সপ্তমাধ্যায়ে যড়বিংশখণ্ডঃ।

যাঁহারা অবগত হয়েন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন" (১), তাঁহারা জন্ম-মরণের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন (২)।

---

(১) য একো জালবানীশত ঈশনিভিঃ
সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশনিভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ।৩।১।

(২) বাসনাই জীবের দেহ-ধারণের কারণ। বাসনার নিবৃত্তি নাই, এক বাসনা পূর্ণ হইবামাত্র মনে আর এক বাসনার উৎপত্তি হয়। কামনার লক্ষ্য বস্তু ভোগ করিবার জন্য জীব শুভ, অশুভ বা শুভাশুভ মিশ্রিত নানাবিধ কর্ম্ম করে। এই সকল কর্ম্মের সংস্কার পর পর জন্মের বীজরূপে সঞ্চিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যে সকল কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইগুলির ভোগ শেষ হইলেই, এ দেহের পতন হইবে। তাহার পর এ জন্মের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যে সকল কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা চালিত হইয়া, ঐ সকল কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহ জীবকে ধারণ করিতে হইবে। শুভকর্ম্মের ফলে সুখ, অশুভ কর্ম্মের ফলে দুঃখ ও শুভাশুভ মিশ্রিত কর্ম্মের ফলে সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত অবস্থা লাভ হয়। জীব এই প্রকারে জন্ম-মরণের অধীন হইয়া সংসারে আসিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছে; সুতরাং যাবৎ বাসনার নিবৃত্তি না হইবে তাবৎ এইরূপে জন্মিতে ও মরিতে হইবে এবং অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু জীব যদি এমন কাহাকেও লাভ করে, যাঁহাকে পাইলে আর কোন বিষয়ে সাধ হয় না এবং যাহার তেজে প্রারব্ধ ব্যতীত সর্ব্ববিধ কর্ম্মসংস্কারই নষ্ট হইয়া যায়, তবে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগান্তে এই দেহ নষ্ট হইলে আর কিসের জন্য সে দেহ ধারণ

এইরূপে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, এক মহা শক্তিই নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদায় ভূতের ও ঘটনার মূলে অবস্থান করিতেছেন (১)। এই মহা শক্তি আবার যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, সেই ভূমা বা আত্মাকে দেখিলে, মনন করিলে, জানিতে পারিলে সকল যাতনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। তাঁহাকে পাইলে পরমানন্দ লাভ করা যায়, জন্ম মরণের যাতনা আর ভোগ করিতে হয় না। কি প্রকারে তাঁহাকে অনুভব করিয়া, তাঁহার সত্তায় নিজ সত্তা ঢালিয়া দিয়া, আনন্দামৃত পান করা যায় তাহার উপায়ও ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে বিষয় 'যোগ' নামক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

যাহারা ক্ষণিক সুখ বই বোঝে না, যাহারা আপাততঃ যে সুখ পাওয়া যায় তাহারই লোভে মুগ্ধ, তাহারা ভূমার অন্বেষণ করে না। কিন্তু ভূমার অনুভূতি ব্যতীত স্থায়ী শান্তিলাভ কখনই হইতে পারে না। সেইজন্য পরবর্ত্তী ঋষিগণ স্বল্পবুদ্ধি লোকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের হৃদয়ে ভূমার জ্ঞান আস্তে আস্তে বিকশিত করিবার জন্য, এই মহাসত্যের ইঙ্গিত সহকারে নানাবিধ পূজা, ধ্যান, জপ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ঐ সকল কার্য্য দ্বারা বিবিধ সাংসারিক সুখ লাভ হয় অনেক স্থলে এরূপ লোভ দেখাইতেও ত্রুটী করেন নাই। কি দুঃখের বিষয়, যাঁহাদের জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছিল তাঁহাদের অনেকেই মহামনা ঋষিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিলেন না, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ফলশ্রুতি লইয়াই চিরতরে ভুলিয়া রহিলেন; এ সকল

করিবে? না জন্মিলে আর মৃত্যুও নাই, সুতরাং জীব জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে চিরদিনের তরে নিস্তার পায় ও যাতনার চির অবসান হয়।

(১) ইচ্ছাশক্তিশ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিপ্রসূঃ সদা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

যে উচ্চতম সত্যে পৌছিবার সোপান বিশেষ (১) সে চিন্তা করিবার আবশ্যকতাই তাঁহারা বোধ করিলেন না!

যাঁহারা চিন্তাশীল ও বিচারপরায়ণ, যাঁহাদের চিত্ত ইন্দ্রিয়-সুখের মোহে মুগ্ধ নয়, যাঁহারা পরা শান্তির জন্য পাগল হইয়া তাহা অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে, স্থূল সাধনায় সময়ক্ষেপ না করিয়া, আর্য্যগণ ভূমাকে পাইবার জন্য অন্তর্মুখীন হইয়া সাধন করিবার যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহাই একমাত্র পথ (২)। বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া সময় নষ্ট করা আর তাহাদের উচিত নয়। মহর্ষিগণ অনাহারে, অনিদ্রায়, বহু তপস্যায় যে মহাসত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সত্যের উত্তরাধিকারী, সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত একমাত্র সুগম ও প্রকৃত পথে গমন করিয়া, সত্বর তাহা লাভ করা অন্বেষণশীল ব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

ভারতে যাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ স্তরের জ্ঞানী অথবা যোগী, তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মার উপাসক; এবং অবশিষ্ট হিন্দুদিগের অধিকাংশই সৌর, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য বা

---

(১) দক্ষশাপাদ্ ভৃগুশাপাদ্দধীচস্য চ শাপতঃ,
দগ্ধা যে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ;
তেষামুদ্ধরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা,
শৈবাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চৈব সৌরাঃ শাক্তাস্তথৈব চ
গাণপত্যা আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেণ তু।
দেবীভাগবতম্। ৭।৩৯।২৮—৩০।

(২) নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। শ্বেতশ্বতরোপনিষৎ। ৩।৮।

বৈষ্ণব ইহার কোন না কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা বহুদিন যাবৎ পুরাণাদি-প্রচারিত সৌর-শৈবাদি পঞ্চোপাসনার কোন একটী ধরিয়া রহিয়াছেন, এবং নিজের অবলম্বিত মতটীই মাত্র সত্য এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন-মতাবলম্বীর সহিত বিবাদ করিতেছেন অথবা তাঁহাকে ঘৃণা বা ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেছেন, তাঁহারা যাহাতে সাকার উপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ক্রমশঃ উন্নতির পথে গমন করিতে ও চরম সত্য লাভের অধিকারী হইতে পারেন, তাহার জন্য পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ঐ সকল উপাসনার বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:✿:—

পঞ্চোপাসনা।

সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বপ্রকার ভেদ-রহিত যে ভূমার কথা প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহার তত্ত্বরূপ পরম সত্য বুঝিতে পারা অল্পবুদ্ধি সাধারণ মানুষের পক্ষে বড়ই কঠিন (১)। গুণাতীত হইতে না পারিলে এই সত্যের অনুভূতি লাভ হয় না। মানুষ গুণের (২) মধ্যে রহিয়াছে এবং গুণেরই অধীন হইয়া চলিতেছে, সুতরাং সগুণ ব্রহ্মের (৩) তত্ত্ব সে সহজে ধারণা করিতে পারে। সেইজন্য প্রবর্ত্তককে সগুণ ব্রহ্ম-তত্ত্ব-বিষয়ে উপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। এই তত্ত্বের চর্চ্চা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় যখন নির্ম্মল হয় ও চিত্ত মার্জ্জিত হয়,

---

(১) ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
শ্রীমদ্ভগবতগীতা।১২।৫।

(২) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ।

(৩) ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ দুইটী অবস্থা। যে সমাধিতে ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান ইহার কোন জ্ঞানই থাকে না, কেবল 'আছি' এই বোধ মাত্র থাকে এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব হয়, সেই সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মের যে অবস্থা অনুভূত হয় তাহাই তাঁহার নির্গুণ অবস্থা। সেখানে কোন ভেদ দর্শন নাই সুতরাং কোনও

তখন তিনি নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক ও অধিকারী হয়েন। ভগবান কপিল মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত সাধক সকল ভূতে অবস্থিত ঈশ্বর আমাকে (আত্মাকে) নিজের হৃদয়-মধ্যে জানিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত সে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম (আশ্রমোচিত কর্ম্ম) করিবে, এবং মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে আমার অর্চ্চনা করিবে (১)।

দয়াশীল ঋষিগণ মানবদিগের হিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। সকল মানবের রুচি এক প্রকার নয়, বুদ্ধিশক্তিও সমান নয়। সুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন লোকের বোধের ও সাধনার সুবিধার নিমিত্ত, একই পরম সত্য তাঁহাদিগকে নানাভাবে প্রকাশ করিতে হইয়াছে (২)। সেই

ক্রিয়াও নাই; কাজেই কোন গুণেরই বিদ্যমানতা সেখানে দেখা যায় না; গুণ যদি সেখানে থাকে তবে তাহা লীন অবস্থায় থাকে (দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে যেমন গ্রহ নক্ষত্রাদির জ্যোতিঃ লীন থাকে)। এই অবস্থায় ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়। আর যখন আমরা স্থূল অথবা সূক্ষ্ম বিবিধ ক্রিয়ার বা দ্রব্যের ভিতর দিয়া ব্রহ্মের উপলব্ধি পাই, ব্রহ্ম যেন গুণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছেন মনে করি, তখনই তাঁহার সগুণ অবস্থা; এ অবস্থায় ভেদ দর্শন হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মকে সগুণ বলা হয়। নির্গুণ অবস্থা নিষ্ক্রিয় আর সগুণ অবস্থা সক্রিয়; নির্গুণ অবস্থা স্বরূপ আর সগুণ অবস্থা লীলা।

(১) মৃদাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।৩।২৯।২৫।

(২) বর্ত্তমানে সূর্য্য, শিব, ভগবতী, গণেশ ও বিষ্ণু এই পঞ্চ দেবতার প্রত্যেকেই এক সগুণ ব্রহ্মকে বুঝায়, ইহাই এ অধ্যায়ে দেখান হইবে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিকগণ বেদ ও পুরাণসমূহ আলোড়ন

হেতু বাহ্য দৃষ্টিতে হিন্দুর শাস্ত্রসকল পরস্পর বিরোধী বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। হিন্দুর দেব-দেবী নামে ও রূপে বহু বলিয়া লোকে হিন্দুদিগকে বহু-ঈশ্বরবাদী (১) বলিয়া থাকেন,

---

করিয়া ঐ পঞ্চ দেবতার উপস্থিত অবস্থায় আসা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, দেবতার রূপবিষয়ে মানব-সমাজের কল্পনার ক্রমবিকাশে নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে নানা দেবতার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং ঐ সকল সম্প্রদায়ের পরস্পর সংঘর্ষ ও অবশেষে সন্ধিস্থাপনের ফলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই বর্ত্তমান পঞ্চ দেবতার আসন দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের যুক্তি ও প্রমাণ অস্বীকার করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। ঐ সকল বিষয় আলোচনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। উদারমনা ও জনসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মগণ সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ধর্ম্মজগতে সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব এখনও দূরীভূত হয় নাই। এই বিদ্বেষ-ভাব নষ্ট করিয়া, যাহাতে মানুষ মানুষকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে, যাহাতে একই মহত্তম আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করিয়া মানুষ চিরশান্তিময়ের উপাসনা দ্বারা পরম শান্তি লাভ করিতে ও ইহজগতে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতে পারে, তাহারই নিমিত্ত মহাসমন্বয়ের ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে, এবং ইহাই বর্ত্তমান যুগে সকলের লক্ষ্য বস্তু হওয়া উচিত।

(১) সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ বস্তুই ব্রহ্ম। ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব তাঁহার দুইটী উপাধি। এই ব্রহ্মেরই কোন শক্তি সকল বস্তুকে পরিচালিত করিতেছেন এবং সূক্ষ্মতম হইতে স্থূলতম সমস্ত দ্রব্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন। চৈতন্যের আবেশ হেতু সেই শক্তি চৈতন্যরূপিণী বলিয়া অনুমিত হয়েন। সেই শক্তিরূপ উপাধিযোগে অর্থাৎ সেই শক্তির সংশ্রবে আসিলে ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হয়। সোজা

কিন্তু ঐ নাম ও রূপের পশ্চাদ্ দিকে দৃষ্টি করিলে, পূজা ও আরাধনা-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলে এবং স্তবগুলির প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল স্থানে একই বস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যে উপাসনা ও পূজা প্রভৃতি করিতে হয়, সে সমস্ত সেই একই পরম দেবতার উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে। উপাসক ও সমালোচকগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ ঐ নাম ও রূপ অবলম্বন করিয়া হিন্দুকে বহু-ঈশ্বরবাদী বলেন তাঁহারা পল্লবগ্রাহী ও ভ্রান্ত। এখানে অবশ্য ইহা বলা আবশ্যক যে, সাংসারিক সুখ, সম্পদ, শত্রুনাশ, রোগশান্তি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবী বা ভূতযোনি ইত্যাদির পূজা বা আরাধনা করা হয় তাহা বাস্তবিক ঈশ্বর-উপাসনা নহে, তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনের জন্য ভগবানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির আরাধনা মাত্র। তাহাতে ঈশ্বর-প্রাপ্তি ঘটে না, তাহাতে জন্ম-মরণ নিবারিত হয় না (১)। এই প্রকার আরাধনাকারীর হৃদয়ে কালে কালে ঈশ্বর-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা

কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, ব্রহ্ম যখন শক্তির সহায়তায় সকলের নিয়ামক ও পরিচালকরূপে অবস্থান করেন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়। হিন্দুর ন্যায়দর্শন, পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতিতে এই ঈশ্বরের কথাই আছে, আর ঈশ্বর বলিতে হিন্দুগণ ইহাই বুঝিয়া থাকেন। নিম্ন অধিকারিগণের সাধনার সুবিধার জন্য তাহাদের রুচি ও বুদ্ধিশক্তির অনুরূপ ঈশ্বরের নানাবিধ নাম ও রূপের কথা হিন্দুশাস্ত্রে থাকিলেও ঐ সকল নাম ও রূপ (অর্থাৎ নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং রূপের আধ্যাত্মিক ভাব) সেই একমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায়।

(১) যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

জন্মিতে পারে, এইহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্ত ও অর্থার্থী উপাসককে ভক্তশ্রেণীর মধ্যে ধরিয়াছেন (১), কিন্তু নারদভক্তিসূত্রে এরূপ ব্যক্তিদিগের ভক্তি ঈশ্বর-ভক্তি বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই (২)।

ব্রহ্ম একমাত্র ও নিরাকার। সাধকগণের হিতের জন্য, অর্থাৎ ধ্যান ও সাধনার সুবিধার জন্য, ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে (৩)। তন্ত্র প্রভৃতির মতে সূর্য্য, শিব, ভগবতী (শক্তি), গণেশ ও বিষ্ণু এই

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৭।২১-২৩।

যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
ঐ। ১৫।৬।

(১) চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
। ৭।১৬-১৭।

(২) ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ।
নারদভক্তিসূত্রম্। ২।৭।

(৩) চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥
জমদগ্নিবচনম্।

পঞ্চ দেবতার আরাধনা দ্বারা মনুষ্য জন্ম ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। এই পঞ্চ দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার অর্থাৎ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না (১)। এ মুক্তি অবশ্য গৌণ মুক্তি।

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণ-ক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্॥
... ...
অতস্তস্যাঃ কালশক্তে র্নিগুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥
... ...
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। ত্রয়োদশ উল্লাসঃ।

(১) সূর্য্যো গণপতির্বিষ্ণু র্মহেশো ভগবত্যপি।
পঞ্চৈতে দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রুতিভির্ব্রহ্মমূর্ত্তয়ঃ॥
এতৈ র্বিমুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
পঞ্চদেবৈর্বিনা মুক্তি র্ন ভবেদন্যদেবতৈঃ॥ ভৈরবযামলতন্ত্রম্।

বেদে প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে যাহা উক্ত আছে, তাহাতে দেখা যায় সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, মন প্রভৃতিকেও ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে গৌণভাবে মোক্ষ লাভ হয়। আমরা পুরাণ ও তন্ত্রের মতে পঞ্চো-পাসনার কথা এখানে বলিতেছি, কারণ বর্ত্তমানে এই গুলিই লোকে করিয়া থাকে। বৈদিক যুগে বাহ্য পূজায় দৃশ্যমান বিশ্বই ব্রহ্মের শরীররূপে গৃহীত হইত, ব্রহ্মস্মৃতির ইহাই ছিল স্থূল আলম্বন। বর্ত্তমানেও দ্বিজাতির বৈদিক সন্ধ্যায় গায়ত্রীর লক্ষ্য সূর্য্যদেব। বৈদিক

হিন্দুসমাজে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বর্ত্তমানে প্রধান পঞ্চ ধারায় বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই পঞ্চ ধারায় পঞ্চ সম্প্রদায় হইয়াছে, যথা :—সৌর, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও বৈষ্ণব। পুরাণ ও তন্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্য, শিব, ভগবতী, গণেশ ও বিষ্ণু এই পঞ্চ দেবতার প্রত্যেকেই সগুণ ব্রহ্মের বা আত্মার সহিত অভিন্ন; বাহ্য-দৃষ্টিতে মনে হয় যেন পৃথক পৃথক দেবতা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ এই পঞ্চ দেবতার মূর্ত্তি, দ্বিতীয়তঃ পূজা, তৃতীয়তঃ স্তবমালা, চতুর্থতঃ নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে এক এক করিয়া বিচার করিলে, দেখিতে পাইব যে, মহাজ্ঞানী ঋষিগণ একই মহিমময় পরম দেবতার আরাধনা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমতঃ এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান হইতে তাঁহাদের রূপের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণের নিমিত্ত আমরা চেষ্টা করিব। কালীমাতার ধ্যান ও তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং নারায়ণের রূপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সূর্য্য, শিব ও গণেশের রূপের আধ্যাত্মিক ভাব কোন কোন পুরাণে কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এক স্থানে পাওয়া কঠিন। আমরা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা দুইটীর আলোকে এই তিন দেবতার রূপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছি। ঐ পঞ্চ দেবতার রূপের আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা একই সগুণ ব্রহ্মে প্রযোজ্য :—

সন্ধ্যায় জলকেও সাধকের মঙ্গল বিধান করিতে বলা হয়। তান্ত্রিক সাধনায়ও মৃত্তিকা, জল, অগ্নি প্রভৃতির পূজা অল্পাধিক প্রবিষ্ট রহিয়াছে দেখা যায়। শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা ইহার একটী উদাহরণ।

১। সূর্য্যদেব রক্তপদ্মের উপর অবস্থিত, তিনি অনন্ত গুণের আধার, তাঁহার দুই হস্তে দুইটী পদ্ম ও অপর দুই করে বর ও অভয়, অঙ্গ অরুণবর্ণ, তিনটী চক্ষু, তিনি সমস্ত জগতের পতি (১)।

আধ্যাত্মিক ভাব, যথা,—তিনি রজোগুণোৎপন্ন এই জগতে অবস্থান করিতেছেন, রজোগুণ লোহিত বর্ণ, তাই তাঁহার আসনস্বরূপ এই জগৎকে রক্তপদ্ম বলা হইয়াছে; দুই হস্তে দুইটী পদ্ম, অর্থাৎ তিনি ভক্তের শান্তি ও প্রফুল্লতার বিধান করেন, কারণ পদ্ম শান্তি ও সৌন্দর্য্যের ভাব প্রকাশ করে; অথবা দুই হস্তে দুইটী পদ্ম অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ-রূপ পদ্ম ও সাধকের হৃৎপদ্ম উভয়ই তাঁহার হাতে—তাঁহাকে অনুভব করিলে সাধকের হৃদয়-রূপ পদ্ম বিকশিত অর্থাৎ প্রফুল্ল হয় এবং তাঁহারই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া বহির্জগৎ বা বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইতেছে (২); দুই হস্তে বর ও অভয়, অর্থাৎ তিনি জীবসকলকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করেন এবং সময় সময় তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন, অথবা তিনি সাধককে অভীষ্ট বর দান করেন এবং সর্ব্ব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার তিনটী চক্ষু অর্থাৎ অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়ই তিনি দেখিতে পান, অথবা চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, তাই চন্দ্র সূর্য্য

---

(১) 'রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥'

(২) জগৎ পূর্ব্বে মুকুলিত অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, পরে যে কল্পে উহা বিকশিত অর্থাৎ ব্যক্ত হইয়াছিল সেই কল্পকে পদ্ম-কল্প বলে। এখানেও জগতে পদ্মের আরোপ করা হইয়াছে।

ও অগ্নি তাঁহার তিন চক্ষু (১); তিনি অনন্ত গুণের আধার; তিনি সমস্ত জগতের অধিপতি অর্থাৎ তিনিই একমাত্র ঈশ্বর।

২। শিব পদ্মের উপর বসিয়া আছেন, তিনি রৌপ্যময় পর্ব্বতের মত শুভ্র; তাঁহার দেহ রত্ন-ভূষণের ন্যায় উজ্জ্বল; পরশু, মৃগ, বর এবং অভয় তাঁহার হস্তে; তিনি প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট; চতুর্দ্দিকে দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন; তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম; পাঁচটী মুখ; তিনটী চক্ষু; তিনি বিশ্বের বীজ স্বরূপ এবং বিশ্বের আদি; তিনি ভক্তের সকল ভয় নাশ করেন। সেই মহেশ্বর শিবকে ধ্যান করি (২)।

আধ্যাত্মিক ভাব, যথা,—তিনি রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র, নির্ম্মল, স্বচ্ছ; তাঁহার দেহ উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ তিনি সকলকে প্রকাশিত করেন, কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার চারি হস্তের চারিটী মুদ্রা চারি ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহার মধ্যে পরশু মুদ্রা শত্রুনাশ ও দুষ্টের দমন বুঝাইতেছে, এবং মৃগমুদ্রা (মৃজ্ ধাতু অনুসন্ধানার্থক) ভক্তে যাহা অনুসন্ধান করে (৩) তিনি তাহা দেন ইহাই প্রকাশ

---

(১) নমঃ সুরারিহন্ত্রে চ সোমসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষে। (পরে সূর্য্যস্তবের পাদটীকা দেখুন)

(২) 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥'

(৩) মানুষ সুখের অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুতেই যখন তৃপ্ত হইতে পারে না, তখন তাঁহাকে (শিবকে) অন্বেষণ করে, এবং তিনি (শিব) তাহার নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন।

করিতেছে অথবা তিনি পশুপতি, মৃগ শব্দের অর্থ পশু, মৃগ তাঁহার হাতে অর্থাৎ পশুগণ তাঁহার অধীন ; ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষায় পাশবদ্ধ জীবই পশু, সেই পাশবদ্ধ জীবগণ তাঁহার শাসনাধীনে আছে ; আর তাহাদের মধ্যে যে তাঁহার উপাসনা করে তিনি তাহার পাশ ছেদন করিয়া দেন অর্থাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন, এইজন্য তাঁহার অপর হস্তে পরশু নামক অস্ত্র। তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম অর্থাৎ তিনি কোন উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করেন নাই কারণ তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষাই নাই তাই তিনি কোন বিলাসের চিহ্ন ধারণ করেন নাই ; অথবা ব্যাঘ্র অতি লোভী জন্তু, সুতরাং ব্যাঘ্রের চর্ম্ম পরিধান দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, লোভ তাঁহা দ্বারা বিজিত হইয়াছে ; কিম্বা ব্যাঘ্র, মনুষ্য পশু প্রভৃতি জীবগণকে বিনাশ করিয়া, তাহাদের দেহ ভক্ষণ করে, ব্যাঘ্রচর্ম্ম মৃত্যুর চিহ্নরূপে যেন তাঁহার শরীরে বিদ্যমান, (অন্যান্য মৃত্যুচিহ্ন তাঁহার দেহে আভরণস্বরূপ, যথা,—বিনাশকারী বিষধর সর্প, মৃতদেহের অস্থি হইতে নির্ম্মিত মালা, শ্মশান হইতে সংগৃহীত চিতাভস্ম), অর্থাৎ তিনি বিনশ্বর জগতে একমাত্র অবিনশ্বর পদার্থ ; অথবা মৃত্যুকে অতিক্রম না করিলে, মৃত্যুকে ভেদ করিয়া উপাধিরাশি ত্যাগ করিতে না পারিলে, অমৃতরূপী তাঁহাকে লাভ করা যায় না—পরিহিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইতেছে। মুখের দ্বারা আহার করা হয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ভোক্তা আত্মা বিষয়রস আহরণ করেন, সেই নিমিত্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আত্মরূপী (১) শিবের পঞ্চ-মুখ-রূপে (২) কল্পিত হইয়াছে। পদ্মাসন, বর ও অভয় নামক

(১) "প্রপঞ্চোপশমং একাত্মপ্রত্যয়সারং শান্তং শিবমদ্বৈতং স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

(২) ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী উপনিষদে আত্মা পঞ্চাস্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

মুদ্রা এবং ত্রিনেত্র এই সকলের আধ্যাত্মিক ভাব সূর্য্যের ধ্যানের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

৩। কালিকা দেবীর অঙ্গ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা বিরাজিত; তাঁহার তিনটী চক্ষু, পরিধানে রক্তবস্ত্র, এক হস্তে বর অন্য হস্তে অভয়; তিনি রক্তপদ্মের উপর অবস্থিত; সুমধুর মাধ্বিক (অর্থাৎ মধুক-পুষ্প-জাত) মদ্য পান করিয়া মহাকাল সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার (কালিকা দেবীর) মুখ-কমল প্রফুল্ল হইয়াছে। সেই আদ্যা কালিকা দেবীর ভজনা করি (১)।

আধ্যাত্মিক ভাব, যথা,—(অল্পবুদ্ধি সাধকদিগের হিতের জন্য গুণ ও ক্রিয়া-অনুসারে অরূপা এবং চিন্ময়ী দেবীর নানাবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে।) শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণসমুদায় যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সমস্ত ভূত মহাপ্রলয়-সময়ে কালীতে (মূল প্রকৃতিতে) লীন হয় হেতু তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হয় (২); তিনি অমৃতরূপিণী

---

(১) মেঘাঙ্গীং শশীশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্।
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বিকমদ্যং মহাকালং
বীক্ষ্য বিকশিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। পঞ্চম উল্লাসঃ।

(২) উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্॥
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥
অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥

সেইজন্য তাঁহার ললাটে সুধাকর চন্দ্রের কলা বিদ্যমান; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিদ্বারা এই জগৎ প্রকাশিত হয় সেই হেতু চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি তাঁহার তিন চক্ষু। তিনি সমুদয় প্রাণীকে কালরূপ দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন ও গ্রাস করেন বলিয়া সকল প্রাণীর রুধিরই তাঁহার রক্ত বসন; সময়ে সময়ে জীবসকলকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করেন এজন্য তাঁহার দুই হস্তে বর ও অভয়। তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া তাঁহাকে রক্তপদ্মের উপর অবস্থিত বলা হয় (১)। বালকগণ যেমন হস্তামলক ফল হস্তমধ্যে আলোড়িত করিয়া পরে তাহার রস শোষণপূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করে, সেইরূপ মহাকাল (অনন্তকাল) বিশ্ব-রূপ মধুকপুষ্প নিষ্পেষিত করিয়া তাহার রস অর্থাৎ সারভাগরূপী অমৃত আত্মার আস্বাদ গ্রহণে

---

(১) নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্॥
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নিত্যৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥
গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ।
তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশি বাসোরূপেণ ভাসিতম্॥
সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্ব-স্ব-কার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্॥
রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। ত্রয়োদশ উল্লাসঃ।

মোহিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, দেখিয়া সর্ব্বসাক্ষিরূপিণী মা আমার হাসিতেছেন (১)।

৪। গণেশের শরীর খর্ব্ব ও স্থূল। তিনি গজেন্দ্রবদন, লম্বোদর ও সুন্দর। তাঁহার গণ্ডস্থল হইতে মদধারা ক্ষরণ হইতেছে এবং মধুকরগণ সেই মদগন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গণ্ডদেশ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি দন্তাঘাতে শত্রুগণকে বিদারিত করিয়াছেন এবং তাহাদের রক্তে সিন্দুরবর্ণ শোভাযুক্ত হইয়াছেন। তিনি গণসমূহের পতি এবং সমস্ত কর্ম্মের সিদ্ধিদাতা (২)।

আধ্যাত্মিক ভাব, যথা,—অজ্ঞানই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের উৎপত্তির হেতু, এবং তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবেই জগতের বিস্তার ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লীন হয়, আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মার শরীর, এইজন্য গণেশের খর্ব্ব এবং স্থূল দেহ দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইতেছে যে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে মায়ারচিত বিশাল বিশ্বের বিস্তার খর্ব্বীভূত হয়; এ জগৎ তাঁহারই মধ্যে অবস্থান করিতেছে, তাঁহারই সত্তা অবলম্বন করিয়া ইহার সত্তা প্রকাশ পাইতেছে, এ নিমিত্ত

---

(১) ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্।
পশ্যতি চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী॥
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। ত্রয়োদশ উল্লাসঃ।

(২) "খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥"

তিনি লম্বোদর; যে সাধক অন্তর্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করে তাহার চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়, তাই তিনি সুন্দর; তিনি অতি বৃহৎ, এ বিশ্ব তাঁহার একাংশে অবস্থিত, পশুগণের মধ্যে হস্তী অতি বৃহৎ, তাই তাঁহার বৃহত্ব বুঝাইবার জন্য হস্তীর মস্তক তাঁহার মস্তকরূপে কল্পিত হইয়াছে; অথবা তিনি গণপতি অর্থাৎ দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত গণের অধীশ্বর, সুতরাং সমুদায়-গণের সমষ্টি-বাণীই তাঁহার বাণী, আবার বাণী মুখদ্বারা উচ্চারিত হয়, সেইজন্য সেই সমষ্টি-বাণীর বিপুলত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তিনি গজেন্দ্রবদনরূপে কল্পিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার মুখ হস্তিমুখরূপে কল্পিত হইয়াছে; তত্ত্বজ্ঞানরূপ সুধার গন্ধে মত্ত হইয়া মুক্তিকামীরূপ মধুকরগণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। তিনি বিচাররূপ দন্ত দ্বারা সাধকের কাম-ক্রোধাদি শত্রুসকল নাশ করেন এবং ঐ সকল শত্রু নষ্ট হইলে তিনি সাধকের হৃদয়ে শোভমানরূপে প্রকাশ পান; তাঁহার ইচ্ছা-শক্তিতেই জগতের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে (১), জীব উপলক্ষ মাত্র (অজ্ঞানবশতঃ "আমি করি" বলিয়া মনে করে), তাই তিনি সর্ব্বকর্ম্মের সিদ্ধিদাতা; অথবা সমবেত চেষ্টাই দুরূহ কর্ম্মসিদ্ধির জননী, তিনি গণ-সমূহের অধিপতি, অতএব তিনি সমুদায় সমবেত চেষ্টার পরিচালক, এইজন্যই তাঁহাকে সিদ্ধি-দাতা বলে।

---

(১) ইচ্ছাশক্তিশ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিপ্রসূঃ সদা।
তত্রাসক্তশ্চ সগুণঃ স শরীরী চ প্রাকৃতঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

য এক জালবানীশত ঈশনিভিঃ,
সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশনিভিঃ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

৫। বিষ্ণু শান্ত, সর্পরূপ শয্যায় শায়িত, পদ্মনাভ, গগনসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ, লক্ষ্মীকান্ত, কমল-নয়ন, যোগিগণ কেবল ধ্যানদ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন; তিনি বিশ্বের আধার, ভবভয়হারী এবং সকল লোকের একমাত্র ঈশ্বর (১)।

আধ্যাত্মিক ভাব, যথা,—তিনি শান্ত অর্থাৎ স্থির, তিনি মায়ার অধীশ্বর, মায়া তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই যাবতীয় কার্য্য করিতেছে, তাই তিনি মায়াধীন বস্তুর মত চঞ্চল নহেন; অনন্ত নাগ অর্থাৎ অনন্ত-ফণাবিশিষ্ট সর্পের উপর তিনি শয়ন করিয়া আছেন, ইহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে তিনি অনন্তে অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত; নাগ বা সর্পের এক নাম ভুজগ এইজন্য ধ্যানে 'অনন্ত-শায়ী'র স্থানে 'ভুজগ-শয়ন' বলা হইয়াছে; পদ্মনাভ, বিশ্বই পদ্ম, সেই বিশ্বরূপী পদ্ম তাঁহার নাভিদেশে অবস্থিত (অর্থাৎ বিশ্ব তাঁহার একদেশে রহিয়াছে) (২); তিনি বিশ্বের আধারস্বরূপ বা আশ্রয়স্থান; তিনি লক্ষ্মীকান্ত, লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নিখিল ঐশ্বর্য্যই সেই পরম-দেব বিষ্ণুর, তাই তিনি লক্ষ্মীকান্ত; তিনি কমল-নয়ন অর্থাৎ পদ্মপলাশ-লোচন, প্রস্ফুটিত পদ্মের পাঁপড়ির ন্যায় তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত, তিনি সব ভাল করিয়া দেখেন (৩), তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, আবার তাঁহার দৃষ্টি পদ্মের ন্যায়

---

(১) 'ওঁ শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্॥'

(২) বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১০।৪২।

(৩) আমরা কোন জিনিষ ভাল করিয়া দেখিতে হইলে চক্ষু বিস্তৃত করিয়া দেখি।

কোমল এবং মনোহর অর্থাৎ তিনি সকলের প্রতি করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তিনি সকলের তত্ত্বাবধায়ক। যোগিগণ কেবল ধ্যান দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ ধ্যান না করিলে তাঁহার দর্শন বা অনুভূতি লাভ হয় না। তিনি ভবভয়হারী অর্থাৎ তিনি সংসার-বাসনা নাশ করিয়া সকল ভয় ও জ্বালা দূর করেন। তিনিই চতুর্দ্দশ লোক বা ভুবনের একমাত্র ঈশ্বর। কালিকা দেবীর কৃষ্ণবর্ণ হওয়া সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই বিষ্ণুরও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কারণ, যেহেতু তিনি নারায়ণ অর্থাৎ সকলের আশ্রয়স্থান।

[শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ, একাদশ অধ্যায়ে শৌনক ঋষি সূতকে বলিতেছেন, "লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কেবল চৈতন্যময়, কিন্তু তান্ত্রিকগণ উপাসনা-সময়ে তাঁহার অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও অলঙ্কারসকল যে সমুদায় তত্ত্বে কল্পনা করিয়া থাকেন তাহা আমার নিকট বল (১)।" এই কথা শুনিয়া সূত বলিতেছেন (২):—

প্রথমে মায়া প্রভৃতি নয় তত্ত্ব দ্বারা (অর্থাৎ প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রা এই নয় তত্ত্ব দ্বারা) বিকারময় (অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত-যুক্ত) বিরাট-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সচেতন বিরাট মূর্ত্তিতে ত্রিভুবন দেখা গিয়াছিল। ইহাই সেই পুরুষের

(১) তান্ত্রিকাঃ পরিচর্য্যায়াং কেবলস্য শ্রিয়ঃ পতেঃ।
অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পং কল্পয়ন্তি যথা চ যৈঃ॥
তন্নো বর্ণয় ভদ্রং তে ক্রিয়াযোগং বুভুৎসতাম্।
যেন ক্রিয়ানৈপুণ্যেন মর্ত্ত্যো যায়াদমর্ত্ত্যতাম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১২।১১।২-৩।

(২) মায়াদ্যৈ র্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকারময়ো বিরাট্।
নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্॥

রূপ। পৃথিবী ইহার পদদ্বয়, স্বর্গ ইহার মস্তক, আকাশ ইহার নাভি, সূর্য্য ইহার চক্ষু, বায়ু ইহার নাসা এবং দিকসকল ইহার কর্ণ। প্রজাপতি ইহার জননেন্দ্রিয়, মৃত্যু ইহার অপানদেশ (পায়ু), লোকপালসকল ইহার বাহু, চন্দ্র ইহার মন, যম ইহার্ ভ্রূযুগল। লজ্জা ইহার উত্তর ওষ্ঠ ও লোভ অধর ওষ্ঠ, জ্যোৎস্না ইহার দন্ত, ভ্রম ইহার হাস্য, বৃক্ষসকল ইহার রোম, মেঘ ইহার কেশরাজি। এই পৃথিবীতে মানব-দেহ যেমন তাহার নিজের সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত, এই মহাপুরুষের দেহও সেইরূপ তাঁহার নিজের সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত। ইনি কৌস্তুভচ্ছলে অজ নিজ আত্মচৈতন্যকে ও উহার ব্যাপক প্রভাকে সাক্ষাৎ শ্রীবৎসরূপে, নানাগুণময়ী নিজ মায়াকে বনমালারূপে, ছন্দকে পীত-বসনরূপে এবং ত্রিবৃৎস্বর অর্থাৎ ওঙ্কারকে ব্রহ্মসূত্র বা উপবীতরূপে ধারণ করেন। সাঙ্খ্য ও যোগ ইহার দুই মকর কুণ্ডল, সর্ব্বলোকের

এতদ্বৈ পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরো নভঃ।
নাভিঃ সূর্য্যোঽক্ষিণী নাসে বায়ুঃ কর্ণৌ দিশঃ প্রভোঃ॥
প্রজাপতিঃ প্রজননমপানো মৃত্যুরীশিতুঃ।
তদ্বাহবো লোকপালা মনশ্চন্দ্রো ভ্রুবৌ যমঃ॥
লজ্জোত্তরোঽধরো লোভো দন্তা জ্যোৎস্না স্ময়ো ভ্রমঃ।
রোমাণি ভূরুহা ভূম্নো মেঘঃ পুরুষমূর্দ্ধজাঃ॥
যাবানয়ং বৈ পুরুষো যাবত্যা সংস্থয়া মিতঃ।
তাবানসাবপি মহাপুরুষো লোকসংস্থয়া॥
কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ।
তৎপ্রভাং ব্যাপিনীং সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসমুরসা বিভুঃ॥
স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।
বাসচ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎস্বরম্॥

অভয়দানকারী ব্রহ্মপদ ইহার শিরোভূষণ। অনন্ত নামক অব্যাকৃত (প্রকৃতি) ইহার আসন, এই আসন ধর্ম্মজ্ঞানাদিযুক্ত সত্ত্বগুণ, ইহাকেই পদ্ম বলা হয়। তেজ, মনের বল ও বলযুক্ত মুখ্যতত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণই ইহার গদা, জলতত্ত্ব ইহার শঙ্খ, তেজস্তত্ত্ব ইহার সুদর্শনচক্র। আকাশ-রূপ আকাশতত্ত্ব ইহার তরবারি, তমঃ (তমোগুণ) ইহার চর্ম্ম অর্থাৎ ঢাল, কালই ইহার শার্ঙ্গনামক ধনু, কর্ম্ম ইঁহার তূণ (বাণ রাখিবার পাত্র), ইন্দ্রিয়গণ ইহার শর, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মন ইহার রথ, পঞ্চ তন্মাত্রা ইহার প্রকাশ বা রূপ, এবং মুদ্রা ইহার বরদানকারী, অভয়দানকারী প্রভৃতি মূর্ত্তি। সূর্য্যমণ্ডলই এই দেবতার পূজার স্থান, দীক্ষাই মানবের আত্মার সংস্কার, আর এই ভগবানের পরিচর্য্যা দ্বারা মানবের পাপক্ষয় হয়। সমগ্র ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-আদি ছয় গুণ ইহার হস্তস্থ লীলা-কমল এবং ধর্ম্ম ও যশ ইহার চামর ও ব্যজন। বৈকুণ্ঠধাম ইহার ছত্র, অকুতোভয়

বিভর্ত্তি সাখ্যং যোগঞ্চ দেবো মকরকুণ্ডলে।
মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্ব্বলোকাভয়ঙ্করম্॥
অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ।
ধর্ম্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে॥
ওজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ।
অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্॥
নভোনিভং নভস্তত্ত্বমসিং চর্ম্ম তমোময়ম্।
কালরূপং ধনুঃ শার্ঙ্গং তথা কর্ম্মময়েষুধিম্॥
ইন্দ্রিয়াণি শরানাহুরাকূতিরস্য স্যন্দনম্।
তন্মাত্রাণ্যস্যাভিব্যক্তিং মুদ্রয়ার্থক্রিয়াত্মতাম্॥
মণ্ডলং দেবযজনং দীক্ষা সংস্কার আত্মনঃ।
পরিচর্য্যা ভগবত আত্মনো দুরিতক্ষয়ঃ॥

ইহার নিজ ধাম, তিন বেদ ইহার বাহন গরুড় এবং পুরুষ (সমষ্টি ও ব্যষ্টি আত্মা) ইহার যজ্ঞ। স্বয়ং লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য-সমূহের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি) এই আত্মরূপী হরির বিনাশ-বিহীনা স্ত্রী। তন্ত্র-মূর্ত্তি (অর্থাৎ পঞ্চরাত্রাদি আগমই) ইহার পার্ষদগণের অধীশ্বর বিষক্‌সেন নামে খ্যাত, ইহার অণিমাদি অষ্টগুণই নন্দাদি দ্বারপাল। |

ঐ সকল মূর্ত্তি সগুণ ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্রিয়ার ব্যঞ্জক। একমনে চিন্তা করিলে ঐ সকল মূর্ত্তি যে যে ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। স্থূল-ধ্যানের অর্থাৎ স্থূল-মূর্ত্তি-চিন্তার পশ্চাতে যে যে সূক্ষ্মভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিলে, তাহা না বুঝিতে পারিলে, বিশেষ কোন উপকার লাভ হয় না। ঐ সূক্ষ্ম ভাব মনে করাইয়া দিবার জন্য, ঐ সূক্ষ্ম ভাবের উদ্দীপনার জন্যই, স্থূল মূর্ত্তি—স্থূল ধ্যান (১)। সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও ক্রিয়াসকল

ভগবান্ ভগশব্দার্থং লীলাকমলমুদ্বহন্।
ধর্ম্মং যশশ্চ ভগবাংশ্চামরব্যজনেঽভজৎ ॥
আতপত্রন্তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্।
ত্রিবৃদ্বেদঃ সুপর্ণাখ্যো যজ্ঞং বহতি পুরুষম্ ॥
অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ।
বিষক্‌সেনস্তন্ত্রমূর্ত্তির্বিদিতঃ পার্ষদাধিপঃ।
নন্দাদয়োঽষ্টৌ দ্বাস্থাশ্চ তেঽণিমাদ্যা হরের্গুণাঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১২।১১।৫-২০।

(১) মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভিষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্ম-ধ্যান-প্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে ॥
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। পঞ্চম উল্লাসঃ।

যেমন মুখে বলা যায়, যেমন অক্ষর-সমূহ দ্বারা শাস্ত্রে লিখিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তেমনি বিবিধ ধাতু-মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত দেব-দেবীর মূর্ত্তি দ্বারা, বা চিত্রপটে অঙ্কিত দেব-দেবীর ছবি দ্বারাও প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যেমন কোন একটী মনের ভাব মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায়, কাগজে লিখিয়াও প্রকাশ করা যায়, তেমনি উহা হাত বা মুখের ইঙ্গিত দ্বারাও প্রকাশ করা যায়।

এখন ধ্যানগুলি মিলাইলে দেখা যায় যে, বর্ণনার আধিক্য বা অল্পতা যাহাই থাকুক না কেন, ইহার প্রত্যেকটীই সেই একমাত্র সগুণ আত্মাকেই বুঝাইতেছে। সর্ব্বশক্তিমান, সকল লোকের ঈশ্বর আত্মা ব্যতীত আর কাহাতেও ঐ সকল বিশেষণ বা লক্ষণ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

পূজা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলেও, ঐ দেবতাসমূহের পূজা যে, আত্মার পূজা ছাড়া অন্য কিছু নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

কোন দেব বা দেবীর বাহ্য পূজায় যত প্রকার কার্য্য করিতে হয়, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ধরিয়া আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার আছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভিতরের ও বাহিরের শুদ্ধি সাধন না করা পর্য্যন্ত পূজা করিতে পারা যায় না; তমোগুণ ও রজোগুণের মধ্যে থাকা অবস্থায় মোক্ষ-সাধনার অধিকার হয় না। ভূতশুদ্ধি করিবার সময় "সোঽহং" অর্থাৎ "যাহার পূজা করিব আমিই সেই" এইরূপ চিন্তা করিবার ব্যবস্থা আছে (১)। বাহ্য পূজার পূর্ব্বে

(১) হৃদয়ে হস্তমাদায় আং হ্রীং ক্রোং হংস উচ্চরন্।
সোঽহং মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ নিধাপয়েৎ॥

মানস পূজা করিতে হয়। এই পূজায় নিজ মস্তকে পুষ্প অর্পণ করা হয়, এবং উহা মস্তকস্থ শিখায় গুঁজিয়া রাখা হয়। শিখার অন্ত নাম চৈতন্য (অপর ভাষায় "চৈতন্" বলে), সুতরাং মানস পূজায় দেহস্থ চৈতন্য-দেবের পূজা বুঝায়। মানস পূজার উপকরণ, যথা,—সাধকের হৃৎপদ্মই দেবতার আসন, সহস্রার পদ্ম হইতে নিঃসৃত অমৃত-ধারা পাদ্য, আচমনীয় ও স্নানীয় জল, মন অর্ঘ্য, আকাশতত্ত্ব বসন, গন্ধতত্ত্ব গন্ধ (চন্দন), চিত্ত পুষ্প, পঞ্চ প্রাণ ধূপ, তেজস্তত্ত্ব দীপ, সুধাসমুদ্র (সহস্রার-পদ্ম-নিঃসৃত অমৃত) নৈবেদ্য, অনাহতধ্বনি ঘণ্টার বাদ্য, বায়ুতত্ত্ব চামর এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসমূহ ও মনের চঞ্চলতাই নৃত্য। পঞ্চদশ প্রকার ভাবই পূজার বিবিধ পুষ্প, ইহা দ্বারা পূজা করিলে সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হয়। সেই পঞ্চদশ প্রকার ভাবরূপ পুষ্প, যথা,— মায়া, অহঙ্কার, রাগ, মদ, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ, ক্ষোভ, মাৎসর্য্য ও লোভ এই দশটীর অভাবরূপ দশ পুষ্প, আর অহিংসা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা এবং জ্ঞান এই পঞ্চ পুষ্প (১)। তদনন্তর ঘটস্থাপন একটী

ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং দেবী-ভাব-পরায়ণঃ।
সমাহিতমনাঃ কুর্য্যান্মাতৃকান্যাসমম্বিকে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। পঞ্চম উল্লাসঃ।

(১) হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্॥

ব্যাপার। ঘটের উপর একটী আম্রপল্লব দিতে হয়। তাহাতে তিনটী, পাঁচটী অথবা সাতটী পত্র থাকিবে। ঐ ঘট দেহ-ঘট ব্যতীত আর কিছু নহে; তিনটী পত্র তিন গুণ, পাঁচটী পত্র পঞ্চভূত, সাতটী পত্র সপ্ত ধাতু বুঝায়, অর্থাৎ দেহের উপাদানের সংখ্যানুযায়ী পত্র থাকা চাই। ঘটটী জলপূর্ণ করিয়া দিতে হয়। "জল" শব্দে "জ" ও "ল" এই দুইটী অক্ষর আছে; "জ" অক্ষরে "যাঁহা হইতে জগৎ জন্মে বা উৎপন্ন হয়" এবং "ল" অক্ষরে "জগৎ যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়" বুঝায়, সুতরাং "জল" শব্দের অর্থ ভগবান্ (১)। জলের এক নাম জীবন। ভগবান জীবনরূপে অর্থাৎ আত্মরূপে সর্ব্ব ঘটে বা দেহে অবস্থান করেন, এই ভাবটী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য জলপূর্ণ ঘট দিবার ও তাহাতে দেবতা আবাহনের ব্যবস্থা আছে। পূজার সময় যে সকল ফুল বেল-পাতা প্রভৃতি দেওয়া হয়, তাহা ঐ ঘটের উপর দিতে হয়, কারণ এই

অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা॥
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াক্ষমাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চ পুষ্পং ততঃ পরম্॥
ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। পঞ্চম উল্লাসঃ।

(১) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

দেহেই ভগবানের পূজা করিতে হয়। তাহার পর প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা আর এক গুহ্য রহস্য প্রকাশ করে। অভীষ্ট দেবতাকে হৃৎপদ্মে দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিশ্বাস-পথে আকর্ষণ করতঃ হস্তস্থিত পুষ্প-মধ্যে স্থাপন করিতে হয়, পরে সেই পুষ্প দ্বারা সম্মুখস্থিত প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া তাহাতে অভীষ্ট দেব বা দেবীর আবির্ভাব হইল ইহাই চিন্তা করিতে হয়। তদনন্তর পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি উপকরণ-দ্বারা বাহ্য পূজা করা হয়। পূজাশেষে বিসর্জ্জনের সময়, পূজাকালে যে সকল ফুল দেওয়া হইয়াছে, সংহার মুদ্রা দ্বারা তাহার একটী গ্রহণপূর্ব্বক নাসিকার নিকট আনিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইতে হয়, এবং ইষ্ট দেবতাকে নিশ্বাস-পথে লইয়া আবার হৃদয়ে স্থাপন করিলাম, এইরূপ ভাবনা করিতে হয় (১)। আরও বিসর্জ্জন দিবার সময় ঘটটী নাড়িয়া দিবার প্রথা আছে, ইহাতে এই বুঝা যায় যে, দেহ-ঘট

---

(১) চন্দনাগুরুকস্তূরি-বাসিতং সুমনোহরম্।
পুষ্পং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং করকচ্ছপমুদ্রয়া॥
নীত্বা স্বহৃদয়াম্বুজে ধ্যায়েদাদ্যাং পরাৎপরাম্॥
সহস্রারে মহাপদ্মে সুষুম্নাব্রহ্মবর্ত্মনা।
নীত্বা সানন্দিতাং কৃত্বা বৃহন্নিশ্বাসবর্ত্মনা।
দীপাৎ দীপান্তরমিব তত্র পুষ্পে নিযোজ্য চ॥
যন্ত্রে নিধাপয়েন্মন্ত্রী দৃঢ়-ভক্তি-সমন্বিতঃ॥

* * * *

ততঃ পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ ফলপত্রসমন্বিতাম্।
স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ ততঃ সংহারমুদ্রয়া।
তস্মাদ্দেবীং সমানীয় স্থাপয়েদ্ হৃদয়াম্বুজে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। ষষ্ঠ উল্লাসঃ।

হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, সেখানে আর তাঁহার পূজা হয় না। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইহা আত্মার পূজা ছাড়া আর কিছুই নহে। মন্ত্রগুলি অবশ্য দেবতা-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, কিন্তু প্রক্রিয়াগুলি একই প্রকার এবং লক্ষ্যও একই।

দেব-দেবীর যখন আরতি করা হয়, তখন ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ধূপ, দীপ, চামর ও জলশঙ্খ সঞ্চালন করিতে হয়। ইহাতে আকাশতত্ত্ব, ভূমিতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও জলতত্ত্বকে লক্ষ্য করা হয়। যে সকল তত্ত্ব দ্বারা জীবদেহে আত্মরূপী ভগবানের সেবা হইতেছে, বাহ্য আরতিতে সেইগুলির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়।

পূজা-বিষয়ে আর একটী অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় এ স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে শুধু সেই দেবতার পূজা করিলে চলিবে না; প্রথমতঃ গণেশাদি পঞ্চ দেবতার অর্চনা অবশ্যই করিতে হইবে, তাহার পর সেই দেবতার পূজা পঞ্চোপচারে, দশোপচারে অথবা ষোড়শোপচারে করিতে হইবে। এই প্রথা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য এই যে, ঐ পঞ্চ দেবতার কাহাকেও পূজা করিতে গিয়া, পূজক যেন ইহা ভুলিয়া না যান যে, ইঁহারা পরস্পর হইতে বিভিন্ন নহেন, এবং যে সগুণ ব্রহ্মকে তিনি নিজ প্রকৃতি অনুসারে এক ভাবে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই (সেই সগুণ ব্রহ্মকেই) অন্য চারি প্রকার লোক নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে অন্য চারি প্রকারে দেখিতেছেন।

এক্ষণে, পঞ্চ দেবতার যে স্তব আছে, তাহার কিছু কিছু গ্রহণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, ঐ স্তবগুলি একই পরম দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে। ঐ পঞ্চ দেবতার প্রত্যেক-কেই সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের কর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী আত্মা এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বরূপে উপাস্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব একটু চিন্তা

করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইঁহারা যদি পৃথক পৃথক দেবতা হইতেন, তাহা হইলে কখনও তাঁহাদিগকে একই প্রকার গুণ, কর্ম্ম ও অবস্থাযুক্ত বলা যাইত না।

সূর্য্যের স্তব।

সূর্য্যদেব মন্ত্রসংযুক্ত (অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা উপাস্য) এবং ভুবনসমূহের ঈশ্বর। আদিত্য ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই, তিনি পরমেশ্বর। * * হে ত্রৈলোক্যনাথ, হে ভূতপতে, হে কৈবল্য-নাথ, হে দিব্য-চক্ষুসম্পন্ন সূর্য্যদেব, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ ও তুমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব। তুমিই রুদ্রাত্মা এবং রুদ্র, তুমি বায়ু, তুমিই অগ্নি। * * আমার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং পার্শ্বে, অর্থাৎ আমার সর্ব্বদিকেই, তোমাকে সর্ব্বদা প্রণাম করি (কারণ তুমি সদা বর্ত্তমান এবং সর্ব্বব্যাপী) (১)। তুমি দেবতাগণের শত্রুবিনাশকারী; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তোমার চক্ষু, তুমি দিব্য ব্যোম

---

(১) আদিত্যো মন্ত্রসংযুক্ত আদিত্যো ভুবনেশ্বরঃ।
আদিত্যান্নাপরো দেবো হ্যাদিত্যঃ পরমেশ্বরঃ॥

* * * *

নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
নমঃ কৈবল্যনাথায় নমস্তে দিব্যচক্ষুষে॥
ত্বং জ্যোতিস্ত্বং দ্যুতির্ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমেব রুদ্রো রুদ্রাত্মা বায়ুরগ্নিস্ত্বমেব চ॥

* * * *

অগ্রতশ্চ নমস্তভ্যং পৃষ্ঠতশ্চ সদা নমঃ।
পার্শ্বতশ্চ নমস্তুভ্যং নমস্তে চাস্তু সর্ব্বদা॥

বা আকাশ-স্বরূপ এবং সর্ব্বতন্ত্রময় (অর্থাৎ সকল তন্ত্রই তোমার গুণ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে); একমাত্র বেদান্তদ্বারা তোমাকে জানা যায়। তুমি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মাদির সাক্ষী। হে হরিৎ-বর্ণ সুন্দর সূর্য্যদেব, তোমাকে প্রণাম করি। * * * যে মণ্ডল সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর আত্মা, শ্রেষ্ঠ ধাম এবং বিশুদ্ধ-তত্ত্ব-স্বরূপ, একাগ্র-চিত্ত সাধকগণ যোগ-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহাকে দেখিতে পান, সেই সূর্য্যের বরণীয় মণ্ডল আমাকে পবিত্র করুন (১)।

শিবের স্তব।

২। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তুমি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং তুমিই সর্ব্বসংহারকারক মঙ্গলদায়ক অনন্ত শিব। তুমি জ্যোতিঃ-স্বরূপ, সনাতন এবং গুণাতীত ঈশ্বর। তুমিই প্রকৃতি, প্রকৃতির ঈশ্বর, প্রকৃতি হইতে জাত বস্তু এবং প্রকৃতির অতীত। ভক্তদিগের ধ্যানের সুবিধার জন্য তুমি নানাবিধ রূপ বিধান করিয়াছ, যে যে রূপের প্রতি

---

(১) নমঃ সুরারিহন্ত্রে চ সোমসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষে।
নমো দিব্যায় ব্যোমায় সর্ব্বতন্ত্রময়ায় চ ॥
নমো বেদান্ত-বেদ্যায় সর্ব্বকর্ম্মাদিসাক্ষিণে।
নমো হরিতবর্ণায় সুবর্ণায় নমোনমঃ ॥

* * * *

যন্মণ্ডলং সর্ব্বগতস্য বিষ্ণো
রাত্মা পরমধাম বিশুদ্ধতত্ত্বম্।
সূক্ষ্মান্তরৈ র্যোগপথানুগম্যং
পুণাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥

ভবিষ্যপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে আদিত্যহৃদয়স্তোত্রম্।

ভক্তের প্রীতি আছে তুমি সেই সেই রূপ ধারণ কর। তুমি সকল তেজের আধার সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্য এবং শীতল-কিরণ দ্বারা শস্য সকলের পালনকর্ত্তা চন্দ্রও তুমি। তুমি বায়ু, তুমি বরুণ, তুমি বিদ্বান আবার বিদ্বানদিগের গুরু। তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী, তুমি মৃত্যুরও মৃত্যু, কালেরও কাল (১)। * * হে চন্দ্রশেখর, তোমার শিরোদেশে গঙ্গা বহমানা আছেন। তোমার বল, বীর্য্য, পরাক্রম, এই তপোবল এবং বিভূতি অতি অদ্ভুত। তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বিনাশকর্ত্তা; তুমিই ঐশ্বর্য্যদাতা। তুমিই অব্যয় এবং সূক্ষ্মপুরুষ, তুমি সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম (২)।

---

(১) ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা চ ত্বং বিষ্ণুঃ পরিপালকঃ।
ত্বং শিবঃ শিবদোঽনন্তঃ সর্ব্বসংহারকারকঃ॥
ত্বমীশ্বরো গুণাতীতো জ্যোতিরূপঃ সনাতনঃ।
প্রকৃতিঃ প্রকৃতীশশ্চ প্রাকৃতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
নানারূপং বিধৎসে ত্বং ভক্তানাং ধ্যানহেতবে।
যেষু রূপেষু যৎপ্রীতি স্তত্তদ্রূপং বিভর্ষি চ॥
সূর্য্যস্ত্বং সৃষ্টিজনক আধারঃ সর্ব্বতেজসাম্।
সোমস্ত্বং শস্যপাতা চ সততং শীতরশ্মিনা॥
বায়ুস্ত্বং বরুণস্ত্বং চ বিদ্বাংশ্চ বিদুষাং গুরুঃ।
মৃত্যুঞ্জয়ো মৃত্যোর্ম্মৃত্যুঃ কালকালো যমাত্মকঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে হিমালয়কৃতং শিবস্তোত্রম্।

(২) অহো বলং বীর্য্যপরাক্রমৌ চ
অহো বপুর্যোগবলং তবেদম্।
অহো বিভূতি স্তব দেবদেব
গঙ্গাজলপ্লাবিতচন্দ্রমৌলে॥

কালীর স্তব।

হে দেবগণের ঈশ্বরি, তুমি সর্ব্বরূপিণী এবং সকলের জননী; তুমি পরিতুষ্ট হইলেই সকলের পরিতোষ জন্মে। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র তুমিই তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান ছিলে, তোমার সেইরূপ বাক্য ও মনের অগোচর। পরব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছা হেতু তোমা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। "মহতত্ত্ব" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ ভূত "ক্ষিতিতত্ত্ব" পর্য্যন্ত এই জগৎ তোমা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সকল কারণের কারণ স্বরূপ সেই ব্রহ্ম নিমিত্ত মাত্র। তিনি সৎস্বরূপ এবং বিশ্বব্যাপী। তিনি সমুদায় বস্তুতে সর্ব্বদা একভাবে অবস্থান করেন, তিনি চিন্মাত্র ও নির্লিপ্ত। তিনি কিছুই করেন না, কিছুই ভক্ষণ করেন না বা কোন বস্তুবিশেষে সীমাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করেন না। তিনি সত্যস্বরূপ, আদি ও অন্ত রহিত এবং বাক্য ও মনের অগোচর। শ্রেষ্ঠ মহাযোগিনী তুমি তাঁহার (সেই ব্রহ্মের) ইচ্ছা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিতেছ। জগৎ-সংহারকারী মহাকাল তোমার একটী রূপ। এই মহাকাল মহা-প্রলয়ের সময় সমুদায় গ্রাস করিবেন। সকল জীবকে তিনি কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল এবং সেই মহাকালকে তুমি কলন অর্থাৎ গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম আদ্যা পরমা কালিকা (১)।

ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং
ত্বমেব মৃত্যুর্ধনদস্ত্বমেব।
ত্বমেব সূক্ষ্মঃ পুরুষোঽব্যয়স্ত্বং
ত্বমেব সূক্ষ্মাৎ পরমঞ্চ সূক্ষ্মম্॥ স্কন্দপুরাণে নীলকণ্ঠস্তবরাজঃ।

(১) ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ॥

গণেশের স্তব।

৪। যিনি সৎস্বরূপ ও আত্মরূপে বিরাজমান; যিনি সকলের আদি, মায়াতীত, শান্ত; যিনি চিন্তনীয় বা বোধগম্য নহেন; যাঁহার আদি মধ্য ও অন্ত নাই এবং যিনি একমাত্র, সেই একদন্তদেবের শরণাপন্ন হই (১)। যিনি অনন্ত, চৈতন্যস্বরূপ, গণসমূহের ঈশ্বর,

---

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসী স্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরংব্রহ্মসিসৃক্ষয়া॥
মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্॥
সদ্রূপং সর্ব্বতো ব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু॥
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তং অবাঙ্মনসো গোচরম্॥
তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্॥
তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। চতুর্থ উল্লাসঃ।

(১) সদাত্মরূপং সকলাদিভূতং
অমায়িনং শান্তমচিন্ত্যবোধম্।
অনাদিং মধ্যান্তবিহীনমেকং
তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥

যিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত, যিনি সাধকের হৃদয়ে প্রকাশরূপে অবস্থিত এবং তাঁহার (সাধকের) বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত, সেই একদন্তদেবের শরণাপন্ন হই। * * তাঁহার আজ্ঞায়ই বিধাতা সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু পালন করিতেছেন এবং শিব সংহার-কার্য্য করিতেছেন, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই। * * * * যিনি সকলের ভিতরে অতি গূঢ় বা লুকায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার রূপ অনন্ত, যিনি হৃদয়ে জ্ঞান দান করেন, সেই একদন্তদেব গণেশের শরণাপন্ন হই (১)।

বিষ্ণুর স্তব।

৫। (ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন :—) হে ভগবন্, তোমার আত্মস্বরূপ চৈতন্য দ্বারা সর্ব্বদা ভেদভ্রম দূর হয়, তুমি পরাৎপর এবং

---

(১) অনন্তচিদ্রূপময়ং গণেশং
হ্যভেদভেদাদিবিহীনমাদ্যম্।
হৃদি প্রকাশস্য ধরং স্বধীস্থং
তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥
* * * *
তদাজ্ঞয়া সৃষ্টিকরো বিধাতা
তদাজ্ঞয়া পালক এব বিষ্ণুঃ।
তদাজ্ঞয়া সংহারকো হরোঽপি
তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥
* * * *
সর্ব্বান্তরে সংস্থিতমেকগূঢ়ং
যদাজ্ঞয়া সর্ব্বমিদং বিভাতি।
অনন্তরূপং হৃদি বোধকং বৈ
তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥　একদন্তগণেশ-স্তোত্রম্।

জ্ঞানাশ্রয়; এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের জন্য মায়াকে আশ্রয় করিয়া তুমি ক্রীড়া করিয়া থাক, অতএব তুমি ঈশ্বর; আমি তোমাকে নমস্কার করি। মানবসকল মরণকালে অবশ হইয়া তোমার অবতার-সূচক পবিত্র নামাবলী স্মরণ কিম্বা উচ্চারণ করিলে এই জন্মের পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া সকল-আবরণ-শূন্য সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইয়া থাকে। তুমিই সেই ব্রহ্ম, তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। হে ভগবন্, তুমি আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল-বিশ্বরূপী বৃক্ষ, এবং তুমি স্বয়ং ইহার মূল অর্থাৎ জগতের মূলস্বরূপা যে প্রকৃতি তুমি স্বয়ং তাহার আশ্রয়-স্থল। এই মূলস্বরূপা প্রকৃতিকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ তিন গুণে বিভক্ত করিয়া, যথাকালে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জন্য আমাকে, শিবকে এবং বিষ্ণুকে তিনটী পদস্বরূপে ধারণ করিয়া, ত্রিপাদ হইয়া বৃদ্ধিশীল হইয়াছ। আমি তোমাকে নমস্কার করি (১)।

---

(১) শশ্বৎস্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-
মোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলা-
রাসায় তে নমঃ ইদং চকমেশ্বরায়॥ ১৪।
যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে।১৫।
যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ঞ্চ
স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্।
ভিত্বা ত্রিপাদ্ববৃধ এক উরুপ্ররোহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায়॥১৬। শ্রীমদ্ভাগবতম্।৩।৯।

[ভগবান্ বিষ্ণু দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি, ব্রহ্মা এবং শিব এই জগতের পরম কারণ; আমি আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষী, স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বপ্রকার উপাধি-শূন্য। আমি আমার ত্রিগুণময়ী মায়াকে আশ্রয় করিয়া, এই বিশ্বের সৃষ্টি পালন ও সংহারের জন্য, কার্য্য-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকি। অজ্ঞ ব্যক্তি সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম আমাতে ব্রহ্মা, রুদ্র, ভূত প্রভৃতি ভেদ দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ নিজের মস্তক-হস্ত-পদাদিতে যেমন পরকীয় বুদ্ধি করে না, তেমনি, যে ব্যক্তি আমার ভক্ত সে প্রাণিগণে ভেদজ্ঞান করে না। আমাদের তিন জনের, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের, একই স্বরূপ এবং আমরা সকল জীবের আত্মা। যে ব্যক্তি আমাদের তিন জনের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন না করে সেই শান্তি লাভ করে (১)।]

---

(১) অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥
আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥
তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥
যথা পুমান্ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥
ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।৪।৭।৪৭-৫১।

মোক্ষলাভের জন্য যে সকল দেব-দেবীর উপাসনা পুরাণে ও তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মহাপ্রাণ ঋষিগণ ঐ সকল নাম প্রকাশ করিবার সময় সগুণ ব্রহ্মের ভাবই উহার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা ঐ পঞ্চ দেবতার প্রত্যেকেরই দুই চারিটী নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের আলোচনা করিব।

(১) সূর্য্য—যিনি গমন করেন, যাঁহার গতিদ্বারা দিবা হয় অর্থাৎ জগৎ আলোকিত হয়, প্রকাশিত হয়; ব্রহ্মই জগৎ প্রকাশিত করিতেছেন, ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, সুতরাং মোক্ষের জন্য যে সূর্য্যের উপাসনা বিহিত হইয়াছে তিনি ব্রহ্মই।

সবিতা—জগতের প্রসবকারী। জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তিনিই সবিতা। বেদ বলেন ভূত সকল যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে ও যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে তিনিই ব্রহ্ম। এই হেতু "সবিতা" শব্দ ভূতগণের উৎপত্তির দিক দিয়া ব্রহ্মেরই অবস্থা-বিশেষ বুঝাইতেছে।

(২) শিব—যিনি শুভজনক, যিনি মঙ্গলময়, তিনিই শিব। প্রকৃত শুভ বা প্রকৃত মঙ্গল যদি কিছুতে থাকে তবে তাহা ব্রহ্মেই আছে। ব্রহ্মের উপাসনায় পরম-মঙ্গলরূপ মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়, অতএব "শিব" শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়।

মহাদেব—যিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি মায়োপহিত-ঈশ্বর-চৈতন্যরূপে সকল দেবতার মূলস্বরূপ তিনিই মহাদেব, তিনিই দেবাদিদেব, অতএব ব্রহ্ম।

ত্রিপুরারি—(পুর শব্দে দেহ বুঝায়।) জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহই ত্রিপুর বা তিনপুর, অর্থাৎ যাঁহাকে ভজন করিলে জীবের ত্রিবিধ

দেহ নষ্ট হওয়ায় মুক্তি লাভ হয়। সাধকের ত্রিবিধ-দেহ-নাশের উপায়-ভূত তত্ত্বজ্ঞানই ইঁহার ত্রিশূলনামক অস্ত্র।

(৩) আদ্যাশক্তি বা ভগবতীর নাম, যথা,—দুর্গা, তারা, জগদ্ধাত্রী, কালী, ইত্যাদি।

দুর্গা—"দুর্গ" শব্দে দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কুকর্ম্ম, দুঃখ, শোক, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় বুঝায়। এই সমুদায় যিনি নাশ করেন, তিনিই দুর্গা (১)। যাঁহার কৃপায় জীবের দুর্গতি অর্থাৎ ভবরোগ দূর হয় তিনিই দুর্গা। দুঃখে যাঁহাতে গমন করা যায়, কঠোর তপস্যা দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায়, তিনি দুর্গা।

তারা—যাঁহার উপাসনা করিলে জীব তরিয়া যায়, অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তার শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে তারা। "তার" শব্দে ব্রহ্মবীজ বা ওঙ্কার বুঝায়, সুতরাং তারা অর্থ ব্রহ্মময়ী।

জগদ্ধাত্রী—জগতের ধাত্রী অর্থাৎ পালনকর্ত্রী; যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ স্থিতি করিতেছে।

কালী—কালেরও কলন অর্থাৎ সংহার করেন যিনি, কালও যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় তিনিই কালী।

এই সকল নামই ব্রহ্মের আদি শক্তি প্রকাশ করিতেছে। শক্তি-মানকে শক্তি হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নয়, আবার শক্তিকে না ধরিলে শক্তিমান ব্রহ্মের অনুমান করাও অসম্ভব, সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। এই হেতু এই সকল নামেও সেই সগুণ ব্রহ্মবস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

---

(১) "দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
দুঃখে শোকে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি।
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ॥"

(৪) বিষ্ণু—যিনি অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া আছেন (১)।

নারায়ণ (২)—নার অর্থাৎ জল, কারণ-বারি (cause), মায়া, তাহার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থল, অতএব ব্রহ্ম। অথবা "নার" শব্দে নরসমূহ বুঝায়, নরসমূহের বা জীবগণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় যিনি তিনি নারায়ণ।

কৃষ্ণ—"কৃষ্" ধাতুর অর্থ আকর্ষক সত্ত্বা এবং "ণ" অর্থ নিবৃ´তি বা আনন্দ, সুতরাং "কৃষ্ণ" অর্থ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

হরি—যিনি ভক্তের সমস্ত তাপ হরণ করেন অর্থাৎ ভক্তকে পরা-শান্তি-রূপ মোক্ষ দান করেন, অথবা যিনি মহাপ্রলয়ে সমস্ত হরণ করেন অর্থাৎ আপনাতে বিলীন করিয়া লয়েন।

(৫) গণপতি, গণেশ—গণসমূহের অর্থাৎ দেবগণ, নরগণ রাক্ষসগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ, বৃক্ষগণ ইত্যাদি সমুদায় গণের (এক কথায় সমস্ত ভূতের) পতি বা ঈশ্বর তিনিই গণেশ, অতএব ব্রহ্ম।

এই প্রকারে আমরা সূর্য্য, শিব, কালী, গণেশ ও বিষ্ণু এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান, পূজা, স্তব এবং ঐ সকল দেবতার নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মিলাইয়া দেখিতেছি যে, এ সকল একই বিশ্বপ্রাণ দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে। এই বিশ্বপ্রাণ দেবতাকে লাভ করাই চিরশান্তি ও পরম আনন্দ লাভের একমাত্র উপায়। বাহ্য পূজাদির দ্বারা অনেকের চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল ও প্রশান্ত হয়, এবং তখন ঐ সকল স্থূল বিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। কিন্তু ইহা সুদীর্ঘ-সময়-

---

(১) 'বেবেষ্টি বিশ্বং ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ।'
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৯।৪।

(২) আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ বিষ্ণুপুরাণম্।

সাপেক্ষ। এজন্য স্থূলবুদ্ধি সাধকদিগকে উপদেশ দ্বারা ধীরে ধীরে সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে লইয়া যাওয়া জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য, নচেৎ অধিকাংশ লোকই পরা শান্তির পথ হইতে দূরে পড়িয়া থাকিবে।

এই অধ্যায়ে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের দুইটী অবস্থা, সগুণ ও নির্গুণ; তিনি স্বরূপে নির্গুণ, লীলায় সগুণ। সাধককে স্তরে স্তরে উঠাইয়া চরম সত্য নির্গুণতত্ত্বে পৌঁছানই হিন্দু-ধর্ম্মের লক্ষ্য। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাম ও রূপের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ না থাকিয়া, মুল ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিষৎ ও দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে যেরূপ ভাবে বর্ণিত আছে, তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলেই ভেদজ্ঞান ও বিবাদের কারণ দূরীভূত হইবে, এবং সাধনার পথ সরল ও সুগম হইয়া আসিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মাবাদ ।

হিন্দুধর্ম্মের চরম লক্ষ্য যে পরম দেবতা তাঁহাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ আত্মা, কেহ বা ভগবান্ বলেন (১)। জ্ঞানীরা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁহাকে আত্মা বলেন, এবং ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলেন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলেও এই তিন শব্দে একই বস্তুকে বুঝায়। "ব্রহ্ম" (২) শব্দে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ এবং ব্যাপক তাঁহাকেই বুঝায়। সুতরাং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপী সমগ্র বিশ্ব অবস্থান করিতেছে তিনিই ব্রহ্ম। "আত্মা" (৩) শব্দে যিনি ব্যাপক এবং জ্ঞাতা বা সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছেন, অর্থাৎ যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ সমস্তই পরিচালিত হইতেছে তাঁহাকেই বুঝায়। "ভগ" শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি। পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের যিনি আধার, সুতরাং যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া

---

(১) বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।২।১১।

(২) বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।

বিষ্ণুপুরাণম্।১।১২।৫৩

(৩) আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১১।২।৫৫

স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণাত্মক নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে এবং পরিচালিত হইতেছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, তিনিই "ভগবান্" (১)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অখিল বিশ্বের অন্তরালে আশ্রয়-স্বরূপে—সচ্চিদানন্দ-রূপে—যিনি অবস্থান করিতেছেন, ঐ তিন শব্দ একমাত্র তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। যেমন অন্ধকার আছে বলিয়া আলো বুঝা যায়, শীত আছে বলিয়া গ্রীষ্ম বুঝা যায়, দুঃখ আছে বলিয়া সুখ বুঝা যায়, সেইরূপ ঋষিগণ মায়াবাদের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।

এক্ষণে এই মায়া কি? মায়া যে কি তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণিত হয় নাই, তবে মায়ার কার্য্য ও মায়ার কতকগুলি অবস্থার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। শান্তিগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মায়া সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন (২):—"মায়া অতি আশ্চর্য্য, ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত, ইহার উৎপত্তি নাই, ইহা অনাদি। ইহার উৎপত্তি নাই, এজন্য ইহা স্বাভাবিক বলিয়া কথিত হয়। ইহা কোন বস্তু নহে, কিন্তু ব্রহ্ম-রূপ-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বস্তুর ন্যায় অর্থাৎ নাম-রূপে পরিণত হইয়া জগদাকারে প্রকাশিত হয় (৩)। সৎ অর্থাৎ

---

(১) ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

(২) এই অধ্যায়ে মায়াবাদের বিবরণ যতটুকু দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণই শান্তিগীতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। মূল শ্লোকগুলি প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ-গুণযুক্ত মৃত্তিকা হইতে কুম্ভকারের চেষ্টাবারা ঘট নির্ম্মিত হয়। ঘটের উপাদান যে পিণ্ডাকৃতি

আশ্রয়-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এবং অসৎ অর্থাৎ মায়ার কার্য্যভূত জগৎ হইতে মায়া ভিন্না কি অভিন্না ইহা কিছুই নির্ণয় করা যায় না, এজন্য ইহা অনির্ব্বচনীয়া (১); জ্ঞানের উদয় হইলে মায়া থাকে না এজন্য ইহার অন্ত আছে। মায়াতে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হয় বলিয়া তাহাকে ভাবরূপিণী বলা হয়। এই মহাবলবতী মায়া ব্রহ্মের শক্তি-বিশেষ, এবং ব্রহ্মের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাকে বিষয়ে পরিণত করে অর্থাৎ চৈতন্য-সত্তাকে অচেতন জড়ভাবে প্রতীত করায়। ব্রহ্মে কোন অন্যথা ভাব না ঘটাইয়া, তাঁহারই আভাসে আভাসবৎ হইয়া, ঈশ্বর ও জীবস্বরূপ কল্পনা করে বলিয়া, মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলে, এবং অজ্ঞান অবস্থায় জীবের মোহ জন্মায় বলিয়া ইহা বিমোহিনী। মায়ার বিক্ষেপ ও আবরণ নামে দুইটী শক্তি আছে, ইহার মধ্যে

মৃত্তিকা তাহাতে ঘট দেখা যায় না। ঘটের অব্যক্ত অবস্থা যাহা শক্তিরূপে মৃত্তিকাপিণ্ডে নিহিত ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইয়া ঘটের আকারে পরিণত হইল, নচেৎ ঘট মৃত্তিকা বই আর কিছুই নহে। ঘট মৃত্তিকাই, উহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও মৃত্তিকাই ছিল, আবার উহা মৃত্তিকাতে লয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকাই হইয়া যাইবে। মৃত্তিকাই সত্য, এই সত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অব্যক্ত শক্তি ঘটের নাম ও আকারে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ ব্রহ্মের শক্তি মায়া পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে, পরে জগদাকারে প্রকাশিত হয়, শেষে আবার ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এক ব্রহ্মই সত্য, এই সত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মায়াই নামরূপাত্মক জগৎ-আকারে প্রকাশিত হয়, সত্যের মত অনুভূত হয়।

(১) জগৎ-রূপ কার্য্য দ্বারা পরমাত্মার মায়া অনুভূত হয়। কাষ্ঠ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইলে ভস্ম হয়, কিন্তু এই কাষ্ঠে বা ভস্মে দাহিকা শক্তি অনুভূত হয় না। কিঞ্চিৎ অগ্নি সংযোগ করিলে কাষ্ঠমধ্যস্থ তেজই

আবরণ-শক্তিতে তমোগুণ আর বিক্ষেপ-শক্তিতে রজোগুণ অধিক আছে। এই মায়া বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণবিশিষ্টা হইলে বিদ্যা নামে কথিত হয়, এবং জীবের মোহ নাশ করে। তমোগুণের আধিক্য ও আবরণ-শক্তিবিশিষ্ট মায়াই অবিদ্যা। মায়া আর অবিদ্যাতে কোন ভেদ নাই ; সমষ্টি আর ব্যষ্টি এই ভেদ। সমষ্টি মায়া এক, সেই নানাভাবে প্রকাশ পায় (১)। মায়া চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াই আছে, চৈতন্যেই অবভাসিত হইতেছে, এবং চৈন্য-সত্তাকে গ্রহণ করিয়া নিজের আবরণ-শক্তি দ্বারা তাঁহার চিৎসত্তাকে আবৃত করে ও বিক্ষেপশক্তি দ্বারা তাঁহাকে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় জগদাকারে বিবর্ত্তিত করে।"

মায়ার এইরূপ বিবরণ শুনিয়া অর্জ্জুনের সন্দেহ হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ব্রহ্মের শক্তিই মায়া। ব্রহ্ম সদ্বস্তু, সুতরাং মায়াও সদ্বস্তু, তবে কেমন করিয়া তাহার নাশ হইতে পারে ? সদ্বস্তু ত কখনও বিনষ্ট হয় না। আর মায়া যদি মিথ্যা হয়, তাহার যদি অস্তিত্বই না থাকে, তাহা হইলেই বা তাহার নাশ কেমন করিয়া হইতে পারে ? অস্তিত্বই যাহার নাই তাহার আবার নাশ কি ?"

দাহিকাশক্তিরূপে প্রকাশ পায়, সুতরাং তেজ বা দাহিকা শক্তি কাষ্ঠের সঙ্গে অভিন্নভাবে আছে বলিতে হইবে। আবার কাষ্ঠ ও ভস্ম এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় দাহিকাশক্তি দেখা যায় সুতরাং উহা কাষ্ঠ ও ভস্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য আশ্রয়রূপ কাষ্ঠ ও কার্য্যরূপ ভস্ম হইতে দাহিকা শক্তি ভিন্ন কি অভিন্ন ইহা নির্ণয় করা যায় না। সেইরূপ আশ্রয়ভূত সদ্বস্তু ব্রহ্ম ও কার্য্যভূত অসদ্বস্তু জগৎ হইতে মায়ার ভেদাভেদ নির্ণয় করা যায় না বলিয়া উহা বিলক্ষণ ও অনির্ব্বচনীয়া।

(১) একই মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের নানাবিধ সংমিশ্রণ হেতু নানা আকারে প্রকাশ পায় এবং তাহাই জগৎ।

এই কথার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "ভাবময়ী মায়ার কথা তোমাকে বলিতেছি, শুন। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি নামে উক্ত হয়। যখন ইহা সমস্ত জগৎ আপনাতে লয় করিয়া উদাসীনভাবে অবস্থান করে তখন ইহাকে প্রধান বলে। বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে ইহা নষ্ট হয় বলিয়া ইহাকে অবিদ্যা কহে, আর ব্রহ্মের আশ্রয়েই থাকে বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হয়। চৈতন্য ব্যতীত অন্যত্র ইহার প্রকাশ নাই, এবং চৈতন্য ব্যতীত অন্যত্র ইহা অবস্থানও করে না, এইজন্য ব্রহ্মবাদিগণ ইহাকে ব্রহ্মের শক্তি কহেন। শক্তিতত্ত্ব তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। চিৎ ও জড় ভেদে ব্রহ্মের দুই প্রকার শক্তি উক্ত আছে। চিচ্ছক্তিরূপিণী মায়া ব্রহ্মের স্বরূপ, সমস্ত জগৎকার্য্য ইহা দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া ইহাকে কার্য্য-প্রসাধিনী বলা যায়, আর এই শক্তি বিকারবিহীন। জড়শক্তিরূপিণী মায়া বিকারবিশিষ্টা। (ব্রহ্মের এই দুই শক্তি অগ্নির দুই শক্তির সহিত তুলনা করিয়া বিশেষরূপে বুঝান হইতেছে) অগ্নির দুইপ্রকার শক্তি আছে, দাহিকা শক্তি ও প্রকাশিকা শক্তি। কিন্তু দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা বলিবার যো নাই। কোন জিনিস দাহ করার পূর্ব্বে ইহা কোথায় কি ভাবে ছিল তাহা জানা যায় না, কার্য্যের দ্বারা ইহা জানা যায়, কোন দ্রব্য দগ্ধ করা রূপ কার্য্য দ্বারা ইহার অনুমান হয়। মণি-মন্ত্রাদিযোগে দেখা যায় যে, অগ্নি আছে (অর্থাৎ অগ্নির প্রকাশিকা শক্তি আছে) কিন্তু তাহার দাহিকা শক্তি আর নাই (কোন জিনিস তাহা দ্বারা দগ্ধ হয় না), সুতরাং এখানে দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে; আবার ইহাও দেখা যায় যে, অগ্নি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতেই দাহিকা শক্তি নাই, সুতরাং ইহা অগ্নি হইতে ভিন্ন নয় এ কথা স্বীকার করিতে হয়। (মন্ত্রাদিযোগে

স্থিত) অগ্নিতে ও কার্য্যরূপ স্ফোটকে দাহ-শক্তি নাই, অথচ অগ্নি ভিন্ন আর কিছুরই দাহিকা শক্তি দেখা যায় না, অতএব ইহা (দাহিকা শক্তি) অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়। ব্রহ্মের যে জড়া মায়াশক্তি তাহাও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় ও অদ্ভুত (১)। অগ্নির প্রকাশিকা শক্তি কখনও অগ্নি হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে না, আর এই শক্তি না থাকিলে অগ্নিই হয় না, সুতরাং এই প্রকাশিকা শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলিয়াই জানিতে হইবে, সেইরূপ ব্রহ্মের চিৎ-শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপই। অগ্নির দাহিকা শক্তির মত ব্রহ্মের জড়া মায়ায় বিকার ও বিনাশ আছে। মিথ্যা বস্তুর তত্ত্ব জানিলেই তাহার নাশ হয়, অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়রূপে জানিলেই তাহার নাশ হইল (২)। অজ্ঞানীদিগের মোহ-কারিণী মায়া সাধকের তত্ত্ববিচাররূপ দৃষ্টিতে পতিত হইলে নাশ প্রাপ্ত হয়, আর সেই মায়ার নাশ হইলে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়। যাঁহারা মায়ার স্বভাব জানেন মায়া তাঁহাদের নিকট থাকিতে চাহে না।”

---

(১) ব্রহ্মের জড়া শক্তি মায়া জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কোথায় কিভাবে ছিল জানা যায় না, কেবল তাহার কার্য্য জগৎ দৃষ্টে তাহার অনুমান করা যায়। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র সে উদিত হয় না এজন্য তাহাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিতে হয়। আবার নাম-রূপাত্মক জগতেও মায়ার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না, কারণ নাম বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত শব্দ মাত্র এবং রূপ মনের কল্পনারই পরিণাম মাত্র।

(২) একগাছি রজ্জু চন্দ্রের আলোকে পড়িয়া আছে, হঠাৎ তাহাতে দৃষ্টি পড়াতে একটী সর্প বলিয়া ভ্রম হইল। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল উহা সর্প নহে রজ্জু, তখন সর্পের মত দেখা গেলেও উহা আর সর্প বলিয়া জ্ঞান হইবে না। সর্প বলিয়া যে জ্ঞান হইয়াছিল তাহা মিথ্যা বলিয়া জানাতেই সর্পজ্ঞানরূপ মিথ্যার নাশ হইল।

শান্তিগীতার পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা যায় অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন, "মায়া অবস্তু ও মিথ্যারূপিণী, সুতরাং তাহার কোন কার্য্যও সম্ভব নহে। বন্ধ্যার পুত্র যুদ্ধে পটু ও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, এ কথা যেমন অসম্ভব, মায়ার কার্য্য কি সেইরূপ নয়? আকাশে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের গন্ধে বস্ত্র সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে, এ কথা যেমন অসম্ভব, হে যাদব, মায়ার কার্য্য-বিস্তারও আমার নিকট সেইরূপ বলিয়া মনে হয়।"

শ্রীভগবান্ উত্তর করিলেন, "হে ভারত, মিথ্যা বস্তুর নানা প্রকার কার্য্য দেখা যায়। রজ্জুতে যদি সর্প বলিয়া কাহারও ভ্রম হয় তবে তাহার ভয় জন্মে, সে কাঁপিতে থাকে। আবার ঝিনুক দেখিয়া যদি কাহারও রৌপ্য বলিয়া ভ্রম জন্মে তবে সে তাহাতে মোহিত হয়, এবং তাহা রৌপ্য বলিয়া সংগ্রহ করিবার জন্যও তাহার লোভ জন্মে। সেই প্রকার মিথ্যা মায়া এই ব্যবহারিক জগৎ প্রকাশ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকৃত তত্ত্ব যিনি জানেন তাঁহার নিকট মায়া মিথ্যা। মায়া মিথ্যা, তাহার কার্য্যরূপ জগৎও মিথ্যা, জীব তাহা দর্শন করে। এই সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া অবভাসিত হয়; স্বপ্নকালে জীব যাহা কিছু দেখে, যে কিছু ব্যবহার করে, সে সমুদায়ই সে সময় সে সত্য বলিয়া মনে করে, সেইরূপ অজ্ঞ জীব মায়ার কার্য্য সত্য বলিয়া জানে এবং তাহাতে মোহিত হয়। জাগ্রত হইলে স্বপ্নের সমুদায় বিষয় মিথ্যা বলিয়া জানা যায়, তখন যেমন কিছুই থাকে না, সেই প্রকার যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তাঁহার পূর্ণজ্ঞানের নিকট মায়া বা তাহার কার্য্য জগৎ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যেমন সূর্য্য উদিত হইলে তাহার জ্যোতিতে অন্ধকার ও অন্ধকারের কার্য্য কিছুই প্রকাশ পায়না, তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মায়া ও মায়ার কার্য্যও সেইরূপ প্রকাশ পায় না।"

উক্ত গ্রন্থেরই সপ্তম অধ্যায়ে অর্জ্জুন পুনরায় বলিতেছেন, "শ্রুতিতে দেখা যায় ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম ত নির্গুণ, নির্ব্বিকার এবং নিষ্ক্রিয়, তবে তাঁহা হইতে জগৎ কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল, তাহা আমাকে বলুন।"

শ্রীভগবান্ বলিলেন, "সৃষ্টি নাই, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বরও নাই; নানাবিধ নাম ও রূপবিশিষ্ট বস্তুসকল মায়াতেই দৃষ্ট হইতেছে এবং ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। যেমন মহাসাগরের গম্ভীর প্রশান্ত জলরাশিতে বায়ুবশতঃ তরঙ্গ উত্থিত হয়, কিন্তু ঐ তরঙ্গ-সকল সমুদ্রের জল ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই প্রকার পূর্ণ চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম-সমুদ্রে মায়া-প্রভাবে জগৎ-রূপ তরঙ্গ দেখা যায়, জগৎ ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মায়া দ্বারা চৈতন্য-বস্তুই জগৎ-রূপে অবভাসিত হইতেছে। নিদ্রিত সময়ে স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখা বা শুনা যায়, তাহা যেমন তখন সত্য বোধ হইলেও, জাগ্রত অবস্থায় সে সমস্ত কিছুই সত্য বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপ যতদিন মায়ার মোহ থাকে ততদিন জগৎ নিত্য ও সত্য পদার্থ বলিয়া মনে হয়, মায়ার মোহ কাটিয়া গেলে আর উহা নিত্য ও সত্য পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয় না। যেমন বাজিকর নানাবিধ বস্তু দেখাইলেও, উহা তাহার ইন্দ্রজালের প্রভাব মাত্র, সে কোন বস্তু সত্য সত্যই প্রস্তুত করে না বা দেখায় না, সেইরূপ জীবের জ্ঞান-চক্ষু মায়ার মোহিনী শক্তিতে অভিভূত হওয়ায় জগদ্ব্যাপার সমস্ত মিথ্যা হইলেও জীব তাহা সত্য বলিয়া দেখিতেছে। অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বেদে বাহ্য-দৃষ্টিতে জগৎ-সৃষ্টির কথা বর্ণিত হইয়াছে; প্রপঞ্চ-রহিত ব্রহ্মকে সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বারা প্রপঞ্চিত করিয়া পুনরায় ব্যতিরেক দ্বারা প্রপঞ্চসকল যে ব্রহ্ম নয় ইহা প্রতিপাদন করিয়া, ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চত্ব দেখান হইয়াছে। বালকগণের প্রীতির জন্য ধাত্রী যেমন কল্পিত গল্প বলে, আমিও সেইরূপ

অজ্ঞানীদের বোধের নিমিত্ত কল্পিত জগৎ-সৃষ্টির গল্প তোমার নিকট বলিতেছি, শুন :—

নির্ম্মল এবং পূর্ণ চৈতন্যের কোন এক দেশে চৈতন্যের সত্তা-প্রকাশকে আশ্রয় করিয়া অণুমাত্র অজ্ঞান উদিত হয়। সেই অজ্ঞান নিজেরই শক্তিভেদে পরিণত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগের নাম মায়া, অপর ভাগের নাম অবিদ্যা। সত্ত্বগুণপ্রধান মায়াতে চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব প্রতিভাসিত হয়, এই প্রতিবিম্বে বা চিদাভাসে চৈতন্যের অধ্যাস (১) হওয়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর নামে কথিত হয়েন। সেই ঈশ্বর মায়াবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-শক্তিমান্ হয়েন এবং ইচ্ছাদি সর্ব্ব-প্রকার কর্তৃত্বগুণ সম্পন্ন হয়েন। তখন তিনি স্বেচ্ছায় সঙ্কল্পবান্ হওয়াতে, "এক আমি বহু হইব" এই সঙ্কল্প তাঁহাতে উত্থিত হইল। তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্প হওয়াতে মায়া হইতে মহাকাল নামক কালের উৎপত্তি হইল। মহাকালের শক্তি মহাকালী; তিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আদ্যা বলা হয়। কালে সমস্ত উৎপন্ন হয়, কালে অবস্থান করে, এবং কালেই লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সমস্তই কালের বশ। এই সর্ব্বব্যাপী মহাকাল নিরাকার এবং বিকার-রহিত, কেবল উপাধিযোগেই নানাভাবে ভাসিত হয়। নিমেষ, মুহূর্ত্ত, পল, দণ্ড, কল্প, যুগ প্রভৃতি এক কালেরই অংশরূপে কল্পিত হয়। কাল হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। গুণভেদে অহঙ্কার তিন

---

(১) যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে তাহাই জ্ঞান করার নাম অধ্যাস। কাহারও স্ত্রী বা পুত্রের দুঃখ হইলে সে আপনাকে দুঃখী মনে করে, তাহার কোন দুঃখ হয় নাই, স্ত্রী বা পুত্রের দুঃখ সে নিজের উপর আরোপ করিয়া লইয়াছে, ইহাই অধ্যাস।

প্রকার, যথা, সত্ত্ব-প্রধান অহঙ্কার, রজঃ-প্রধান অহঙ্কার এবং তমঃ-প্রধান অহঙ্কার (১)। অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হয়, সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের তামস-অংশ পঞ্চীকৃত (২) হইয়া স্থূল পঞ্চভূত অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে এক এক জ্ঞানেন্দ্রিয় (৩), সমস্ত সূক্ষ্ম ভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ (৪), প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভূতের

---

(১) সত্ত্বগুণপ্রধান অহঙ্কার শান্তবৃত্তিযুক্ত এবং স্বচ্ছ, এ জন্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সত্তা তাহাতে চৈতন্য ও আনন্দরূপে প্রকাশিত হয়; রজোগুণপ্রধান অহঙ্কার ঘোরবৃত্তিযুক্ত, এজন্য তাহাতে ব্রহ্মের সত্তা শুধু চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হয়; এবং তমোগুণপ্রধান অহঙ্কার মূঢ়-বৃত্তিযুক্ত, এজন্য তাহাতে ব্রহ্মের সত্তা শুধু সত্তারূপেই প্রকাশিত হয়।

(২) সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের মধ্যে এক ভূতের আট আনা অংশ ও অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের দুই আনা অংশ (মোট আট আনা অংশ) একত্র মিলিত হইয়া একটী স্থূল ভূত হয়; যথা সূক্ষ্ম আকাশের আট আনা অংশ ও সূক্ষ্ম বায়ু, অগ্নি, জল এবং মৃত্তিকা প্রত্যেকের দুই আনা করিয়া আট আনা অংশ একত্র করিয়া স্থূল আকাশ সৃষ্ট হয়। এইরূপে অপর চারি স্থূল ভূতের সৃষ্টি হয়। ইহাই পঞ্চীকরণ নামে কথিত হয়।

(৩) আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, অগ্নির সত্ত্বাংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনেন্দ্রিয় ও মৃত্তিকার সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

(৪) সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা-বৃত্তি-বিশিষ্ট মন, নিশ্চয়াত্মিকা-বৃত্তি-বিশিষ্ট বুদ্ধি, অনুসন্ধানাত্মিকা-বৃত্তি-বিশিষ্ট চিত্ত এবং অভিমানাত্মিকাবৃত্তি-বিশিষ্ট অহঙ্কার, এই চারি প্রকার অন্তঃকরণ।

রজঃ-অংশ হইতে এক এক কর্ম্মেন্দ্রিয় (১), এবং সমস্ত সূক্ষ্ম ভূতের মিলিত রজঃ-অংশ হইতে পঞ্চবৃত্তিময় (২) প্রাণ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের তামস-অংশ-জাত স্থূল পঞ্চ ভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড ও শরীর প্রভৃতি স্থূল সৃষ্টি হয়। মায়া-উপাধিযুক্ত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অবিদ্যা-উপাধিযুক্ত চৈতন্য জীব নামে কথিত হয়। মায়া শুদ্ধ-সত্বগুণ-প্রধানা, আর অবিদ্যা তমোময়ী। এই তমোময়ী মলিন-সত্বগুণ-প্রধানা অবিদ্যা আবরণ-শক্তিযুক্তা। অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা জীব অবিদ্যার আবরণ-শক্তি হেতু অল্পজ্ঞ এবং অবিদ্যার অধীন। জলে এক বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করিলে তাহা নানারূপে বিস্তৃত হয় কিন্তু জল-ভাব প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ অনন্ত পূর্ণ চৈতন্যের কোন এক দেশে অণুমাত্র মহামায়া বিজৃম্ভিত হইয়া নানাপ্রকার নাম ও রূপে বিস্তার লাভ করে। মায়া ব্রহ্মে কোন প্রকার বিকার জন্মাইতে পারে না, কেবল নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-শক্তি-বলে চৈতন্যকেই নানা আকারে দেখায় মাত্র। অধিষ্ঠানভূত নির্ম্মল চৈতন্যে যাহা কিছু দেখা যায় সে সকলই স্বপ্নবৎ,

---

(১) আকাশের রজঃ-অংশ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজঃ-অংশ হইতে হস্ত, অগ্নির রজঃ-অংশ হইতে পদ, জলের রজঃ-অংশ হইতে উপস্থ ও মৃত্তিকার রজঃ-অংশ হইতে পায়ু, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

(২) হৃদয়ে প্রাণ, তাহার কার্য্য নিশ্বাস-প্রশ্বাস; গুহ্যদেশে অপান, তাহার কার্য্য মলমূত্রাদি পরিত্যাগ; কণ্ঠদেশে উদান, তাহার কার্য্য ভক্ষ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ, বমন উদ্গার ইত্যাদি; নাভিতে সমান, তাহার কার্য্য ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া তাহার সার ও অসার অংশ বিভাগ করণ; এবং সর্ব্বশরীরে ব্যান, তাহার কার্য্য সকল স্থানের উপযোগী রসাদির সঞ্চালন দ্বারা সমস্ত শরীরের পুষ্টিসাধন।

সে সকলই বিবর্ত্ত মাত্র, অর্থাৎ ঝিনুকে রজত-ভ্রমের ন্যায়। আকাশে ধূম বিস্তৃত হইলে তাহা যেমন আকাশকে স্পর্শ বা মলিন করিতে পারে না, মায়া ও মায়ার কার্য্য সেইরূপ অধিষ্ঠান-ভূত ব্রহ্মকে স্পর্শ বা মলিন করিতে পারে না।”

ইহাই শাস্ত্রে মায়াবাদ নামে প্রসিদ্ধ। যিনি বিশ্বের বীজ, যাঁহাতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাঁহাতে পৌছিতে গেলে এইরূপ ব্যতিরেকক্রমে (analytical wayতে) বিচার করিতে হয়। তাহার পর অন্বয়ক্রমে (synthetical wayতে) বিচার দ্বারা “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম”, ব্রহ্মই সব হইয়াছেন বা সকলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন দেখা যায়।

পঞ্চদশীনামক বেদান্তগ্রন্থের মতে মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য “ঈশ্বর”, সমষ্টি সূক্ষ্মদেহে অভিমানী ঈশ্বর “হিরণ্যগর্ভ” ও সমষ্টি স্থূলদেহে বা সমষ্টি স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে অভিমানী হিরণ্যগর্ভ “বৈশ্বানর” বা “বিরাট” নামে অভিহিত হয়েন। অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্যষ্টি চৈতন্য “প্রাজ্ঞ”, ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহে অভিমানী প্রাজ্ঞ “তৈজস” এবং ব্যষ্টি স্থূলদেহে অভিমানী তৈজস “বিশ্ব” (মনুষ্য পশু প্রভৃতি জীব) নামে কথিত হয়েন। হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত আপনার ঐকাত্ম্যভাব অবগত আছেন, এজন্য তাঁহাকে সমষ্টি বলে। প্রাজ্ঞ জীবের ভোগের নিমিত্ত ঈশ্বরের আজ্ঞায় তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চভূতের সত্বাংশ হইতে যথাক্রমে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সম্মিলিত সত্বাংশ হইতে মন ও বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এবং রজঃ-অংশ হইতে যথাক্রমে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও সম্মিলিত রজঃ-অংশ হইতে পঞ্চ প্রাণ উৎপন্ন হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ উপাদানে সমষ্টি ও ব্যষ্টি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ নির্ম্মিত হয় (১)।

---

(১) বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈ র্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

এই ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহাভিমানী জীবের ভোগের জন্য এবং ভোগায়তন শরীরের জন্য ভগবান্ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে পঞ্চীকৃত করিয়া স্থূল পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তাহাতে চতুর্দ্দশ ভুবন, অন্নাদি ভোজ্য পদার্থ ও তাহা উপভোগের জন্য জরায়ুজাদি অনেক প্রকার শরীর উৎপন্ন হইয়াছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব মায়াবাদীদিগের মতে, মিথ্যা হইলেও, স্থূলবুদ্ধি লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ভক্তদিগের মতে অনেকাংশে সেইরূপই। মায়াবাদীদিগের মতে সৃষ্টি আদৌ হয়ই নাই, উহা মায়ার বিজৃম্ভন মাত্র, ভক্তদিগের মতে সৃষ্টি বাস্তবিকই হইয়াছে, উহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে। মায়াবাদী বলেন এক ব্রহ্মই আছেন, জগৎ-রূপে যে বিবিধ ভেদ-দর্শন হইতেছে উহা মায়ার কার্য্য-মাত্র,—ব্রহ্ম অবিকৃতই আছেন, তাঁহাতে কোন বিকার সম্ভবে না। ভক্ত বলেন ব্রহ্ম আপন ইচ্ছায় জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু এইরূপে পরিণত হইলেও তিনি বিকৃত হন নাই, তিনি নিজ স্বরূপে থাকিয়াই তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে ঐরূপেও পরিণত হইয়াছেন (১)। এই দুই পক্ষের কথা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই পক্ষ এক কথাই

---

(১) পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎ-রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্তে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥

বলিতেছেন, দুই পক্ষই স্বীকার করিতেছেন যাহাকে আমরা জগৎ বলি উহা পৃথক্ কোন বস্তু নহে, উহা ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। তবে মায়াবাদী বলিতেছেন মায়া বা অজ্ঞানই ব্রহ্মকে জগৎ-রূপে দেখাইতেছে, আর ভক্ত বলিতেছেন ভগবান্ নিজ প্রকৃতি বা মায়াকে অবলম্বন করিয়া নিজ স্বরূপে থাকিয়াই ঐরূপেও পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্ম সত্যই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বিবাদ করিয়া লাভ নাই, কারণ জগৎ কাহারও সাধনার লক্ষ্য নহে, জ্ঞানিগণও ব্রহ্মকেই চাহেন আর ভক্তগণও ভগবান্‌কেই চাহেন। ভক্তগণ জগৎ সত্য বলিলেও ইহা বিকার-রহিত, ভোগাসক্ত পার্থিব জীবনই জীবের লক্ষ্য, এমন কথা স্বীকার করেন না; তাঁহারাও জাগতিক দুঃখ-মিশ্রিত অনিত্য-সুখ পরিত্যাগ করিয়া ইহার অতীত নিত্য সুখধামে যাইতে চাহেন। ভক্তগণ জগৎ সত্য বলিলেও কার্য্যতঃ উহা মিথ্যার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ও হেয় বলিয়া পরিহার করিতেই চাহেন, এবং জ্ঞানিগন জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও ইহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। সুতরাং পক্ষপাতশূন্যভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই দুই শ্রেণীর সাধকের মনোবৃত্তির কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকায়, তাঁহাদের বিচারের ধারা একটু পৃথক্ রকমের হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই লক্ষ্য ক্ষুদ্র জাগতিক সুখের অতীত নিত্য পরমানন্দ লাভ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরে অচিন্ত্য শক্তি এ কোন্ বিস্ময়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আদিলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নাই। যোগবাশিষ্টে বশিষ্টদেব রামচন্দ্রকে, শান্তিগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মায়াবাদ শিক্ষা দিলেও এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর মায়ার বিজৃম্ভন, স্বপ্ন-কল্পনা-মাত্র, বলিয়া উড়াইয়া দিলেও, আমরা দেখিতে পাই সেই বশিষ্টদেব, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও শঙ্করাচার্য্য ব্যবহারিক জগতে কর্ত্তব্য কর্ম্মে কোন প্রকার অবহেলা করেন নাই, বরং তাঁহাদের কর্ম্মই জগতের লোকের কর্ম্মের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং সংসারাশ্রমে থাকিয়া, যাঁহারা মায়াবাদের দোহাই দিয়া নিজে অলস হয়েন, অপরকে অলস করেন এবং ব্যবহারিক জগতের সুখশান্তিকর কর্ম্মনিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া বিভ্রাটের সৃষ্টি করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

জীব ও জগৎ নাই, উহা ভ্রমকল্পনা মাত্র, বলিতে হয় বল, কিন্তু এ কথা স্বীকার না করিয়াই উপায় নাই যে, ঐ ভ্রমদর্শন আছে বলিয়াই ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে। দুঃখ না থাকিলে সুখের জন্য কে লালায়িত হইত? সুখ ক্ষণস্থায়ী না হইয়া চিরস্থায়ী হইলে শান্তির জন্য ব্রহ্মের সন্ধান লইবার কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকিত না। আবার সুখ-দুঃখ থাকিয়াও যদি তাহার ভোক্তা কেহ না থাকিত, তাহা হইলে সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত কাহাকে বৈরাগ্যের পথে, অনাসক্তির পথে প্রধাবিত করিত? সুতরাং ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া রূপ-নামের তরঙ্গে গড়া এই জীবজগৎ যেমন রহিয়াছে, তেমনি ইহা আছে বলিয়াই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা উঠিতেছে, এই হিসাবে ব্রহ্ম ইহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন বলা যাইতে পারে। ভ্রান্তিময়ই হউক আর আপেক্ষিক-সত্তা-সম্পন্নই হউক এই বৈচিত্রময় জগতের বিশেষ প্রয়োজন আছে (১); ইহাকেই ভক্তেরা সচ্চিদানন্দ ভগবানের

(১) অনিবৃত্তেঽপীশসৃষ্টে দ্বৈতে তস্য মৃষাত্মতাম্।
বুদ্ধ্বা ব্রহ্মাদ্বয়ং বোদ্ধুং শক্যং বস্ত্বৈক্যবাদিনা॥

আনন্দের লীলা বলিয়া থাকেন। ইহা আছে বলিয়াই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের মহিমা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

মায়াবাদের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয়, বিষ্ঠা ও চন্দনে সমান জ্ঞান জন্মে ইত্যাদি যে সকল কথা চলিত আছে, তাহাতে অনেকেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, মাটী, পাথর এ সবার মধ্যে কোন ভেদই দেখেন না একই দেখেন, এ সব তাঁহাদিগের নিকট বাহ্য পার্থক্য হারাইয়া একই প্রকার হইয়া যায়, বিষ্ঠা ও চন্দনের গন্ধের পার্থক্য তাঁহাদের অনুভব হয় না। বাস্তবিক তাহা নহে, তাঁহারা পূর্ব্বে উহাদের আকার প্রকার গুণাদি যেমন যাহা দেখিতেন বা অনুভব করিতেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর ঐ সকলের পার্থক্যের অনুভূতি তাঁহাদের সেইরূপই (তত তীব্রভাবে না থাকিলেও) থাকে, কেবল জ্ঞানের ধারাটা অন্য প্রকার হইয়া যায় (১)। তাঁহারা দেখেন জগতের সকল বস্তুই পঞ্চ-তন্মাত্রা ও পঞ্চভূতাত্মক, সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অতএব একরূপে

প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ।
বিরোধিদ্বৈতাভাবেঽপি ন শক্যং বোদ্ধুমদ্বয়ম্॥
অবাধকং সাধকঞ্চ দ্বৈতমীশ্বরনির্ম্মিতম্।
অপনেতুমশক্যঞ্চেত্যাস্তাং তদ্দ্বিষ্যতে কুতঃ॥

পঞ্চদশী।৪।৩৯-৪১।

(১) প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
ন কিঞ্চিদপি বৈষম্যমস্ত্যজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ॥
ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়োর্ব্বেদপাঠাপাঠকৃতা ভিদা।
নাহারাদাবস্তি ভেদঃ সোঽয়ং ন্যায়োঽত্র যোজ্যতাম্।

পঞ্চদশী।৬।২৬৭-২৬৮।

স্থায়ী নহে। এই হেতু উহাদের এক অবস্থায় জীব সুখ অনুভব করিলেও কিছু পরেই ঐ দ্রব্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখেরও অন্তর্ধান হয়। দুঃখ সম্বন্ধেও এইরূপ। জাগতিক সমস্ত বিষয়েরই অনিত্যত্ব এইরূপে অনুভব করায়, জগতের কোন বিষয়েই আর তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা বা বিদ্বেষ থাকে না। কাজেই তাঁহাদের আসক্তি ও বিদ্বেষের হ্রাস হওয়ায়, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং চিত্ত ক্রমশঃ বিশ্রাম লাভ করিয়া চিরসত্য সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জগতের কোন বস্তুরই যখন চিরস্থায়িত্ব বা সুখকরত্ব প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা করা হইল না, তখন আর এতগুলি কথা বলার প্রয়োজনীয়তা কি? প্রয়োজনীয়তা আছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আধার ব্রহ্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে, মানবগণ যেমন দেহাত্মবাদী হইয়া ইহ সংসারে শারীরিক সুখ লাভের আশায় অতিমাত্র লালায়িত হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় পরস্পর বিবাদ করিয়া ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করে, তেমনি এই সংসারের কোন সত্তাই নাই, এক নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই সত্য, এই জ্ঞানের ধূয়া ধরিলে, অনধিকারী ব্যক্তিগণ এই সংসারের যাবতীয় কর্ম্মেই উদাসীন হইয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া বসে, এবং তজ্জন্য পৃথিবীতে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ-দারিদ্রের পূর্ণ বিকাশ উপস্থিত হয়। ভারতের অনেক নর-নারী এই পরবর্ত্তী বিষয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

আত্মানাত্ম-বিবেক, ইহামুত্র ফল-ভোগে বৈরাগ্য, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান এবং মুমুক্ষুত্ব এই সকল না থাকিলে বেদান্ত-বাক্য শ্রবণেই অধিকার জন্মে না। কিন্তু, এই সমস্ত আছে কয় জনের? অথচ ঐ সব গুণ না থাকিলেও "জগৎ মিথ্যা" বলিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া, অনেকেই যথেচ্ছাচার করিতেছেন, অথবা নিতান্ত অলসভাবে জীবন যাপন করিতেছেন,

এবং তাহার ফলে নিজেরা অধোগামী হইতেছেন ও সংসারে সর্ব্ব-সাধারণের অশান্তি উৎপাদন করিতেছেন—সুখের নামে কেবল দুঃখই অর্জ্জন করিতেছেন। শম, দম ও তিতিক্ষা দ্বারা কতটা শান্তি লাভ হইতে পারে, তাহার প্রতি অতি কম লোকেরই দৃষ্টি আছে। তাহার পর, সৎপথে থাকিয়া চেষ্টা দ্বারা সাংসারিক সুখ ও নৈতিক উন্নতি কতটা লাভ করা যাইতে পারে, তাহার দিকেও অতি অল্প লোকেই মনোযোগ দিয়া থাকেন। প্রকৃতই যাঁহারা বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণযুক্ত তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প, এবং সংসারে যখন তাঁহাদের প্রয়োজনই তেমন বিশেষ কিছু নাই ও তাঁহারা যখন চৈতন্যসত্তার ধ্যানেই অধিক সময় মনোনিবেশ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা জগৎ সত্য বা মিথ্যা যাহা হয় ভাবুন, তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু, শতকরা নিরানব্বই জনই যখন ততদূর অগ্রসর নয়, এবং জগতে তাহাদের প্রয়োজনও যথেষ্ট আছে, তখন এই অস্থায়ী বাসস্থানেও যে কয়েক দিনের জন্যই হউক যাহাতে একটু আরামে ও শান্তিতে থাকিতে পারা যায়, সদ্ভাবে থাকিয়া ও সৎপথে চলিয়া তাহার ব্যবস্থা করা তাহাদের উচিত। এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহাদের চিত্ত কিঞ্চিৎ সুস্থ অবস্থায় আসিবে, তখন চিরশান্তিময় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা ধারণায় আনিবার সুযোগও তাহাদের আসিবে। যাহারা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, ব্যাধি-পীড়ায় যাহাদের জীবন যায় যায়, চতুর্দ্দিকেই যাহারা অভাবে পীড়িত, পিতা-মাতা-পুত্র-কলত্রের কাতর ক্রন্দনে যাহাদের হৃদয়ে বৃশ্চিক-দংশন অনুভূত হইতেছে, তাহাদের নিকট যতই উপাদেয় ও যুক্তিযুক্ত কথা বলা যাউক না কেন, তাহা কখনই তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে না।

সর্ব্বশেষে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াই এ অধ্যায় শেষ করিব। শ্রুতিতে আছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—"এ সমস্তই ব্রহ্ম";

কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন, সুতরাং এ সকল যখন ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ইহারা স্বরূপতঃ সেই ব্রহ্মবস্তুই, কেবল নাম ও রূপের জন্য অর্থাৎ উপাধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে। "নেতি নেতি," "ইহা নহে, ইহা নহে" এইরূপ করিয়া উপাধি বাদ দিতে দিতে গিয়া সমাধিতে যেরূপ স্বরূপে পৌছান গেল, সেইরূপ সেখান হইতে পুনরায় যখন অনুলোমক্রমে নামিয়া আসিতে হয়, তখন আবার "ইতি ইতি", "ইহাই সেই বস্তু, ইহাই সেই বস্তু," অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে কারণরূপে ছিল তাহাই এই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ করিয়া নামিলে, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই এই সব হইয়াছেন ইহা জানাতে, ব্রহ্মেরই লীলা দেখা গেল ; অতএব সমাধিতেও তাঁহাকেই দেখা, আর জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে তাঁহাকেই দেখা—এটা নিত্যই আনন্দ অনুভবের এক সুবর্ণ সুযোগ। এরূপ সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু জগৎকে "কিছু না, দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র" বলিয়া উড়াইয়া দিলে, সাধক যখন সমাধি হইতে নামিয়া আসেন, তখন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ সত্তা স্মরণ করিয়া, এবং "যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, বুঝিতেছি সে সবই ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান, সুতরাং ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা", এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহাকে স্বরূপ-জ্ঞানে অবস্থিতি করিতে হয়। এই প্রকার জাগতিক বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকিয়া, দ্রষ্টৃরূপে অবস্থান করিতে পারিলে পরম আনন্দ লাভ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা দেহধারী জীবের পক্ষে বড়ই কঠিন (১)।

---

(১) ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥

এক্ষণে, যুগপৎ নির্গুণ ও সগুণ যে পূর্ণব্রহ্ম তাঁহারই বিষয় পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১২।২-৫।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:*:—

ব্রহ্মতত্ত্ব।

যাঁহাকে জানিলে জীব অমরত্ব লাভ করে, যাঁহাকে জানিলে জীব জন্ম-মরণের হাত হইতে চির দিনের তরে নিস্তার লাভ করে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ বা প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করা যায় এমন ভাষা নাই। ব্রহ্মোপনিষৎ বলিতেছেন, "মন এবং বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে অর্থাৎ যে বস্তু পর্য্যন্ত গমন করিলে মন এবং বাক্য আর অগ্রসর হইতে পারে না—বাক্‌শক্তি ও মন লয় প্রাপ্ত হয়—তাহাই জীবের আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু; তাঁহাকে জানিয়া, তাঁহাকে অনুভব করিয়া, জ্ঞানিগণ মুক্তি লাভ করেন। যেমন দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত আছে সেই প্রকার সেই ব্রহ্ম বা আত্মা সর্ব্ব বস্তু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন" (১)। ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলিতে গিয়া শ্রুতি কেবল বলিতেছেন তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে— "চক্ষু দ্বারা, বাক্য দ্বারা, কিম্বা অন্য কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা অথবা তপস্যা বা শুভ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা নির্ণয় করা যায় না" (২)।

---

(১) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দমেতজ্জীবস্য যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধৈঃ।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্‌॥

ব্রহ্মোপনিষৎ। ৩৭।

(২) ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।

"ব্রহ্মকে কেহ দেখিতে পায় না অথচ তিনি সকলকে দেখিতে পান, তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না অথচ তিনি সকলকেই শুনিতে পান; তিনি স্থূলও নহেন, তিনি সূক্ষ্মও নহেন (১)।" "তিনি শব্দের অতীত, তিনি স্পর্শের অতীত, তিনি কোন রূপ নহেন, তিনি অব্যয়, তিনি রস ও গন্ধ বিহীন, তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি বুদ্ধিরও অতীত (২)।"

ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তাই বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মহর্ষি বেদব্যাস তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাঁহা হইতে হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম" (৩)। আমরা কোন স্থানে ঘট দেখিলে তাহার নির্ম্মাণকারী যে এক জন কুম্ভকার এ কথা বেশ বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ এই বিশ্বে নিয়তই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কার্য্য দেখিতেছি, সুতরাং এই সকলের কর্ত্তা যে একজন আছেন, ইহা আমরা নিশ্চয়ই ধারণা করিতে পারি, এবং তাঁহাকেই আমরা ব্রহ্ম বলি। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমেই আমরা পূর্ব্বোক্ত বেদান্তদর্শনের সূত্রটীর এইরূপ

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ। ৩।১।৮।

(১) অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অস্থূলমনণু।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

(২) অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ কঠোপনিষৎ। ১।৩।৫।

(৩) জন্মাদ্যস্য যতঃ। বেদান্তদর্শনম্। ১।১।২।

ব্যাখ্যা দেখিতে পাই :—'যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়; অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা বিচার করিলে যিনি নিখিল অর্থে ও ব্যাপারে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যিনি সৎ-স্বরূপে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে বিদ্যমান আছেন বলিয়া সেই সমুদায়ের সত্তা স্বীকৃত হয়, এবং "বন্ধ্যার পুত্র" "আকাশ-কুসুম" ইত্যাদি অবস্তুতে যাঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই বলিয়া তাহাদের সত্তা স্বীকার করা যায় না; যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্ব-প্রকাশ; যে বেদে বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতদিগেরও বুদ্ধি মোহ প্রাপ্ত হয় সেই বেদ যিনি অন্তর্যামীরূপে আদি কবি ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন; যেমন তেজ, জল ও ক্ষিতি প্রভৃতির একে অন্যের ভ্রমমূলক প্রতীতি (অর্থাৎ তেজে জলবুদ্ধি, জলে তেজবুদ্ধি, কাচাদি ক্ষিতিবস্তুতে তেজ বা জলবুদ্ধি) হয়, সেইরূপ যাঁহাকে অর্থাৎ যাঁহার সত্যতাকে আশ্রয় করিয়া ত্রিবিধ সৃষ্টি (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোমূলক দেবতা ইন্দ্রিয় ও ভূতরূপ সৃষ্টি) মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়; যিনি নিজ মহিমাপ্রভাবে মায়াকে নিরস্ত করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহার উপর মায়ার প্রভাব বিস্তার লাভ করে না) তিনিই পরম সত্য বা ব্রহ্ম। তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি (১)।'

ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ; ইহাই নিত্য, ইহাই পরম সত্য। ইহা জানিতে পারিলে, ইহাতে আত্মসত্তা ডুবাইয়া দিতে পারিলে জীব ধন্য হয়; জীবের অক্ষয় শান্তি লাভ হয়। অজ্ঞানের বা মায়ার পরপারস্থিত এবং

---

(১) জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১।১।১।

সর্ব্বপ্রকাশক সেই মহাপুরুষকে জানিতে পারিলেই, জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পরম পদ লাভ করে। ইহা ব্যতীত পরমপদ লাভের আর অন্য উপায় নাই (১)।

মানুষ দেখে যে সে বদ্ধ। সে চারি দিক হইতে প্রকৃতির নানা প্রকার পেষণে পিষ্ট হইতেছে। তখন স্বতঃই তাহার মনে এমন একটা কিছু পাইতে ইচ্ছা হয় যাহাতে সে এই অধীনতা-বন্ধন—এই পেষণ—হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। তাই সে প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করে এমন কোন দেব বা দেবীর উপাসনা করিয়া যাতনা এড়াইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর দেবতার উপাসনা করিয়াও যখন দেখে যে তাহার যাতনার ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয় না, তখন সে শান্তির অন্বেষণে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে উঠিতে এমন এক স্থানে পৌঁছে, যেখানে প্রকৃতির সকল খেলা থামিয়া যায়, যেখানে প্রকৃতির কোন আধিপত্যই থাকে না, সুতরাং যেখানে কেবল শান্তি বিরাজ করে। ইহাই সেই পরম ব্রহ্ম, অথবা ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। মানব যখন এই শান্তি-সাগরে অবগাহন করে তখন তাহার সকল জ্বালা চিরদিনের তরে জুড়াইয়া যায়, তখন সে কৃতার্থ হয়। বৈদিক ঋষিগণ এইরূপেই সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন,—ইহা তাঁহাদের দীর্ঘ-দিন-ব্যাপী সাধনা ও একাগ্র চিন্তার অমৃতময় ফল। যখন তাঁহারা এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন, তখন এই পরম সত্যকে কেমন করিয়া মানব-জীবনে অনুভব করিতে

---

(১) বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৩।৮।

হয় তাহার পথও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নিজ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, যিনি প্রাণরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ক্রমে সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিত হইয়া দিক, দেশ ও কালের সীমা মুছিয়া ফেলেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ-রূপে প্রকাশিত হয়েন। সচ্চিদানন্দ, সৎ—সত্তা, চিৎ—জ্ঞান আর আনন্দ—সুখ, অর্থাৎ তখন কেবল এক অপূর্ব্ব ও অফুরন্ত সুখময় সত্তারই অনুভব হয়, আর কিছু থাকে না। যাহা ক্ষুদ্র তাহা লাভে যে সুখ হয় তাহাও ক্ষুদ্র—ক্ষণস্থায়ী। তাই চিরসুখের অন্বেষণে প্রবৃত্ত সাধক অবশেষে অনন্তে গিয়া পড়েন।

সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া লইতে লইতে—যে বস্তুর অন্বেষণ করিতেছি এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু তাহা নহে, ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুও তাহা নহে, এইরূপ দেখিতে দেখিতে—সাধক সকল উপাধির অতীত অবস্থায়, সর্ব্বপ্রকার-ভেদজ্ঞান-বিহীন এক আনন্দময় সত্তার অনুভূতিতে যাইয়া পড়ে। আবার যখন সে ক্রমে বাসনা-রাজ্যে, তথা হইতে সূক্ষ্ম জগতে, শেষে স্থূল জগতে নামিয়া আসে, তখন সে দেখে যে, সেই নিরুপাধি বস্তুই উপাধি ধারণ করিয়া নানা আকারে ও নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন—খেলা করিতেছেন। নিরুপাধি অবস্থায় সে যাহা দেখিয়াছিল তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ বা প্রকৃত রূপ, আর তাহার পর যাহা দেখিতেছে এ তাঁহার লীলা-বিলাস। একজন বিশেষ পরিচিত লোক যদি এক এক বার এক এক বেশ ধারণ করিয়া আসে, তাহা হইলে দর্শক যেমন বুঝিতে পারেন যে, সেই একজন লোকই এই নানা বেশে আসিতেছে, এ বিভিন্ন ব্যক্তি নহে, আর ইহা দেখিয়া তাঁহার যেমন আনন্দ অনুভব হয়, তেমনি যিনি ব্রহ্মের ঐ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি এই জগতের বিবিধ প্রাণী, বস্তু, বিষয় ইত্যাদি সবই এক ব্রহ্মের বিকাশ বলিয়া বুঝেন, এবং জগতের ঘটনা সমূহ তাঁহারই খেলা বলিয়া অনুভব করেন।

ব্রহ্ম আদিতে স্ব-স্বরূপেই ছিলেন, লীলা-রস আস্বাদনের জন্য বহু হইয়াছেন (১), আবার কল্পান্তে যখন সমুদায় জগৎ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে, তখন পুনরায় তিনি স্ব-স্বরূপেই অবস্থান করিবেন (২), দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন এ সব কিছুই থাকিবে না (৩)।

এক সম্প্রদায়ের লোক ব্রহ্মকে কেবল নিগুর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন (৪), এবং কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ মিথ্যা বলেন। তাঁহারা

---

(১) সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৬।২।১।

তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। ঐ ।৬।২।৩।

(২) সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৯।৭।

(৩) অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।২।৯।৩২।

(৪) শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ দুই প্রকার ভাবের কথাই আছে তাহা স্বীকার করিয়াও শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য সবিশেষ ভাব বাদ দিয়া শুধু নির্ব্বিশেষ ভাবই প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন এবং সবিশেষ ব্রহ্মকে মায়া-বিজৃম্ভন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। "ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।" বেদান্ত দর্শনের এই ৩।২।১১ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন:—সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। অতশ্চান্যতরলিঙ্গ-

স্থূল জগৎকে ব্যবহারিক জগৎ বলেন, এবং বলেন ব্যবহারিক জগতে ব্যবহারিক রীতি-নীতি-অনুসারেই চলিতে হয়, মিথ্যা হইলেও ব্যবহারিক ভাবের ব্যতিক্রম করিতে নাই। অতএব, এই সকল জগতের সত্তা স্বীকার না করিলেও, তাঁহারা ব্যবহারিক জগতের কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি যথানিয়মে করিতে বলেন। মুণ্ডকোপনিষদে চরম সত্যের কথা বলিতে গিয়া এই সমুদায় জগৎকে আপেক্ষিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং ভাষ্যকার পরমহংস শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (১)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে উঁহারা "সত্তাবিহীন" ও "মিথ্যা" প্রভৃতি কথা এই "আপেক্ষিক সত্য" অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। আর এক সম্প্রদায় আছেন তাঁহারা ব্রহ্মকে নিখিল-মঙ্গলময়-সদ্‌গুণের আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)। ইহাতে ব্রহ্ম কেবল সগুণই হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ, ব্রহ্মের স্বরূপ নির্গুণ আর লীলা সগুণ। ব্রহ্মের তিন অংশ স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ

পরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দম-স্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।"

(১) যদপরবিদ্যাবিষয়ং কর্ম্মফললক্ষণং সত্যং তদাপেক্ষিকম্।

মুণ্ডকোপনিষৎ। ২।১।১। শাঙ্করভাষ্যম্।

(২) রামানুজ বলেন ব্রহ্ম যদি নির্গুণ (কোন প্রকার গুণশূন্য) হয়েন তাহা হইলে তিনি যে কল্যাণ-গুণের আকর এবং সমস্ত-দোষ-শূন্য, তাঁহার এই দুই ভাব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? অতএব বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ১৪ হইতে ১৭ সূত্রে ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা:—

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। ১৪। প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ। ১৫।

নির্গুণ আর এক অংশ লীলার ক্ষেত্র বা সগুণ (১)। এই এক অংশেও ঐ উভয় অবস্থা (অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ অবস্থা) যুগপৎ রহিয়াছে, কারণ ব্রহ্মের শক্তি বিচিত্র (২)। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব যতই বিচার-পরায়ণ হউক, যতই বুদ্ধিমান্ হউক, তাহার বুদ্ধির মাপ-কাঠি দ্বারা ব্রহ্মের শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা বাতুলতা মাত্র। জড় বস্তুতেও অনেক সময় অনেক বিচিত্র ও বিপরীত শক্তির সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক

আহ চ তন্মাত্রম্। ১৬। দর্শয়তি চাথ অপি স্মর্য্যতে ১৭।

সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতিতে যখন ব্রহ্মের উভয় লিঙ্গ (সগুণ ও নির্গুণ) উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম নিশ্চয়ই (নির্গুণ, সকল প্রকার মন্দগুণ-বিহীন, অর্থাৎ) সকল-দোষ-বিরহিত ও (সগুণ, সকল প্রকার উত্তম গুণের সহিত বিদ্যমান, অর্থাৎ) অশেষ কল্যাণ-গুণের আকর। "যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরংব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধীয়তে; নিরস্ত-নিখিল-দোষত্বকল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ।"

বেদান্তদর্শনম্। ৩।২।১১। শ্রীভাষ্যম্।

(১) পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। শ্রুতিঃ।
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১০।৪২।

(২) আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। বেদান্তদর্শনম্। ২।১।২৮।
সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। ঐ ।২।১।৩০।
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৬।৮।

জড় বস্তুতে একই সময়ে আকর্ষণী (centripetal force) ও বিপ্রকর্ষণী (centrifugal force) নামক দুইটী বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত শক্তি কার্য্য করিতেছে। একই প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ জ্বালিয়া লইলেও সেই প্রদীপটী পূর্ব্ববৎ অবিকৃতই থাকে। একটী পরশমণির স্পর্শে রাশিকৃত লৌহ স্বর্ণে পরিণত হইলেও পরশমণিটী অবিকৃতই থাকিয়া যায়। শোধিত বিষ সুস্থ দেহে ভক্ষণ করিলে মানুষ মরিয়া যায়, কিন্তু কোন কোন উৎকট ব্যাধিতে, যখন জীবন গতপ্রায় হইয়াছে এমন সময়, ঐ বিষ প্রয়োগে জীবন রক্ষা পায় (যদিও ঐ বিষে জীবন-নাশক গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে)। এইরূপে জড় বস্তুসমূহেও যখন অনেক বিচিত্র ও বিপরীত শক্তির খেলা দেখা যায়; তখন ব্রহ্মের শক্তি সম্বন্ধে আর বলিবার কি আছে? সুতরাং ব্রহ্মের যে অংশে জগৎ দেখা যাইতেছে, সে অংশেও তিনি যে নির্গুণ বা স্বরূপ অবস্থায় আছেন, ইহা অসম্ভব নহে।

কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতবাদী ; কেহ ব্রহ্মের লীলা বাদ দিয়া শুধু স্বরূপই চান, কেহ লীলা আশ্রয় করিয়াই থাকেন; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকৃত অবস্থা দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত (১)। দ্বৈত বা অদ্বৈত কিম্বা দ্বৈতাদ্বৈত, ইহার মধ্যে শুধু দ্বৈতভাব বা শুধু অদ্বৈত ভাব ঠিক, তাহা বলিবার যো নাই। সুতরাং তিনি দ্বৈত ও অদ্বৈত মিশ্রিত অর্থাৎ

---

(১) অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্॥

কুলার্ণবতন্ত্রম্। প্রথম উল্লাসঃ।

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমতত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্॥

অবধূতগীতা। ১।৩৬।

উভয়াত্মক। এই উভয়াত্মক দ্বৈতাদ্বৈত-ভাবই পারমার্থিক (১)। সাধকের প্রথম অবস্থায় দ্বৈতধারণা অর্থাৎ জীব ও জগৎ পৃথক্, জীব ভোক্তা জগৎ ভোগ্য, ঈশ্বর এই দুইয়ের নিয়ামক এক স্বতন্ত্র পদার্থ, এই ধারণা স্বাভাবিক। কিন্তু সরলপ্রাণে সাধনার পথে অগ্রসর হইলে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই সকলের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কমিয়া যাইতে থাকে, অর্থাৎ সাধক যে সংস্কারগত পার্থক্য-জ্ঞান লইয়া সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই পার্থক্য-জ্ঞান কমিয়া যাইতে থাকে, অবশেষে তিনি দেখেন এক ব্রহ্মই সর্ব্বত্র দীপ্তি পাইতেছেন,—দ্বৈতে আরম্ভ, অদ্বৈতে পর্য্যবসান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত-মন-প্রাণ গোপীগণ রাসমণ্ডলে তাঁহার অন্তর্দ্ধানে একান্ত বিরহকাতরা হইয়া, তাঁহার গুণগান করিতে করিতে বনমধ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, অবশেষে তাঁহারা তন্ময় হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন—দ্বৈতবাদী ভক্তেরও এইরূপে ভগবানের সত্তায় আত্মসত্তা ডুবিয়া যাওয়ায়, "সোঽহং" "আমিই সেই" এই ভাব আসে; অভেদ-জ্ঞানে মেশামিশি ভাব তাঁহারও আসে। কিন্তু তিনি এ ভাব রাখিতে চাহেন না, তিনি সেব্য-সেবক ভাবই অধিক মধুর বলিয়া অনুভব করেন, তাই তিনি দ্বৈতভাব যত্ন করিয়া পোষণ করেন (২)। আর যিনি দেখেন ভেদজ্ঞানই দুঃখের কারণ, ভেদজ্ঞানই জীবকে

---

(১) দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্॥
দক্ষস্মৃতিঃ। সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

(২) আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীপদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥

ঈশ্বর হইতে দূরে রাখিয়াছে, ইহাই বিরহের একমাত্র হেতু (১), তিনি প্রথম হইতেই—দ্বৈতভাব ছাড়াইতে না পারিলেও—অভেদ-চিন্তায় নিযুক্ত হন, এবং অবশেষে দেখেন বিন্দুরূপী আত্মসত্তা সিন্ধুরূপী অফুরন্ত সচ্চিদানন্দ-সত্তায় মিশিয়া গিয়াছে, অপার সমুদ্রবক্ষে অনন্ত-তরঙ্গ-কল্লোল-মধ্যে ক্ষুদ্র এক তরঙ্গরূপী তিনি কখন ডুবিতেছেন কখন ভাসিতেছেন, দেখেন চৌদিকে কেবল সেই একই সমুদ্রের লহরীলীলা; ইহাই দ্বৈতাদ্বৈত-মিশ্রিত পরমার্থ তত্ত্ব।

ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ ভাবের সমন্বয়ই পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব। যদিও ব্রহ্মের সগুণ ভাব নির্গুণ ভাবের তুলনায় অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর, তথাপি এই উভয় ভাবই গ্রহণ না করিলে উহা ব্রহ্মের একদেশী ধারণা মাত্র হইবে। একটী সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। একটী বেল আছে। খোলা, শাঁস ও বীজের সমষ্টিই ঐ বেল। যদিও আহারের জন্য ঐ শাঁসটুকুই প্রয়োজন, এবং বীজ ও খোলা সে বিষয়ে

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।

রামপ্রসাদ সেন।

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তার মাধুর্য্য চর্ব্বন॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়জনে নাহি জানে ভাবের বৈভব॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আদিলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(১) দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং রাজংস্তদভাবাদ্বিভেতি ন।
ন তদ্বিয়োগো মেঽপ্যস্তি মদ্বিয়োগোঽপি তস্য ন।

দেবীগীতা।৩।১৩।

একান্তই অকেজো জিনিস, তথাপি উহার একটীকে বাদ দিলে বেলের সম্যক্ ধারণা করা হইবে না, বেলটীকে আংশিকভাবে ধরা হইবে মাত্র। পুরাণাদিতেও এই ভাবেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দেবী পার্ব্বতী তাহার পিতা হিমালয়কে বলিতেছেন, "মুমুক্ষুগণ দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সূক্ষ্মরূপের ধ্যান করিবে। আমার এইরূপ নিষ্কল, নির্গুণ, পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ স্বরূপ, নির্ব্বিকল্প ও নিরালম্ব (১)। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ ভাব আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহারা আমাতে থাকিয়া আমারই অধীন হইয়া রহিয়াছে, আমি কখনও সেই সমস্ত ভাবের অধীন হইনা (২)। আমার মায়ায় মুগ্ধ জীবগণ সর্ব্ব পদার্থের অন্তরাত্মরূপ অব্যয় এবং অদ্বিতীয় আমাকে জানে না। যাহারা ভক্তির সহিত আমার ভজনা করে তাহারাই আমার এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। সৃষ্টির নিমিত্ত আমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার রূপ স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। শিবই সর্ব্বপ্রধান পুরুষ এবং শিবাই পরমা শক্তি;

---

(১) রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলম্।
নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপ্যেককারণম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরালম্বং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে॥

ভগবতীগীতা।৪।৪।

(২) এবমন্যেঽপি যে ভাবাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তথা।
তামসা মত্ত উৎপন্না মদধীনাশ্চ তে ময়ি।
নাহং তেষামধীনাস্মি কদাচিৎ পর্ব্বতর্ষভ॥

ভগবতীগীতা।৪।৮।

শিব ও শক্তি মিলিয়া পূর্ণব্রহ্ম হয়, অতএব তত্ত্বদর্শী যোগিগণ আমাকেই সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। আমিই ব্রহ্মা-রূপে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করি, আবার নিজের ইচ্ছায় অবশেষে মহারুদ্র-রূপে তাহার সংহার করিয়া থাকি। দুর্ব্বৃত্তদিগের দমনের জন্য আমিই পরম-পুরুষ-বিষ্ণু-রূপ ধারণ করিয়া এই জগৎ পালন করি। আমি রামাদি-রূপ ধারণ করতঃ পুনঃ পুনঃ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দানবদিগকে বিনাশ-পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করি (১)। আমার শক্তিরূপই প্রধান, কারণ শক্তি ব্যতিরেকে পুরুষ কোনরূপ চেষ্টা বা কার্য্য করিতে অক্ষম। এই সমস্ত রূপ এবং কালী প্রভৃতি রূপ স্থূল বলিয়া জানিবে, আর সূক্ষ্ম রূপের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমার স্থূল রূপ চিন্তা না করিলে আমার

---

(১) এবং সর্ব্বগতং রূপমদ্বৈতং পরমব্যয়ম্।
ন জানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়য়া।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
সৃষ্ট্যর্থং আত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ।
কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপুমানিতি ভেদতঃ॥
শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ অতএব পরাৎপরম্॥
সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্।
সংহরামি মহারুদ্ররূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া॥
দুর্ব্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমঃ পুরুষঃ।
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে॥
অবতীর্য্য ক্ষীতৌ ভূয়ো ভূয়ো রামাদিরূপতঃ।
নিহত্য দানবান্ পৃথ্বীং পালয়ামি মহামতে॥

সূক্ষ্মরূপ কোন প্রকারে জানিতে পারিবে না; আমার সূক্ষ্মরূপ জানিলে তবে মুক্তি হয়। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তি পূর্ব্বে আমার স্থূলরূপ আশ্রয় করিবে, এবং বিধানানুযায়ী ক্রিয়াযোগ দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমার পরম অব্যয় সূক্ষ্ম রূপের আলোচনা করিবে (১)।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডে বৈদিক-ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ উক্তি আছে, "ব্রহ্ম এক, কিন্তু গুণভেদে তাঁহার মূর্ত্তিভেদ হইয়া থাকে। হে শিব, সেই ব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ। তাঁহার মায়াশ্রিত অবস্থা সগুণ, আর মায়াতীত অবস্থা নির্গুণ। ইচ্ছাময় ভগবান্ ইচ্ছাবশতঃ এই দুই অবস্থায়ই প্রকাশ পান। ইঁহার শক্তিই প্রকৃতি, সেই ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বশক্তির জননী। ঋষিগণের মধ্যে অনেকে এইরূপে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে এক বলেন, আবার অনেকে প্রকৃতি-পুরুষরূপ দুই প্রকার ব্রহ্মের কথা বলেন। যাঁহারা প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ এক ব্রহ্মের কথা বলেন, তাঁহাদের মতে সেই এক ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই হইয়াছে, সেই

---

(১) রূপং শক্ত্যাত্মকং তাত প্রধানং যত্র চ স্মৃতম্।
যতস্তয়া বিনা পুংসঃ কার্য্যানর্হত্বমাস্থিতম্॥
রূপাণ্যেতানি রাজেন্দ্র তথা কাল্যাদিকানি চ।
স্থূলানি বিদ্ধি সূক্ষ্মন্তু পূর্ব্বমুক্তং তবানঘ॥
অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ।
ক্রিয়াযোগেন তাগ্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ।
শনৈরালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্॥
ভগবতীগীতা।৪।৯-১৮।

ব্রহ্মই সকলের হেতু। অথবা এক ব্রহ্ম নিজ ইচ্ছায় দ্বিবিধ হয়েন। ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিরূপিণী প্রকৃতি সকল শক্তির জননী। সেই প্রকৃতিতে আসক্ত ব্রহ্ম সগুণ এবং শরীরধারী, আর তাহাতে যিনি নির্লিপ্ত অর্থাৎ অনাসক্ত তিনি নির্গুণ, তিনি স্বতন্ত্র এবং অশরীরী। তিনি সকলের আশ্রয়-স্বরূপ, তিনি সনাতন ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন আত্মা। তিনি সকলের ঈশ্বর, সর্ব্ব বিষয়ের সাক্ষী, ফলদাতা এবং সর্ব্বব্যাপী (১)। শম্ভু বা ব্রহ্মের দুই প্রকার শরীর, নিত্য ও প্রাকৃত; তাঁহার নিত্য শরীরের বিনাশ নাই, উহা সর্ব্বদা একই ভাবে রহিয়াছে, আর প্রাকৃত শরীর

---

(১) ব্রহ্মৈকং মূর্ত্তিভেদস্তু গুণভেদেন সম্মতম্।
তদ্‌ব্রহ্ম দ্বিবিধং বস্তু সগুণং নির্গুণং শিব।
মায়াশ্রিতো য সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ॥
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবানিচ্ছয়া বিকরোতি চ।
ইচ্ছাশক্তিশ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিপ্রসূঃ সদা॥
কেচিদেকং বদন্ত্যেবং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্
কেচিদ্বদন্তি দ্বিবিধং ব্রহ্ম প্রকৃতিপূর্ব্বকম্॥
শৃণু কে চ বদন্ত্যেকং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরম্।
তস্মাদ্ভবতি তৌ দ্বৌ চ তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বকারণম্।
অথবৈকং পরং ব্রহ্ম দ্বিবিধং ভবতীচ্ছয়া॥
ইচ্ছাশক্তিশ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিপ্রসূঃ সদা।
তত্রাসক্তশ্চ সগুণঃ স শরীরী চ প্রাকৃতঃ;
নির্গুণস্তত্র নির্লিপ্তঃ অশরীরী নিরঙ্কুশঃ॥
স চাত্মা ভগবান্ নিত্যঃ সর্ব্বাধারঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বত্রাস্তি ফলপ্রদঃ॥

সর্ব্বদাই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। .... আর যাঁহারা বলেন ব্রহ্ম দ্বিবিধ, তাঁহাদের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই অবস্থাই শ্রেষ্ঠ। পুরুষ সদা নিত্য এবং ঈশ্বরী প্রকৃতিও সদা নিত্যা। ইহারা সর্ব্বদা একত্র সম্মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এবং নিখিল বিশ্বের ইহারাই জনক ও জননী। ইহারা দুই জনে ইচ্ছানুসারে কখনও দেহ ধারণ করেন, কখনও বা দেহশূন্য অবস্থায় থাকেন, ইহারা সর্ব্বব্যাপী। পুরুষের প্রাধান্যও যেমন প্রকৃতির প্রাধান্যও তেমন (১)।" কাহাকেও হীন বা শ্রেষ্ঠ বলিবার যো নাই (২)।

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কোথায়ও নির্গুণ কোথায়ও বা সগুণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যে স্থলে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে সে স্থলে

---

(১) শরীরং দ্বিবিধং শম্ভোঃ নিত্যং প্রাকৃতমেব চ।
নিত্যং বিনাশরহিতং নশ্বরং প্রাকৃতং সদা॥
... ...
দ্বিবিধং যে বদন্ত্যেবং দ্বৌ প্রধানৌ তু তন্মতে।
পুরুষশ্চ সদা নিত্যো নিত্যা প্রকৃতিরীশ্বরী॥
সদা তৌ দ্বৌ চ সংশ্লিষ্টৌ সর্ব্বেষাং পিতরৌ শিব।
সশরীরৌ নিঃশরীরৌ স্বেচ্ছয়া সর্ব্বরূপিণৌ॥
প্রাধান্যঞ্চ যথা পুংসঃ প্রকৃতেশ্চ তথা সদা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
ত্র্যধিকচত্বারিংশদধ্যায়ঃ।

(২) নির্গুণ হ্যায়্ পিতা হামারি সগুণ মাহতারি।
কাকো নিন্দো কাকো বন্দো দুয়ো পাল্লা ভারি॥
তুলসীদাস।

ক্লীবলিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (১), আর যে স্থানে তাঁহাকে সগুণ বলা হইয়াছে সে স্থানে পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (২)। ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ দুইটী ভাব মাত্র (৩)। তিনি এক অংশে বা ভাবে সগুণ আর অন্য ভাবে নির্গুণ। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত আছে, পুরুষ গায়ত্রীনামক বিভূতি হইতে শ্রেষ্ঠ। ইঁহার এক পাদ সমস্ত ভূতরূপে প্রকাশিত, আর তিন পাদ অমৃত অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত (৪)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "আমার মাত্র এক অংশ দ্বারা জগৎ আবৃত করিয়া আমি অবস্থান করিতেছি (৫)।"

---

(১) অথ পরা (বিদ্যা) যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

মুণ্ডকোপনিষৎ। ১।১।৫।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং
তদপাণিপাদম্‌। মুণ্ডকোপনিষৎ। ১।১।৬।

(২) অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্রং পুরুষং মহান্তম্‌॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৩।১৯।

(৩) ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।

বেদান্তদর্শনম্‌। ৩।২।১১।

(৪) ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৩।১২।৬।

(৫) বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১০।৪২।

এইরূপে বেদ ও পুরাণসমূহের মতগুলির প্রতি নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টিপাত করিলে ব্রহ্মের লীলা ও স্বরূপ অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ ভাব উভয়ই গ্রহণ করিতে হয়। দ্বৈতবাদীই হউন আর অদ্বৈতবাদীই হউন, বিচারের বেলায় নিজের নিজের মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমর্থন করিলেও, কার্য্যতঃ তাঁহারা ব্রহ্মের এই উভয় অবস্থা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়েও দেখান হইয়াছে। আর ব্যষ্টিভাবে সাধক নিজের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাইবেন যে, তিনি (সাধক নিজে) জাগ্রৎ ও স্বপ্নে সগুণ, সুষুপ্তিতে অর্থাৎ স্বপ্নহীন প্রগাঢ় নিদ্রায় প্রায় নির্গুণ, এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পূর্ণ নির্গুণ অবস্থায় অবস্থিত।

যদিও পূর্ব্বাধ্যায়ে মায়াবাদ-প্রসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি এই স্থানে শিবসংহিতা হইতে ঐ তত্ত্ব পুনরায় বিবৃত করিতেছি। বিবর্ত্ত-বাদ (১) ও পরিণামবাদে (২) জগতের সত্তা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ব্যবহারিক জীবনে সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা বহু সমস্যার সমাধান হয়, এবং জীবের স্বরূপ লাভের জন্য যে সাধনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সাহায্য হয়, এ জন্য এ অধ্যায়ে ঐ তত্ত্বের বিবরণ দেওয়া দোষাবহ হইবে না, বরং দুইটী বিবরণ একত্র মিলাইয়া পাঠ করিলে বিষয়টী পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

---

(১) শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি হইতেছে। জগৎ বলিয়া কিছু নাই, অজ্ঞান বশতঃই আমরা ব্রহ্মকে জগৎ-রূপে দেখিতেছি। ইহাই বিবর্ত্তবাদ।

(২) ব্রহ্ম নিজ অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে স্বরূপে থাকিয়াই একাংশে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন। জগৎ-রূপে পরিণত হইলেও তাঁহার স্বরূপের কোন বিকার ঘটে নাই। জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে। ইহাই পরিণামবাদ।

অনুলোম-ক্রমে ব্রহ্মের এক অংশ হইতে জগতের প্রকাশ হয়, পুনরায় বিলোম-ক্রমে তাহাতেই বিলয় প্রাপ্তি হয়। পরম পুরুষ প্রথম বহু হইবার জন্য সঙ্কল্প করেন, সেই সঙ্কল্প হইতেই প্রজা সৃষ্টি হয়। অবিদ্যাই সৃষ্টির হেতু। বিদ্যাশক্তির সহিত নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইলে, ব্রহ্মই প্রকৃতি-রূপে পরিণত হয়েন। তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, এবং জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ আকাশ হইতে বাতাস, আকাশযুক্ত বাতাস হইতে তেজ, আকাশ ও বাতাসযুক্ত তেজ হইতে জল, এবং আকাশ বাতাস ও তেজযুক্ত জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। ইহা অবশ্য কল্পনাময়ী সৃষ্টি। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, জলের গুণ রস এবং মৃত্তিকার গুণ গন্ধ। কারণের গুণ কার্য্যে প্রকাশ পায়, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ (১)। সুতরাং আকাশের

---

(১) সোঽকাময়ত পুরুষঃ সৃজতে চ প্রজা স্বয়ম্।
অবিদ্যা ভাসতে যস্মাৎ তস্মান্মিথ্যাস্বভাবিনী॥
শুদ্ধব্রহ্মত্বসম্বন্ধো বিদ্যয়া সহিতো ভবেৎ।
ব্রহ্ম তেন সতী যাতি যত আভাসতে নভঃ॥
তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ু বায়োরগ্নি স্ততো জলম্।
প্রকাশতে ততঃ পৃথ্বী কল্পনেয়ং স্থিতাঽসতী॥
আকাশাদ্বায়ুরাকাশপবনাদগ্নিসম্ভবঃ।
খবাতাগ্নের্জলং ব্যোমবাতাগ্নিবারিতো মহী॥
খং শব্দলক্ষণং বায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ।
স্যাদ্রূপলক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণম্॥
গন্ধলাক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্।
বিশেষতো গুণস্ফূর্ত্তি র্যতঃ শাস্ত্রাদিনির্ণয়ঃ॥

একটী গুণ (শব্দ), বায়ুর দুইটী গুণ (শব্দ ও স্পর্শ), তেজের তিনটী গুণ (শব্দ স্পর্শ ও রূপ), জলের চারিটী গুণ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস), মৃত্তিকার পাঁচটী গুণ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ)। চক্ষু দ্বারা রূপ, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা রস, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ ও কর্ণের দ্বারা শব্দ অনুভূত হয়। এইরূপ কল্পনার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে ; আর জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জানিতে হইবে যে, সেই একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন। প্রলয়-কালে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ অবিদ্যা বা প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং অবিদ্যা পরব্রহ্মে লীন হয়েন (১)।

---

(১) স্যাদেকগুণমাকাশং দ্বিগুণো বায়ুরুচ্যতে।
তথৈব ত্রিগুণো তেজো ভবন্ত্যাপশ্চতুর্গুণাঃ॥
শব্দং স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ।
এতৎপঞ্চগুণা পৃথ্বী কল্পকৈঃ কল্প্যতেঽধুনা॥
চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধো ঘ্রাণেন গৃহ্যতে।
রসো রসনয়া স্পর্শস্ত্বচা সংগৃহ্যতে পরম্॥
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দো নিয়তং ভাতি নান্যথা॥
চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
অস্তি চেৎ কল্পনেয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ঃ॥
পৃথ্বী শীর্ণা জলে মগ্না জলং মগ্নঞ্চ তেজসি।
লীনং বায়ৌ তথা তেজো ব্যোম্নি বাতো লয়ং যযৌ ;
অবিদ্যায়াং মহাকাশো লীয়তে পরমে পদে॥

শিবসংহিতা।১।৭২-৮৩।

[এই মতে প্রকৃতি হইতেই আকাশের উৎপত্তি দেখান হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের রচয়িতা অধিকতর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃতি ও আকাশ এই উভয়ের মধ্যে আরও কয়েকটী স্তর দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা ও দুই প্রকার ইন্দ্রিয় (১) এবং পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, আর পুরুষ বা প্রত্যগাত্মা এক তত্ত্ব, সর্ব্বসমেত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিদ্যমান। প্রকৃতি হইতে প্রথম উৎপন্ন মহত্তত্ত্বই মন অর্থাৎ মননামক অন্তঃকরণ। তাহা হইতে "অহং" এই অভিমানযুক্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ইহাই অহঙ্কারতত্ত্ব (২)।]

উপাদানসমূহ এইভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে জীব-দেহসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। "পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম করা গিয়াছে তাহার ফলে পিতামাতার অন্নময় কোষ হইতে জীবের দেহ উৎপন্ন হয়। এই দেহ দেখিতে সুন্দর হইলেও ইহা দুঃখময় বলিয়াই জানিবে, কারণ পূর্ব্বকৃত পাপ বা পুণ্য ভোগের জন্যই দেহ ধারণ করিতে হয়। মাংস, অস্থি, স্নায়ু, মজ্জা ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত নাড়ীসমূহের দ্বারা গ্রথিত এবং ভোগের ক্ষেত্রস্বরূপ জীবদেহ কেবল ক্লেশ ভোগের জন্যই উৎপন্ন হয়। পরমেষ্ঠি অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই দেহ পঞ্চভূতময়, ইহা ব্রহ্মাণ্ড (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা

---

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়।

(২) সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্।১।৬১।

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। চরমোঽহঙ্কারঃ। ঐ ।১।৭১-৭২।

অন্তর্জগৎ) নামে কথিত হয়। পূর্ব্ব-কর্ম্ম-হেতু দুঃখ এবং সুখ ভোগের নিমিত্তই ইহা রচিত হইয়াছে। বিন্দু শিবস্বরূপ এবং রজঃ শক্তিস্বরূপ, এই উভয়ের মিলন হইলে স্বয়ং আত্মা জড়রূপিণী নিজ শক্তি দ্বারা নানা আকারে প্রকাশিত হয়েন। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ হইলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ অসংখ্য স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। এই বস্তুসকলেই জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম-অনুসারে অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ পঞ্চভূত হইতেই জীবের স্থূল দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। জীবের পূর্ব্ব-কর্ম্ম-অনুসারেই শিব (আত্মা) এই সব ঘটনা করেন। আত্মা জড়স্বরূপ নহেন, তিনিই সকল ভূতে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই জড় বস্তুতে অবস্থান করিয়া জড় বস্তু ভোগ করিতেছেন (১)। নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা

---

(১) পিতুরন্নময়াৎ কোষাজ্জায়তে পূর্ব্বকর্ম্মতঃ।
তচ্ছরীরং বিদুর্দুঃখং স্বপ্রাগ্‌ভোগায় সুন্দরম্॥
মাংসাস্থিস্নায়ুমজ্জাদিনির্ম্মিতং ভোগমন্দিরম্।
কেবলং দুঃখভোগায় নাড়ীসন্ততিগুম্ফিতম্॥
পারমেষ্টমিদং গাত্রং পঞ্চভূতবিনির্ম্মিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকং দুঃখসুখভোগায় কল্পিতম্॥
বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম্।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া॥
তৎপঞ্চীকরণাৎ স্থূলান্যসংখ্যানি সমাসতে।
ব্রহ্মাণ্ডস্থানি বস্তূনি যত্র জীবোঽস্তি কর্ম্মভিঃ॥
তদ্ভূতপঞ্চকাৎ সর্ব্বং ভোগাখ্যং জীবসংজ্ঞকম্।
পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধেন করোমি ঘটনামহম্॥
অজড়ঃ সর্ব্বভূতস্থো জড়স্থিত্যা ভুনক্তি তৎ।
জড়াৎ স্বকর্ম্মভির্বদ্ধো জীবাখ্যো বিবিধো ভবেৎ॥

বদ্ধ জীব জড়বস্তু হইতেই নানাবিধ হইয়া থাকে। এই জগতে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করার জন্যই জীব পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং ভোগের নিঃশেষে অবসান হইলেই পরব্রহ্মে লীন হয় (১)"।*

[প্রথমে কল্পনা তাহার পর স্থূল সৃষ্টি, এ বিষয়ে একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত এ স্থানে উদ্ধৃত করা যাউক। মনে করুন, একজন লোক নিজের রুচি-অনুসারে একখানি নাটক রচনা করিয়া, তাহা অভিনয় করাইতে চাহেন। এরূপ অবস্থায় তিনি কি করেন? প্রথমে তিনি নাটকখানি কি ধরণের করিবেন, কি কি বিষয় এবং কি কি রসের সমাবেশ উহাতে দেখাইবেন, তাহা চিন্তা করেন। তাহার পর, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাম, ধাম, রূপ ইত্যাদি, এবং কিরূপ কিরূপ স্থানে (অর্থাৎ দৃশ্যে) ও সময়ে ঘটনাগুলি দেখাইতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া তদনুসারে নাটকখানি লেখেন। নাটকখানি যখন তাঁহার মনের মত ভাবে লেখা শেষ হয়, তখন উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঐ নাটকের বক্তৃতাগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। বক্তৃতাগুলি তাহারা মুখস্থ করিলে, হাব-ভাব সহকারে ঐ গুলি আবৃত্তি করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং কয়েকবার আখড়া ঘরে অভিনয় করিয়া দেখা হয় যে, উহা ঠিক ঠিক হইতেছে কি না। ইতিমধ্যে যথোপযুক্ত দৃশ্যপটসকল অঙ্কিত করিয়া লওয়া হয়। সমস্ত ঠিক হইয়া

---

(১) ভোগায়োৎপদ্যতে কর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং পুনঃ পুনঃ।
জীবশ্চ লীয়তে ভোগাবসানে চ স্বকর্ম্মভিঃ॥

শিবসংহিতা।১।৯৫-১০২।

* সৃষ্টিতত্ত্বের আরও বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ২৩-৫১ শ্লোক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম অধ্যায়ে ৮-১৪ শ্লোক এবং দশম অধ্যায় পাঠ করুন।

গেলে, যথাযোগ্য দৃশ্যপট লম্বিত করিয়া, উপযুক্ত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া অভিনেতারা সকল লোকের সমক্ষে ঐ নাটকের অভিনয় করেন। নাটকখানি, লিখিত হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত, অন্য লোকের অগোচরে রচয়িতার কল্পনা-মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, আর উহা যখন সকলের সাক্ষাতে অভিনীত হইল তখন উহা একটী স্থূল ঘটনা ও দৃশ্যে পরিণত হইল। এই উদাহরণের ভাব লইয়া জগৎ-সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিলে ব্রহ্মের কল্পনা হইতে জগতের বিকাশরূপ ব্যাপারটী কিঞ্চিৎ সহজে বোধগম্য হয়।]

সৃষ্টিতত্ত্বের শৃঙ্খলা-পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই নিশ্চিত হয় যে, তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াই দেখা যায়, যেহেতু ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ (১)। কার্য্য কারণ হইতে কখনও ভিন্ন নহে (২), সুতরাং এ জগৎ ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। মৃত্তিকা দ্বারা ঘট ও বিবিধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা যায়। সেই পদার্থগুলির আকার বা রূপ পৃথক্ পৃথক্ এবং নামও পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু তাহা হইলেও উহারা বাস্তবিক পক্ষে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বর্ণ দ্বারা বলয়, অঙ্গুরীয়ক, হার, কুণ্ডল প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। ঐ সকল অলঙ্কারের রূপ বা আকার

---

(১) প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। অভিধ্যোপদেশাচ্চ। সাক্ষাচ্চোভয়ন্নাম্নাৎ। আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ। যোনিশ্চ হি গীয়তে। বেদান্তদর্শনম্।১।৪।২৩-২৭। একটী মৃণ্ময় ঘটের নির্ম্মাণ-বিষয়ে কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ আর মৃত্তিকা উপাদান-কারণ, কিন্তু এক ব্রহ্মই জগতের উভয়বিধ কারণ।

(২) তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ। ভাবে চোপলব্ধেঃ। সত্ত্বাচ্চাবরস্য। বেদান্তদর্শনম্।২।১।১৪-১৬।

ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ অলঙ্কারগুলি প্রকৃতপক্ষে উহাদের উপাদান যে স্বর্ণ তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ বিচারে, জগৎ ইহার উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে অন্য প্রকারের বস্তু হইতে পারে না। সুতরাং সাধনা দ্বারা যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, বিচারে তাঁহার মন ব্রহ্মাকার-বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন (১)।

আর একটী আবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করা বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে। হিন্দুর বহু পুরাণ আছে। কোন পুরাণে বিষ্ণু, কোন পুরাণে শিব, কোন পুরাণে ভগবতী, কোনও পুরাণে কালী বলিতেছেন, "আমিই ব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম। আমা হইতেই পুরুষ ও প্রকৃতি হইয়াছে, এবং প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, অহংতত্ত্ব, সূক্ষ্ম ভূত, স্থূল ভূত ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। আমি সর্ব্বব্যাপী। আমি নির্গুণ ও সগুণ। মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ আমাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। একমাত্র আমাকে ভজন করিলেই জীব মোক্ষ লাভ করিতে পারে, অন্যথা নহে।" বেদে ইন্দ্রও আপনাকে পরব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণও ঐরূপ বলিয়াছেন। এই গ্রন্থে স্থানে

---

(১) ভক্ত বাঁধিয়াছে মোরে আপন অন্তরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
... ...
মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। মধ্যলীলা। অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্থানে ঐরূপ উক্তি শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন। এ অবস্থায় স্বভাবতঃই এই সন্দেহ আসিতে পারে, "ব্রহ্ম কি কোন সীমাবদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ? ব্রহ্ম কি সংখ্যায় বহু?" কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঐরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই। ঐ সকল দেব, দেবী বা অবতারগণ যখন ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, তখন নিজেদের দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ওরূপ কথা বলেন নাই। ঐ সব কথা বলিবার সময় তাঁহারা আপনাদিগকে শুদ্ধ-চৈতন্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, এবং সেই হেতু আপনাদিগকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া, যেন ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয়স্বরূপে, উপদেশগুলি বলিয়াছেন। এই বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা শাস্ত্রেই দেওয়া আছে। বেদান্তদর্শনে আছে:— শাস্ত্রে যেখানে যেখানে 'আমি ব্রহ্ম' অথবা 'মুক্তির জন্য আমার উপাসনা কর' ইত্যাদি কথা উপদেশকগণ বলিয়াছেন সেখানে সেখানেই তাঁহারা পরমাত্মদৃষ্টিতে ঐরূপ বলিয়াছেন জানিতে হইবে; বৃহদারণ্যক উপনিষদে যেমন ব্রহ্মসত্তায় আত্মসত্তা নিমজ্জিত করিয়া বামদেব ঋষি বলিয়াছেন, "আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম, আমিই মনু হইয়াছিলাম" ইত্যাদি, সেইরূপ কৌষীতকী উপনিষদে, উপদেশ দিবার সময়ে, দেবরাজ ইন্দ্রও প্রতর্দ্দনকে বলিয়াছেন, "একমাত্র আমাকেই জান, তাহা হইলেই মুক্ত হইবে (১)।" শান্তিগীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "আমি যেখানে যেখানে মুক্তির জন্য আমাকে ভজনীয় পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে সেখানেই উহা তত্ত্ব-দৃষ্টিতে অর্থাৎ আমার স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি, উহা আমার শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই (২)।"

---

(১) শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ। বেদান্তদর্শনম্।১।১।৩০

(২) মাং শব্দতত্ত্বদৃষ্ট্যা তু ন হি সজ্ঞাতদৃষ্টিতঃ। শান্তিগীতা।৫।৩৮

এক্ষণে ব্রহ্মের সগুণ বা নির্গুণ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করায় ফলের কি তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা বলা আবশ্যক। মায়োপহিত চৈতন্য সগুণ ব্রহ্ম, আর সর্ব্বপ্রকার-উপাধি-বিরহিত চৈতন্যই নির্গুণ ব্রহ্ম। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিলে দেহান্তে দেবযান দ্বারা উত্তর মার্গে সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হয়েন, পরে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মহাপ্রলয়ে পরব্রহ্মে বিলীন হয়েন। কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিলে ইহলোকেই মুক্তি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন, এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ শেষ হইলেই দেহ ত্যাগ করিয়া বিদেহ-মুক্তি লাভ করেন অর্থাৎ পরম ব্রহ্মে লীন হয়েন (১)। সগুণ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ উপাসককেও পুনরায় স্থূল দেহ ধারণ করিতে হয় না, তবে তাঁহাকে সূক্ষ্ম-রাজ্যে অবস্থান করতঃ, উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে উঠিয়া, অবশেষে পরব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করিতে হয়। নির্গুণ বা সগুণ ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করায় ফলের এইরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে।

এ স্থানে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি বা ব্রহ্ম হওয়ার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। ব্রহ্মে লয় হওয়ার অর্থাৎ ব্রহ্ম হওয়ার কথা শুনিলে

---

(১) অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ। বেদান্তদর্শনম্ ।৪।৩।১
বিদ্যুতেনৈব ততস্তৎ শ্রুতেঃ। ঐ ।৪।৩।৬
কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ। ঐ ।৪।৩।৭
কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ। ঐ ।৪।৩।১০
পরং জৈমিনি র্মুখ্যত্বাৎ। ঐ ।৪।৩।১২
বিশেষঞ্চ দর্শয়তি। ঐ ।৪।৩।১৬

অনেকেই বিষাদে মরিয়া যান। তাঁহারা ভাবেন, 'আমরা যদি ব্রহ্মই হইয়া গেলাম, তাহা হইলে আর আনন্দ কি?' তাঁহাদের মতের কথা ভাবিলে মনে হয়, ব্রহ্ম যেন কোন আনন্দই উপভোগ করেন না, ব্রহ্ম হইলে নিরানন্দে থাকিতে হয়। কিন্তু বেদে ত এমন কথা দেখা যায় না। তৈত্তিরীয় শ্রুতি তারস্বরে বলিতেছেন, "ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই ঋক্ বেদে উক্ত হইয়াছে। সৎস্বরূপ, এবং দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে যিনি পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন তিনি ঐ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সকল কামনা লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন" (১)। ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ মুক্ত হইলে কি পরিমাণ আনন্দ লাভ হয় তাহার সম্বন্ধে ঐ শ্রুতিই বলিতেছেন, "ইঁহার (অর্থাৎ এই ব্রহ্মের) ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, সূর্য্য উদিত হইতেছেন, অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ অধিকার-অনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন। অতঃপর আনন্দের মীমাংসা উক্ত হইতেছে। যদি কোন যুবক সাধু, বেদজ্ঞ, ক্ষিপ্রকারী, অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়েন এবং সকল-বিত্ত-পূর্ণ পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার যে সুখ হয়, তাহা একটী মানুষ আনন্দ(অর্থাৎ প্রকৃত মনুষ্যের ভোগ্য আনন্দ)। ঐরূপ শত মানুষ আনন্দ মনুষ্যগন্ধর্ব্বের অর্থাৎ গন্ধর্ব্বলোক-গত মনুষ্যের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটী আনন্দ। শত মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ দেব-গন্ধর্ব্বের (অর্থাৎ গন্ধর্ব্ব জাতিতে —দেবযোনিবিশেষে—উৎপন্ন ব্যক্তির) ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটী

---

(১) ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। দ্বিতীয়া বল্লী।

আনন্দ। শত দেবগন্ধর্ব্বের আনন্দ পিতৃলোকের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটী আনন্দ। শত পিতৃলোকের আনন্দ আজানজ দেবের অর্থাৎ স্মার্ত্তকর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব-প্রাপ্ত দেবতার ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটী আনন্দ। শত আজানজ দেবতার আনন্দ কর্ম্মদেবগণের অর্থাৎ বৈদিক-কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত দেবগণের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটী আনন্দ। শত তাদৃশ দেবগণের আনন্দ বসু রুদ্রাদি আধিকারিক দেবতাদিগের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটী আনন্দ। শত আধিকারিক দেবতার আনন্দ ইন্দ্রের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটী আনন্দ। শত ইন্দ্রের আনন্দ বৃহস্পতির ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটী আনন্দ। শত বৃহস্পতির আনন্দ প্রজাপতির ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের একটী আনন্দ। শত প্রজাপতির আনন্দ ব্রহ্মের ও নিষ্কাম বেদজ্ঞের অর্থাৎ মুক্ত জীবের একটী আনন্দ (১)। যিনি পুরুষোপলক্ষিত জীবে ও আদিত্যোপ-

---

(১) ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষাদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ইতি। সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়ক আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠ স্তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবানপিযন্তি শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং

লক্ষিত দেবতাতে স্থিত পরমাত্মা, তিনি একই। যিনি সেই পরমাত্মাকে এক বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনি মৃত্যুর পর এই অন্নময় প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ অতিক্রম পূর্ব্বক আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে এই মন্ত্র উক্ত আছে (১)।”

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বিভিন্ন স্তর আছে। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইয়া, নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া যে উপাসনা, তাহাই উপাসনার উৎকৃষ্টতম স্তর। অনুলোমক্রমে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় দেখা যায় নির্গুণ ব্রহ্মেরই একাংশ, বাসনা-রূপ অজ্ঞানের সংযোগে, অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে স্বরূপে থাকিয়াও, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর হইয়া জড়ে পরিণত হইয়াছে। এই জড়ে আসক্তি-বশতঃ জীব ক্রমশঃ জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ইহা তমোগুণাচ্ছন্ন ভাব। মানব এই নিম্নতম স্তরে যখন মুক্তির বাসনা লাভ করে, তখন তাহার জড়-ভাবাপন্ন বুদ্ধি অতি উচ্চ আত্মিক তত্ত্বের ধারণায় সক্ষম হয় না।

দেবানামানন্দাঃ স একো দেবানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।

(১) যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ। স য এবংবিদস্মা-ল্লোকাৎ প্রেত্যৈতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি এতং প্রাণময়মাত্মানমুপ-সংক্রামতি এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি এতং বিজ্ঞানময়মাত্মান-মুপসংক্রামতি এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। ইত্যষ্টমোঽনুবাকঃ। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। দ্বিতীয়া বল্লী।

কাজেই, স্বভাবতঃ, জড়ের মধ্যে শক্তির যে খেলা অনুভূত হয়, তাহারই প্রতি প্রথম তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া, সে অবশেষে উচ্চতম সোপানে উঠিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছে। যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে মানব-নির্ম্মিত মনুষ্যাকার দেব-দেবী-মূর্ত্তি অবলম্বনে সাধনার প্রথা প্রচলিত আছে, শুধু সেইখানেই যে এই নিয়মে কার্য্য হয় তাহা নহে; যে সকল সম্প্রদায়ে এরূপ ব্যবস্থা নাই, সেখানেও সাধককে এই সকল স্তর অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়। পরবর্ত্তী সম্প্রদায়সমূহ মানব-নির্ম্মিত মনুষ্যাকার দেব-দেবী-মূর্ত্তির অবলম্বনে সাধনা না করিলেও, মানব-নির্ম্মিত অন্য প্রকার মূর্ত্তির সাহায্যে সাধনা চালাইয়া থাকেন, এরূপ দেখা যায় (১)। প্রাথমিক সাধকের পক্ষে কোন প্রকার স্থূল অবলম্বন ব্যতীত সাধনা করা সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রে সাধনার স্তরভেদের এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়:— হৃদয়ে সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও কর্ম্মের উদ্দীপনা আনিয়া দেয়, এরূপ

---

(১) গীর্জ্জা, পবিত্র বাইবেল-গ্রন্থ, ঈশ্বর-পুত্র মনুষ্য যিশুর মূর্ত্তি, যিশু-মাতা মেরীর মূর্ত্তি, পক্ষবিশিষ্ট ও মনুষ্যাকার ঈশ্বর-দূতদিগের মূর্ত্তি, পবিত্র ক্রুশ ইত্যাদি খ্রীষ্টানগণের সাধনার সহায়তা করিয়া থাকে। প্রভু যিশুর জন্মস্থান প্যালেষ্টাইন তাঁহাদের তীর্থ, আর জর্ডান নদীর জল তাঁহাদের নিকট অতি পবিত্র।

মসজিদ, মসজিদের পশ্চিম ভাগে আল্লার আসন-স্বরূপে দরগা, কাবার মসজিদের চিত্র, পবিত্র কোরাণ-গ্রন্থ ইত্যাদি মুসলমানগণের সাধনার সহায়তা করিয়া থাকে। সিদ্ধ পীর বা দরবেশের কবর (দরগা), গাজি মাদারের বাঁশ, মহরমের সময় ব্যবহৃত রথাকার তাজিয়া—এগুলিও তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা করে। খোদার দোস্ত (ভগবানের বন্ধু) পয়গম্বর মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা, পলায়ন

মনুষ্য-নির্ম্মিত কোন স্থূল বস্তু অবলম্বনে যে বাহ্য পূজা বা আরাধনা, তাহা নিম্নতম (অধমাধম) ; বাহ্য উপকরণের দ্বারা পূজা প্রভৃতি না করিয়া, শুধু মন্ত্রবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মের নামবিশেষ জপ করা কিংবা

করিয়া গিয়া এক সময়ে তিনি যে স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন সেই মদিনা তাঁহাদের পরম পবিত্র তীর্থ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, হয় মানব-নির্ম্মিত কোন মনুষ্যাকার দেব-দেবী-মূর্ত্তি, না হয় মনুষ্য-নির্ম্মিত অন্যবিধ মূর্ত্তির প্রয়োজনীয়তা নিম্নস্তরের সাধকের আছে।

হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া যাঁহারা ঘৃণা করেন, তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্র ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোনই খবর রাখেন না। তাঁহারা, ভিতরের কোন সংবাদ না লইয়াই, স্থূল দৃষ্টিতে যাহা দেখেন এবং স্থূল বুদ্ধিতে যাহা বুঝেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, হিন্দুর শাস্ত্রে কোথায়ও এমন কথা নাই যে, কোন দেব বা দেবীর মনুষ্য-নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে পূজা করিবে। কোন হিন্দুও বোধ হয় তাহা করেন না। দোকানে বিক্রয়ের জন্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি রাখা হয়, সে স্থানে যাইয়া সেই মূর্ত্তির কি কেহ পূজা করিয়া থাকেন ? এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টই দেখান হইয়াছে যে, দেব-দেবীর মূর্ত্তিসকল সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও কর্ম্মের ভাবপ্রকাশক আলম্বন মাত্র। ঐ সকল মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই প্রাণশক্তিরূপী সগুণ ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়। ইহা ত সকলেই দেখিয়া থাকেন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিয়া কোন প্রতিমার সম্মুখেই পূজা করা হয় না, আর বিসর্জ্জন-মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া ঐ প্রাণ-শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লওয়ার পরও কোন প্রতিমার সম্মুখে পূজা, আরতি প্রভৃতি করা হয় না।

তাঁহার গুণ-কর্ম্ম উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্তব করা অধম ; বাহিরে কোন প্রকার ক্রিয়া না করিয়া সগুণ ব্রহ্মের গুণ বা কর্ম্মের স্মারক মূর্ত্তি বা ভাব-বিশেষের কেবল ধ্যান (একতান চিন্তা) করা মধ্যম ; আর নিজ চৈতন্য-সত্তা সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অতীত, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার-উপাধি-বর্জ্জিত, অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, এইরূপ জানিয়া তদ্ভাবাপন্ন হইয়া পড়া উত্তম সাধনা (১)।

ভগবানকে স্থান-বিশেষে সীমাবদ্ধ করা অপরাধে যদি হিন্দু অপরাধী হয়, তবে সর্ব্ব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই সে দোষে দোষী। আরাধনার সুবিধার জন্যই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ মনে করিয়া লওয়া হয় মাত্র। খ্রীষ্টান-গণও উপাসনার সময় স্বর্গস্থ পিতার জন্য উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, গীর্জ্জা তাঁহাদের উপাসনার স্থান ; মুসলমানগণও নমাজ করিবার সময় পশ্চিমমুখে বসিয়া সম্মুখে খোদার আসন ও সত্তা কল্পনা করিয়া থাকেন, মসজিদ তাঁহাদের উপাসনার স্থান।

এই যখন প্রকৃত অবস্থা, তখন নিম্নস্তরের সাধকগণেরও কিঞ্চিৎ উদার ও পর-মত-সহিষ্ণু হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নিজের অবলম্বনকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, পরের সেই শ্রেণীর অবলম্বনকে নিন্দা করায় নীচ সঙ্কীর্ণহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

(১) উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।১৪।১২১।

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতিঃ স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা॥
উত্তমা তত্ত্বচিন্তা স্যাজ্জপচিন্তা তু মধ্যমা।
শাস্ত্রচিন্তাধমা জ্ঞেয়া লোকচিন্তাধমাধমা॥

স্থূল আলম্বন লইয়া কিছুকাল সাধনা করিতে করিতে সাধক যখন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েন, তখন চৈতন্যের কিঞ্চিৎ স্পষ্ট আভাস তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। এতদিন চৈতন্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যেন অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তির মত ছিল। এখন অবলম্বিত মূর্ত্তিতে আরোপিত অন্তর্নিহিত শক্তির দিকেই তাঁহার লক্ষ্য বিশেষরূপে পড়ে। ইহাই উন্নত স্তরের সাধনার আরম্ভ। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সাধক দেখেন যে, বিভিন্ন মূর্ত্তি অবলম্বনে এতদিন যে বিভিন্ন শক্তির পূজা করিতেছিলেন, সে সমুদায় একই মূল শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। তখন তাঁহার সমস্ত চিন্তা সেই এক মূল শক্তির দিকে পরিচালিত হয়, বাহ্য আলম্বনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। মন এইরূপে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, সাধক বুঝিতে পারেন যে, জগতের যাবতীয় ব্যাপার সেই একই শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে (১), জগতের সমস্ত

পূজাকোটিসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটিসমো জপঃ।
জপকোটিসমং ধ্যানং ধ্যানকোটিসমো লয়ঃ॥

নহি নাদাৎ পরো মন্ত্রো ন দেবঃ স্বাত্মনঃ পরঃ।
নানুসন্ধেঃ পরা পূজা ন হি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্॥

কুলার্ণবতন্ত্রম্। দ্বাদশ উল্লাসঃ।

(১) ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৭।৪-৫।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৩।২৬।

বস্তু সেই একই চৈতন্যশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (১), সেই শক্তি নিখিল বস্তু ও জীবের জননী, তিনিই নিখিল সৌন্দর্য্যের—এক কথায় নিখিল সুখের—আধার। সাধকের বোধে তখন ইহাও স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঐ মূল শক্তি সদা বর্ত্তমান, ইনি জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ (২), তখন তিনি আরও দেখিতে পান, তাঁহার নিজের ভিতরেও ইনি বিদ্যমান। ইনি আছেন বলিয়াই তিনি (সাধক) এই বিচিত্রতাময় জগৎ দেখিতেছেন ও জানিতেছেন, এবং আনন্দ অনুভব করিতেছেন। ইঁহা হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া মনে হইলেও তিনি ইঁহা হইতে একটুও পৃথক্ নহেন। সুতরাং তাঁহার (সাধকের) নিজ সত্তাই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও অনুভূতির মূল। পরিবর্ত্তনই জগতের বিচিত্রতার হেতু। এ পরিবর্ত্তনের দ্রষ্টা তিনি (সাধক)। তিনি যেন একখানি স্থায়ী স্ফটিক, আর তাঁহাতে যেন নানা জিনিসের ও নানা ঘটনার ছায়া নানাকালে প্রতিফলিত হইতেছে। এইরূপে আত্মসত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার মনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং মনের ক্রিয়ার অভাবে সর্ব্বপ্রকার উপাধিও তিরোহিত হয়। তখন শক্তির খেলাও আর দেখা যায় না; এই হেতু, শক্তি যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তরঙ্গমালার সৃষ্টি করিতেছিলেন, সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাধকের নিজের সত্তা ডুবিয়া যায়। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এখানেই দুঃখের চির অবসান।

---

(১) চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তু সমাশ্রয়েৎ ॥ শিবসংহিতা।১।৫১।

(২) স্ব-স্বরূপে স্থিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শক্তির খেলাই অনুভূত হয়। আর মূলশক্তিকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা অতি কঠিন ব্যাপার।

শুধু পুস্তক পাঠে, অথবা শাস্ত্রের কতকগুলি কথা শুনিলে বা শিখিলে উচ্চ অবস্থা লাভ করা যায় না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, অধিকার-অনুসারে, একান্তমনে গুরুর উপদেশ-অনুযায়ী সাধনা করিতে হয়। বাহ্য পূজা, জপ, স্তবপাঠ ইত্যাদি নিষ্ঠা সহকারে ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহারা বেদান্ত-বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং যোগ-সাধনা দ্বারা আত্মদর্শনে যত্নবান্ হইবেন। আর যাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে প্রথমেই বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে (১) এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানিবার ও পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের আর বাহ্য স্থূল সাধনে বৃথা কালক্ষয় না করিয়া প্রথমেই সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া ও আন্তর সাধনায় (২) প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রকার-উপাধি-বর্জ্জিত এবং সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির সাক্ষিস্বরূপ যে সংবিৎ বা জ্ঞান (যিনি আত্মা) তাঁহাতে চিত্ত লয় করার নামই আন্তর সাধনা।

---

(১) জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৬।৪৪।

(২) যাবদান্তরপূজায়ামধিকারো ভবেন্ন হি।
তাবদ্বাহ্যামিমাং পূজাং শ্রয়েজ্জাতে তু তাং ত্যজেৎ॥
অভ্যন্তরা তু যা পূজা সা তু সংবিল্লয়ঃ স্মৃতঃ।
সংবিদেব পরং রূপমুপাধিরহিতং মম॥
অতঃ সংবিদি মদ্রূপে চেতঃ স্থাপ্য নিরাশ্রয়ম্।
সংবিদ্রূপাতিরিক্তন্তু মিথ্যা মায়াময়ং জগৎ॥
অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
ভাবয়েন্নির্মনস্কেন যোগযুক্তেন চেতসা॥

দেবীগীতা।৮।৪৩-৪৬।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:✿:—

আত্মা।

ব্রহ্মকে জানিতে হইলে মনকে ভিতরের দিকে ফিরাইতে হইবে, নিজের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে; 'আমি' কি?—ইহা জানিতে হইবে। 'আমাকে' জানিলে আত্মাকে জানা যায়, এবং আত্মাকে জানিয়া তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হইলে জীব ও ব্রহ্মে ঐক্য হইয়া জীবের মোক্ষ লাভ হয় (১)।

ব্যাপকত্ব ও মাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব নিবন্ধন হরিই পরমাত্মা শব্দে কীর্ত্তিত হয়েন (২)। যে বস্তু সর্ব্বব্যাপী ও সকলের সাক্ষী-স্বরূপ, তিনিই আত্মা। তাঁহাকেই বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু, শাক্তগণ কালী, শৈবগণ শিব, সৌরগণ সূর্য্য ও গাণপত্যগণ গণপতি বলিয়া থাকেন। (প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা সুস্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে)।

এক্ষণে, ইহার স্বরূপ কি ইহাই নির্ণয় করা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসাধ্য, কারণ বাক্য দ্বারা,

---

(১) তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ কঠোপনিষৎ। ১।১।১২।

(২) "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ।"

চক্ষু দ্বারা, কিম্বা চক্ষু ভিন্ন অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা, অথবা তপস্যা কিম্বা শুভকর্ম্ম দ্বারা তিনি যে কি বস্তু তাহা জানা যায় না (১)। এজন্য মহর্ষি বেদব্যাস তৎপ্রণীত বেদান্তসূত্রে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাঁহার এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন:—এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় যাঁহা হইতে হয় তিনিই ব্রহ্ম বা আত্মা (২)। ব্রহ্ম বা আত্মা একই জিনিস। "তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই (৩) তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করেন। ঐ একই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন (৪)। শ্রুতিতে অনেক স্থলে ইঁহাকে শুধু "আত্মা"ই বলা হইয়াছে (৫)।

---

(১) ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।

মুণ্ডকোপনিষৎ। ৩।১।৮।

(২) জন্মাদ্যস্য যতঃ। বেদান্তদর্শনম্। ১।১।২।

আত্মশব্দাচ্চ। আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ। অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ। বেদান্তদর্শনম্। ৩।৩।১৫-১৭।

(৩) সূর্য্যের কিরণ একই প্রকার, কিন্তু নানা বর্ণের দ্রব্যে যখন উহা পতিত হয় তখন উহা সেই সেই বর্ণরূপে দেখায়, সেইরূপ জ্ঞান বা চৈতন্য একই বস্তু, কিন্তু বিবিধ বিষয়ের যোগে উহা বিবিধ বলিয়া বোধ হয়; যেমন রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান, ইত্যাদি।

(৪) বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১।২।১১।

(৫) আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।

ঐতরেয়োপনিষৎ। ১।১।

ইনিই মানবগণের সাধনার লক্ষ্য বস্তু। ইঁহাকে লাভ করিলেই মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায় ও পরমা শান্তি লাভ করে। ব্যাসদেব গ্রন্থান্তরে কতকটা প্রত্যক্ষ প্রমাণের আভাস স্বরূপ বাক্য দ্বারা ইঁহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে :—হে অর্জ্জুন, মানবের চরম লক্ষ্য সেই পরম জ্ঞেয় বস্তু যিনি, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। তাঁহাকে জানিলে মানব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তিনি অনাদি পরব্রহ্ম; তিনি সৎও নহেন অসৎও নহেন (অর্থাৎ স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন)। সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত-পদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় আছে, তিনি জগতের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের গুণসমুদায়ের আভাসে অনুমিত হয়েন অথচ সমুদয়-ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত, তিনি অনাসক্ত অথচ সকলের আধার স্বরূপ, তিনি সত্ত্বাদিগুণ-রহিত অথচ সত্ত্বাদি গুণের পালক। তিনি জীবগণের বাহিরে ও অন্তরে আছেন; তিনিই স্থাবর, তিনিই জঙ্গম; তিনি অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ রূপাদি-বিহীন বলিয়া তাঁহাকে জানা যায় না; যদিও তিনি অজ্ঞানীর পক্ষে অতি দূরস্থ তথাপি জ্ঞানীর পক্ষে অতি নিকটস্থ বলিয়া অনুভূত হন (কারণ জ্ঞানী তাঁহাকে নিজ অন্তরাত্মা বলিয়া জানেন এবং তাঁহাকে ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই দেখেন)। তিনি অখণ্ড, কিন্তু ভূতসমূহে যেন বিভক্তরূপে অবস্থিত আছেন বলিয়া প্রতীয়মান হন। তিনি ভূতগণের সৃজন পালন ও সংহার করিতেছেন। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃসকলের জ্যোতিঃ-স্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক, তিনি অজ্ঞান-অন্ধকারের পরপারে অবস্থান করিতেছেন (অর্থাৎ অজ্ঞানী তাঁহাকে জানিতে বা দেখিতে পায় না); তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য (অর্থাৎ জ্ঞানের

দ্বারা প্রাপ্য) এবং সর্ব্বজীবের হৃদয়ে প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন (১)।

শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট মতে আত্মার লক্ষণ নির্ণিত হইল। কিন্তু, ইহাতে ত্রিতাপে তাপিত মানবের লাভ কি, যদি সে তাঁহাকে পাইতে না পারিল (২), তাঁহার কৃপারূপ অমৃত-সাগরে স্নান করিয়া সকল জ্বালা চিরদিনের তরে জুড়াইতে না পারিল? সুতরাং সেই দুর্জ্ঞেয় বস্তু, অথচ যাঁহাকে না পাইলে জীবনের জ্বালা জুড়াইবার দ্বিতীয় উপায় নাই, তাঁহাকে ধরিবার জন্য প্রাচীন কালের ঋষিগণ কঠোর তপস্যা গভীর ধ্যান ও তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির পরিচালন দ্বারা উপায় উদ্ভাবন করিয়া-

---

(১) জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৩।১২-১৭।

(২) জীবের আত্ম-বিস্মৃতিকেই জীবের আত্মহারা হইয়া থাকা বলা হয়।

ছিলেন। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, তিনি সর্ব্বব্যাপী, আবার জীব-হৃদয়েও অন্তরাত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই পরস্পর-বিরোধী বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, "আমি" কে, "আমি" কি, ইহা জানা আবশ্যক। সকল লোকই বাক্যস্ফূর্ত্তির সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত "আমি, আমি" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু সেই "আমি" কে বা কি ইহা কি কেহ চিন্তা করিয়া থাকে?

অনেকেরই এইরূপ ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় যে, হস্ত পদ মুখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট এই দেহই "আমি", কিন্তু হস্ত পদ ইত্যাদি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কতক কতক না থাকিলেও ত কেহ "আমি" শব্দ প্রয়োগ করিতে বিরত হয় না। এ ত গেল স্থূল অঙ্গের কথা। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলেও বেশ দেখা যায় যে, মানুষ 'আমি'কে পৃথক করিয়া রাখিতেছে, অথচ কার্য্যতঃ তাহা বুঝিতেছে না। "আমার হাত, আমার পা, আমার কথা, আমার মন, আমার বুদ্ধি" এইরূপ বাক্যসকলই শোনা যায়; সুতরাং ইহা ধ্রুব সত্য যে, হস্ত-পদাদি দূরে থাকুক বুদ্ধি ও "আমি" নহে, উহা আমার একটী বৃত্তি মাত্র। অতএব 'আমি' স্থূল ত দূরের কথা, অতি সূক্ষ্ম যে বুদ্ধি তাহা হইতেও পৃথক্। মন-বুদ্ধি যতক্ষণ আছে অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির সহিত "আমি" যতক্ষণ যুক্ত আছে ততক্ষণ "আমার" উপাধি, ততক্ষণ মন ও বুদ্ধির কার্য্য 'আমাতে' আরোপিত হইয়া 'আমি'কে একটী খণ্ড বস্তু বলিয়া দেখাইতেছে। এই অবস্থায়ই 'আমার' নাম প্রত্যগাত্মা বা অন্তরাত্মা, এবং 'আমি' জীবের হৃদয়ে বাস করে।

ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আত্মা সর্ব্বব্যাপী, আত্মা সর্ব্ববস্তুতে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। দৃশ্যমান জগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ও জীব-দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া উক্ত হয়। আত্মা যেমন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে

সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, সেইরূপ ব্যষ্টিভাবে জীবদেহেও সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে ধরিতে হইলে, যে স্থানে তাঁহার প্রকাশ অধিক সেই স্থানেই লক্ষ্য করিতে হয়। তিনি জীবের প্রাণকে উর্দ্ধদিকে এবং অপানকে অধোদিকে পরিচালিত করিতেছেন; তাঁহাকেই জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণ সেবা করিয়া থাকেন (১)।

উপাধিবশতঃ "আমি" সসীম বলিয়া বোধ হইলেও, 'আমি' সেই আত্মা ব্যতীত কিছুই নহে। মন-বুদ্ধির কার্য্যের সহিত 'আমার' সংশ্রব ত্যাগ করিলে, "আমাকে" ধরিবার উপযুক্ত আর কোন্ লক্ষণ থাকে? তখন 'আমা'কে নির্দ্দেশ করিতে হইলে, আত্মা বা ব্রহ্মের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া 'আমার' আর কোন্ লক্ষণ থাকে? এই খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ইঁহাকেই 'ভূমা' বলা হইয়াছে।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নিরুপাধি বা সর্ব্বব্যাপী আত্মায় পৌছিতে হইলে, প্রথম সোপাধি আত্মাকে বা হৃদ্গত প্রত্যগাত্মাকে (২) ধরিতে হইবে (৩)। তাঁহার সাধনায় সিদ্ধকাম হইলেই, নিত্য শুদ্ধ

---

(১) উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তি অপানমভ্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বদেবা উপাসতে। কঠোপনিষৎ।২।২।৩

(২) ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাদ্ হৃদ্গতপ্রত্যগাত্মনঃ॥
মম সংবিৎ পরতনোস্তস্য প্রাণা ব্রজন্তি ন।
ব্রহ্মৈব সংস্তদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম বেদ যঃ॥
দেবীভাগবতম্।৭।৩৭।৩১-৩২।

(৩) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥
কঠোপনিষৎ।১।২।২৩

অনন্ত-শক্তিসাগর সেই আত্মাকে লাভ করা যাইবে। এই হৃদগত প্রত্যগাত্মায় মন-বুদ্ধিকে একমুখীন করিয়া নিয়ত নিযুক্ত রাখিলে, চিত্ত-চাঞ্চল্যের হেতুভূত সঙ্কল্প-বিকল্প ক্রমে ক্রমে থামিয়া যাইবে, অতএব স্বভাবতঃই মন ও বুদ্ধি লয় প্রাপ্ত হইবে। মন ও বুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হইলে কারণ-অভাবে উপাধি বিনষ্ট হইবে, তখন মেঘ-মুক্ত দিবাকরের ন্যায় প্রত্যগাত্মা উপাধি-মেঘ-মুক্ত হইয়া স্বীয় মহিমায় পরমাত্মরূপে প্রকাশ পাইবেন (১)। এই জীবোপাধি নাশের সঙ্গে সঙ্গে পরমের স্বপ্রকাশকেই জীব-পরমের মিলন বলে,———ইহা পরমাত্মা বলিয়া একটী পৃথক্ বস্তুর সহিত জীবাত্মা বলিয়া অপর একটী বস্তুর মিলন নহে। আত্মার জীবোপাধি-মোচনই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন বা পরমরূপ সাগরে জীবরূপ তরঙ্গের বিলয় (২)। ইহাই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য; ইহাই পরম মোক্ষ; ইহাই সকল সাধনার চরম লক্ষ্য। যতদিন মানব এই অবস্থা লাভ করিতে না পারিতেছে, ততদিন তাহার দুঃখের চির-অবসান হইবে না।

[এই এক আত্মজ্ঞানের অভাবে মানুষ সংসারে কি দুঃখের খেলাই খেলিতেছে! নিত্য সুখের কথা বা মোক্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাংসারিক সুখের কথাই আমরা এখানে বিবেচনা করিতেছি, কারণ সাধারণ মানুষ সাংসারিক সুখের জন্যই অধিক লালায়িত। অজ্ঞান ব্যক্তি তাহার দেহকেই 'আমি' বলিয়া মনে করে, কাজেই অন্য-দেহ-রূপী অন্য ব্যক্তিকে সে পর বলিয়া জানে, তাহাকে আপন বলিয়া মনে

---

(১) 'স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব।'

(২) ইহা যে নিরানন্দের বিষয় নহে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বাধ্যায়ে অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে তৈত্তিরীয়-শ্রুতি হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দেখুন।

করিতে পারে না। আত্মাকে সে দেহের সঙ্গে এমন করিয়া মিশাইয়া ফেলিয়াছে যে, সে দেহের সুখ ছাড়া আর কিছুরই কথা ভাবিতে পারে না, এবং এই সুখলাভের নিমিত্ত পরকে পীড়ন করিতে সে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। ভেদ-জ্ঞান তাহার অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে, তাই সে পরের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া ও মিথ্যা আচরণ করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চিত করিতেছে এবং তাহার বিত্ত ও অধিকার নিজে গ্রহণ করিয়া কিছুকালের জন্য আপনাকে সুখী ও উন্নত বোধ করিতেছে। ভেদজ্ঞানের আশ্রয়ে অপর এক ব্যক্তি আবার তাহাকে প্রতারিত করিতেছে, তাহাকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইতেছে। দিবানিশি এই ঘাত-প্রতিঘাতের বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও মানুষ মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি ছাড়িতে চেষ্টা করিতেছে না, ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? কেহই নিজে প্রতারিত বা উৎপীড়িত হইতে চাহে না; কিন্তু অন্যকে প্রতারণা করিলে বা উৎপীড়ন করিলে, তাহা যে নিজের উপরই কোন না কোন আকারে ঘুরিয়া আসিবে, তাহা বুঝিবার শক্তি তাহার নাই, তাহা যদি থাকিত তবে সে নিশ্চয়ই এ কুপথ হইতে বিরত হইত। নীতিশাস্ত্রে সৎপথে চলিবার জন্য কোটী কোটী উপদেশ রহিয়াছে, পুরাণ প্রভৃতিতে কত কঠোর নরকের ভয় দেখান হইয়াছে, তথাপি চুরি, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, এসব নিবারিত হইতেছে কৈ? ভেদজ্ঞান দূর না হইলে ইহা কিছুতেই যাইবে না। এই ভেদজ্ঞান দূর করিবার একমাত্র উপায় আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-অর্জ্জন। যখন মানুষ দেখিবে বা বুঝিবে যে, একই আত্মা সকল দেহে বিরাজ করিতেছেন, তখন সে বুঝিবে 'অন্যের উপর অত্যাচার' অর্থ 'নিজের শরীরেই অস্ত্রাঘাত করা', নিজের যাতনা নিজেই সৃষ্টি করা। সেই সময়, কেবল সেই অবস্থায়ই, সে অসদ্বৃত্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া ভগবদ্-বুদ্ধিতে সকলের সেবায় মনোনিবেশ করিতে

পারিবে এবং একগুণ সেবার বিনিময়ে দশগুণ সেবা তাহার উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে। এইরূপে সুখময় স্বর্গরাজ্য জগতে স্থাপন করা যায়, অন্যথা নহে।]

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে প্রত্যগাত্মারই ভজনা করিতে হইবে। কি বেদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সর্ব্বত্রই এই আত্মার উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে (১)। বাহ্য প্রতিমা অবলম্বনে পূজায়ও নিম্নাধিকারীকে প্রতিমারূপ আলম্বন দিয়া এই আত্ম-পূজায়ই নিযুক্ত করা হইয়াছে (প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। জীবদেহে

---

(১) সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ।৩।১।৫

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥
কঠোপনিষৎ।২।৩।১৭

তৎ ত্বং নরেন্দ্র জগতামথ তস্থুষাঞ্চ
দেহেন্দ্রিয়াসুধিষণাত্মভিরাবৃতানাম্।
যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিশ্বগাবিঃ
প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবাংস্তমবেহি সোঽস্মি॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্।৪।২২।৩৭।

তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্।
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ হরিম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্।৪।২৪।৭০।

এই আত্মা ও প্রাণ যেন মাখামাখি হইয়া রহিয়াছে, প্রাণ যেন আত্মার শরীর। সুতরাং প্রাণের ভিতর দিয়াই আত্মাকে ধরিতে হইবে। সাধারণ লোকের ধারণা যে, নিশ্বাসপথে আমরা যে বাহিরের বায়ু গ্রহণ করি তাহাই প্রাণরূপে আমাদের ভিতর অবস্থিত, প্রাণ স্থূল বায়ু ব্যতীত কিছু নহে। ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। প্রত্যগাত্মার আরাধনা করিতে হইলে প্রাণ যে কি বস্তু তাহা জানা আবশ্যক।

অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
ভাবয়েন্নির্মনস্কেন যোগযুক্তেন চেতসা॥

দেবীভাগবতম্।৭।৩৯।৪৬।

ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাদ্ হৃদ্গতপ্রত্যগাত্মনঃ॥
মম সংবিৎ পরতনো স্তস্য প্রাণা ব্রজন্তি ন।
ব্রহ্মৈব সংস্তদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবেদ যঃ॥

দেবীভাগবতম্।৭।৩৭।৩১-৩২।

ন হি নাদাৎ পরো মন্ত্রো ন দেবঃ স্বাত্মনঃ পরঃ।
নানুসন্ধেঃ পরা পূজা ন হি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্॥

কুলার্ণবতন্ত্রম্। নবম উল্লাসঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:*:—

প্রাণ।

যোগশাস্ত্রে প্রাণকে প্রাণ-বায়ু বলা হইয়াছে, তাহাতে অনেকেরই ধারণা যে, প্রাণ সাধারণ বায়ু মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, প্রাণ শক্তি। ঐ শক্তির কার্য্য বায়ুর ন্যায় এই জন্য উহা বায়ু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রে এই প্রাণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চ প্রাণ ও কোন কোন স্থলে উহাকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া দশ প্রাণ (১) বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রাণ পাঁচটী বা দশটী নহে, উহা সংখ্যায় এক। একই প্রাণ আমাদের দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্য করিতেছে, এবং উহার কার্য্যের বিভিন্নতা-অনুসারে স্থানভেদে উহার নাম-ভেদ হইয়াছে মাত্র। জগতে যত প্রকার শক্তি আছে তাহার মূল প্রাণশক্তি; এই শক্তিবলে জগতের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে (২)। চক্ষু-গোলক কর্ণ-কুহর প্রভৃতিকে লোকে ভুলবশতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনে করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ওগুলি ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার মাত্র, সেইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ

---

(১) প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটী প্রাণের বিভিন্ন বৃত্তি, ইহার প্রথম পাঁচটীকে পঞ্চ প্রাণ বলে।

(২) "প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥"

বায়ু প্রাণ নহে, উহা প্রাণের কার্য্য-পরিচয় মাত্র,—লোকে ভ্রমবশতঃ এই শ্বাস-প্রশ্বাসবায়ুকে প্রাণ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

প্রশ্নোপনিষদে উক্ত আছে যে, আত্মা হইতেই প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছেন। ছায়া যেমন পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই পুরুষেই সমর্পিত থাকে, সেইরূপ প্রাণ আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই আত্মাতেই সমর্পিত থাকেন। মনের বিবিধ বিকৃত অবস্থা হইতে কর্ম্মফল ভোগের জন্য প্রাণ শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন (১)।

কৌষীতকী-উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, কাশিপতি সুপ্রসিদ্ধ দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন নিজ বীরত্বপ্রভাবে দেবগণকে জয় করিয়া ইন্দ্রের আলয়ে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। কিন্তু প্রতর্দ্দন ইন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট সকল মানবের হিতকর কোন বর লও।" ইন্দ্র অপরের জন্য বর লইতে চাহিলেন না। তখন প্রতর্দ্দন তাঁহাকে নিজের জন্যই বর লইতে বলিলেন, কিন্তু ইন্দ্র কোন বর না চাহিয়া বলিলেন, "একমাত্র আমাকে জ্ঞাত হও, ইহাই মানবের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাপেক্ষা হিতজনক বলিয়া মনে করি। আমাকে, অর্থাৎ আমার যথার্থ আত্মাকে জানাই উচিত" (২)। এইরূপ বলিয়া তিনি আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক, আত্মজ্ঞান দ্বারা যে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়, তাহা প্রকাশ করিলেন। পরে তিনি বলিলেন, "আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞারূপী

(১) আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষ পুরুষেচ্ছায়ৈতস্মিন্নে-তদাততং মনোবিকৃতেন আয়াত্যস্মিন্ শরীরে। প্রশ্নোপনিষৎ। ৩।৩।

(২) স হোবাচ মামেব বিজানীহি। এতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে যন্মাং বিজানীয়াৎ।

কৌষীতকী-উপনিষৎ। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আত্মা। আমাকে আয়ু ও অমৃত স্বরূপ জানিয়া উপাসনা কর। আয়ুই প্রাণ, প্রাণই আয়ু, প্রাণই অমৃত। যত দিন এই দেহে প্রাণ থাকেন ততদিনই পরমায়ু। প্রাণের দ্বারাই পরলোকে অমৃতত্ব লাভ হয় (১)। প্রজ্ঞা (২) দ্বারা সত্য সঙ্কল্প লাভ হয়। যে আমাকে আয়ু (অর্থাৎ জীবন) ও অমৃত (অর্থাৎ অবিনশ্বর) বলিয়া উপাসনা করে, সে পৃথিবীতে পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করিয়া মরণান্তে স্বর্গে গমন করে, এবং সেখানে সে সনাতন জীবন উপভোগ করিয়া থাকে (৩)।" ইন্দ্র আরও বলিলেন, "বাক্‌শক্তিহীন ব্যক্তিরও জীবন দেখা যায়, মূক (বোবা) সকল তাহার দৃষ্টান্ত; দর্শনশক্তিহীন ব্যক্তিও বাঁচিয়া আছে দেখা যায়, অন্ধেরা তাহার দৃষ্টান্ত; শ্রবণশক্তিরহিত ব্যক্তিও জীবন ধারণ করিয়া থাকে, বধিরসকল তাহার দৃষ্টান্ত; চিন্তাশক্তিহীন ব্যক্তিও প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, শিশুগণ তাহার দৃষ্টান্ত; কাহারও বাহু বা উরু ছিন্ন হইলেও সে বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা বা চৈতন্য, ইনিই শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক উহাকে নড়িতে চড়িতে সমর্থ করেন। এই জন্য ইহাকেই ওঙ্কাররূপে,

---

(১) স হোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব। আয়ুঃ প্রাণঃ প্রাণো বা আয়ুঃ প্রাণ এবামৃতম্। যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ। প্রাণেন হ্যেবামুষ্মিল্লোঁকে অমৃতত্বমাপ্নোতি।
কৌষীতকী-উপনিষৎ। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(২) চৈতন্য শব্দে জ্ঞান বুঝায়। এই জ্ঞানই চেতনার মূল এবং প্রজ্ঞা নামে খ্যাত।

(৩) প্রজ্ঞয়া সত্যং সঙ্কল্পম্। স যো মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্তে সর্ব্বমায়ুরস্মিল্লোঁকে এতি, আপ্নোত্যমৃতত্বমক্ষিতিং স্বর্গে লোকে।
(কৌষীতকী-উপনিষৎ)।

পরমাত্মার প্রতীকরূপে, উপাসনা করিবে। যিনি প্রাণ তিনিই চৈতন্য বা জ্ঞান, যিনি জ্ঞান তিনিই প্রাণ। এই চৈতন্য ও প্রাণ দেহে একত্র অবস্থান করেন এবং দেহ হইতে সম্মিলিতভাবেই বহির্গত হইয়া যান। ইহাই প্রাণ-উপাধিযুক্ত আত্মার বিজ্ঞান বা অবগতি (১)।" তাহার পর, কোন লোক নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়সকল তাহার প্রাণে বিলীন হয়, এবং সে জাগ্রত হইলে অগ্নি হইতে চতুর্দ্দিকে স্ফুলিঙ্গ-সকল যে প্রকার বিক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ পুনরায় নিজ নিজ বিষয়ে ধাবমান হয়; কোন লোকের মৃত্যুর সময় তাহার ইন্দ্রিয়সকল ক্রমে প্রাণে লীন হয় (এই জন্য বাক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি ক্রমে লোপ হয়), শেষে ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হয়। এই সকল কথা বলিয়া ইন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "বাগিন্দ্রিয়কে জানিতে হইবে না, বক্তাকে জানিতে হইবে; ঘ্রানেন্দ্রিয়কে জানিতে হইবে না, আঘ্রাণকর্ত্তাকে জানিতে হইবে; দর্শনেন্দ্রিয়কে জানিতে হইবে না, দর্শনকারীকে জানিতে হইবে; শ্রবনেন্দ্রিয়কে জানিতে হইবে না, শ্রোতাকে জানিতে হইবে; রসনাকে জানিতে হইবে না, রস-গ্রহণকারীকে জানিতে হইবে; কর্ম্মকে জানিতে

(১) জীবতি বাগপেতো মূকান্ হি পশ্যামো জীবতি চক্ষুরপেতোঽন্ধান্ হি পশ্যামো জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামো জীবতি মনোঽপেতো বালান্ হি পশ্যামো জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীবতি উরুচ্ছিন্ন ইতি এবং হি পশ্যাম ইতি। অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি। তস্মাদেতদেবোক্থম্ উপাসীত। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতস্তস্যৈব দৃষ্টিঃ। এতদ্ বিজ্ঞানম্।

(কৌষীতকী-উপনিষৎ)।

হইবে না, কর্ম্মের কর্ত্তাকে জানিতে হইবে; সুখ ও দুঃখকে জানিতে হইবে না, সুখ ও দুঃখের অনুভব-কর্ত্তাকে জানিতে হইবে; আনন্দ বা রতিকে জানিতে হইবে না, আনন্দ বা রতির জ্ঞাতাকে জানিতে হইবে; গমনকে জানিতে হইবে না, গমনকারীকে জানিতে হইবে; মনকে জানিতে হইবে না, মননকর্ত্তাকে (চিন্তাকারীকে) জানিতে হইবে। বাক্য, গন্ধ, রূপ, শব্দ প্রভৃতি যে দশটী বিষয়ের সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইল ইহারা ভূতমাত্রা, ইহারা ইন্দ্রিয়দিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আর বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় অধিভূত, ইহারা বাক্য গন্ধ রূপ প্রভৃতি বিষয়সকলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যদি বিষয় না থাকে তবে ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না, আবার যদি ইন্দ্রিয় না থাকে তবে বিষয় থাকিতে পারে না। এই দুইয়ের একটীর অভাবে অপরটী থাকিতে পারে না। এই ইন্দ্রিয় ও বিষয়সকল নানা নহে (১), অর্থাৎ কেহ কাহাকে ছাড়া নহে। যেমন চক্রের নেমি অরসমূহে এবং

---

(১) ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ; ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত ঘ্রাতারং বিদ্যাৎ; ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত, রূপবিদ্যং বিদ্যাৎ; ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত, শ্রোতারং বিদ্যাৎ; নান্নরসং বিজিজ্ঞাসীত, অন্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ; ন কর্ম্ম বিজিজ্ঞাসীত, কর্ত্তারং বিদ্যাৎ; ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত, সুখদুঃখয়োর্বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ; নানন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং বিজিজ্ঞাসীত, আনন্দস্য রতেঃ প্রজাতে বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ; ন ইত্যাং বিজিজ্ঞাসীত, এতারং বিদ্যাৎ; ন মনো বিজিজ্ঞাসীত, মন্তারং বিদ্যাৎ। তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতম্। যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুর্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ। ন এতন্নানা। (কৌষীতকী-উপনিষৎ)।

অরসমূহ নাভিতে প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ বিষয়সমুদায় ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণই চৈতন্য, অজর, অমর ও আনন্দস্বরূপ। ইনি সৎকার্য্য দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, কিংবা অসাধু কর্ম্ম দ্বারা ক্ষীণ হয়েন না। ইনি যাহাকে উর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহাকেই সৎকার্য্য করাইয়া থাকেন, আর যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে অসৎ কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। ইনি লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি সকলের ঈশ্বর। ইঁহাকে যিনি আত্মা বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিই আত্মাকে বিদিত হয়েন (১)।"

ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে, দ্বিতীয় খণ্ডে, মুখ্য প্রাণের বিষয় এইরূপ উক্ত আছে :—দেবতাগণ ইন্দ্রিয়সমূহ-রূপ গৌণ প্রাণ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মরূপী মুখ্য প্রাণেরই প্রতিরূপ বোধে উদ্গীথ নামক ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন; অসুরেরা ঐ মুখ্য প্রাণকে পাপসংযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু খনন করার অযোগ্য কঠিন পাষাণ খনন করিতে গেলে যেমন খননের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রাদিই নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তাহারা নিজেই বিনষ্ট হইয়াছিল। মুখ্য প্রাণকে যিনি এইপ্রকার গুণযুক্ত বলিয়া জানেন, তাঁহাতে যে ব্যক্তি পাপসংযোগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করে বা তাঁহাকে যে ব্যক্তি হিংসা

---

(১) তদ্‌যথা রথস্য অরেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ। ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে। এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিঃ এষ সর্ব্বেশঃ। স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স আত্মেতি বিদ্যাৎ। (কৌষীতকী-উপনিষৎ)।

করে, সেও বিনষ্ট হয়। এই মুখ্য প্রাণের দ্বারা কি সুগন্ধ কি দুর্গন্ধ কিছুই জানা যায় না, কারণ ইনি পাপ-স্পর্শ-রহিত। ইনি যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন, তাহা দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়সকলের পোষণ হয়। এইজন্য ইনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে বিরত হইলে জীবের অন্তকাল উপস্থিত হয়, এবং পোষক দ্রব্যের অভাবে অপরাপর ইন্দ্রিয় জীবদেহ ত্যাগ করে। অঙ্গিরানামক ঋষি মুখ্য প্রাণের সহিত অভেদবুদ্ধিতে ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন, এইহেতু প্রাণের এক নাম আঙ্গিরস। আঙ্গিরস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অঙ্গের রস। প্রাণই অঙ্গের রস অর্থাৎ সার, সুতরাং আঙ্গিরস শব্দে প্রাণ বুঝায় (১)।

বেদান্তদর্শনের মতে শ্রেষ্ঠ প্রাণ বায়ু বা তাহার স্পন্দনরূপ ক্রিয়া নহে। যেমন মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এক মনেরই বৃত্তিভেদ মাত্র, সেইরূপ প্রাণ, অপান, ব্যান উদান ও সমান এক মুখ্য প্রাণেরই বিভিন্ন বৃত্তি। প্রাণ অণুস্বরূপ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম (২)।

---

(১) অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরা ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেত।

এবং যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসত এবং হৈব স বিধ্বংসতে য এবং-বিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাসতি স এষোঽশ্মাখণঃ।

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষ তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি এবমু এবান্ততোঽবিত্ত্বোৎ-ক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি।

তং হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তেঽঙ্গানাং যদ্রসঃ। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।১।২।৭-১০।

(২) ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ। বেদান্তদর্শনম্।২।৪।৯

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে। অণুশ্চ। ঐ ২।৪।১২-১৩।

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাণ বায়ু নহে, উহা জীবন—জীবচৈতন্য। যতদিন প্রাণ আছে ততদিন দেহ সজীব থাকিবে ও ক্রিয়াশীল থাকিবে। সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকল প্রাণে লয় হয় বটে, কিন্তু প্রাণ সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রসকল পরিত্যাগ করে না; তখনও হৃদয়ের স্পন্দন রক্তসঞ্চালন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতে থাকে, এবং আমরা জাগরিত হওয়া মাত্রেই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি স্ব স্ব স্থানে সমাগত হয়, ও ইন্দ্রিয়গণ পুনরায় কার্য্য করিতে থাকে। প্রাণের যে শক্তি-বলে হৃৎপিণ্ড ও বায়ুকোষের গতি হইতেছে, তাহা দূর হইলে, ইন্দ্রিয়-সকল হইতে প্রাণ সরিয়া পড়ে এবং ইহাই আমাদের মৃত্যু।

জীবের মৃত্যুসময়ে প্রাণ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইন্দ্রিয়গণ এই প্রাণেই লীন হইয়া থাকে, আবার যখন দেহ ধারণ করিবার সময় আসে, তখন ঐ প্রাণই স্থূল দেহ নির্ম্মাণ করে, এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলের স্ফূরণ হইতে থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে, জীবাত্মাই দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে (১); বেদান্তদর্শনে আছে, প্রাণেরই দেহ হইতে উৎক্রমণ হয় (২)। বাস্তবিক প্রাণ ও জীবাত্মা অভিন্ন—প্রাণ যেন জীবাত্মার উপরকার আবরণ। প্রাণ ও জীবাত্মা ওতঃপ্রোত ভাবে মাখামাখি হইয়া রহিয়াছে। যেখানে প্রাণ নাই, সেখানে জীব-চৈতন্যের কোন কাজ হইতে কখনও দেখা যায় না।

---

(১) মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধান্ ইবাশয়াৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৫।৭-৮।

(২) প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ। বেদান্তদর্শনম্। ৪।২।১২।

এই ত হইল প্রাণের কথা। এক্ষণে, কি করিলে মানব বিকারের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়, তাহাই দেখা দরকার। আত্মাকে ধরা ব্যতীত মোক্ষলাভের দ্বিতীয় পথ নাই। আত্মা ও প্রাণ অভিন্ন, তাই আত্মাকে ধরিতে হইলে প্রাণকে ধরা আবশ্যক। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমাত্র প্রাণায়ামের দ্বারা জীবের সকল পাপ নষ্ট হয় (১), এবং জীব মোক্ষ লাভ করে। এক্ষণে প্রাণায়াম কি? প্রাণায়াম বলিতে প্রাণের আয়াম বা বিস্তার, এবং গোরক্ষসংহিতার মতে প্রাণের সংরোধ বুঝায় (২)। এই প্রাণায়াম-ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির ভাব অবলম্বন করে, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও দেহ-যন্ত্রসকল প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট হওয়ায়, ব্রহ্মসত্তা অনুভূতির আনুকূল্য হয়। প্রাণায়ামই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু সাধারণতঃ অঙ্গুলী-সাহায্যে নাসিকার ছিদ্র একবার বন্ধ করিয়া ও একবার ছাড়িয়া দিয়া, রেচক পূরক এবং কুম্ভক দ্বারা যে ক্রিয়া করাকে প্রাণায়াম বলা হয়, তাহা আন্তর প্রাণায়াম নহে। ঐ বাহ্য ক্রিয়া দ্বারা অন্তঃশোধনের কিছু আনুকূল্য হওয়ায়, অন্তঃপ্রাণায়ামের সুবিধা হয়, এই মাত্র (৩)।

শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম (৪)। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য

---

(১) যথা হি সাধিতঃ সিংহো মৃগান্ হন্তি ন মানুষান্।
তদ্বন্নিবিদ্ধঃ পবনঃ কিল্বিষং ন নৃণাং তনুম্॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণম্।

(২) আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানঃ সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি স্মৃতানি ষট্॥ গোরক্ষসংহিতা।

(৩) বালবুদ্ধিভিরঙ্গুলাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাচ্ছিদ্রমবরুধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈস্ত্যাজ্যঃ। ঋগ্বেদভাষ্যম্।

(৪) তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। (তস্মিন্ সতি অর্থাৎ আসন দৃঢ় হইলে।) পাতঞ্জলদর্শনম্। সাধনপাদঃ।

প্রাণ ও অপানের সংযোগকে প্রাণায়াম কহেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, দেহের মধ্যে প্রাণকে নিরুদ্ধ রাখার নাম প্রাণসংযম বা প্রাণায়াম, ইহাই প্রাণ-জয়ের উপায় ও মৃত্যুনিবারক (১)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রাণায়াম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, "কেহ কেহ প্রাণকে অপানে লয় করেন, পুনরায় অপানকে প্রাণে লয় করেন, আর যখন প্রাণ ও অপানের গতি রহিত হয় তখন সাধক প্রাণায়াম-পরায়ণ হয়েন (অর্থাৎ এইরূপে প্রাণায়াম করিয়া থাকেন)। কেহ কেহ মিতাহারী হইয়া প্রাণের সমুদায় বৃত্তিই প্রাণে হোম বা লীন করিয়া থাকেন (২)। কোন অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন না করিয়া, প্রাণের স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে প্রাণায়াম করা যায়, তাহাতে প্রাণ ও অপানের গতি স্বভাবতঃই রহিত হইয়া আসে, তখন শ্বাসবায়ু কেবল নাসিকাদ্বয়ের অভ্যন্তরেই বিচরণ করে, বাহিরের বায়ু বাহিরেই থাকে এবং ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে মুক্ত পুরুষের লক্ষণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই অন্তঃ প্রাণায়ামের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন (৩)।

---

(১) "প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ॥"
প্রাণসংযমনং নাম দেহে প্রাণবিধারণম্।
এষ প্রাণজয়োপায়ঃ সর্ব্বমৃত্যুপ্রঘাতকঃ॥ যোগী-যাজ্ঞবল্ক্যম্।

(২) অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৪।২৯।

(৩) স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥

এই খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে যোগ-প্রসঙ্গে এই বিষয়ের বিবরণ আরও দেওয়া হইবে। প্রাণায়াম যেমন আসনবদ্ধ অবস্থায় অভ্যাস করিতে হয়, সেইরূপ ইহা যোগীকে সর্ব্বসময়ের জন্যই করিতে হয়, নচেৎ প্রতিদিন দুই তিন বার সামান্য সময়ের জন্য এই সাধন করিলে সেরূপ কোন ফল লাভ হয় না। এই ক্রিয়া সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবার জন্য শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (১), এবং সর্ব্বদা যদি ইহাতে লাগিয়া থাকা যায় তবেই পাপ বিনষ্ট হয় ও সাধক মোক্ষ লাভ করেন।

তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আসনবদ্ধ অবস্থায় অঙ্গুলী-সাহায্যে নাসাছিদ্র রুদ্ধ করিয়া যে ক্রিয়া করা হয়, তাহা অন্তঃপ্রাণায়াম নহে। ওরূপ ক্রিয়া সকল সময়ের জন্য সম্ভবপর নহে। সুতরাং সদ্গুরুর নিকট উপদেশ না পাইলে, প্রকৃত প্রাণায়াম যে কি তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না, এবং তাহার অনুষ্ঠানও করা যায় না।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি র্মুনি র্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৫।২৭-২৮।

(১) তস্মাদ্ যুক্তঃ সদা যোগী প্রাণায়ামপরো ভবেৎ।
শ্রূয়তাং মুক্তিফলদং তস্যাবস্থাচতুষ্টয়ম্॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণম্। যোগচিকিৎসানামকোঽধ্যায়ঃ।

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ সদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরম্।
সর্ব্বকালপ্রয়োগেণ সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ॥ উত্তরগীতা।১।৮।

অঙ্গুষ্ঠাৎ পবনং ধ্যেয়ং, ধ্যায়েত্তৎ পরমেশ্বরম্।
অশ্বারূঢ়ো গজারূঢ়ঃ সংগ্রামে শকটে রণে॥

গীতাসারঃ।৫৫।

অজপায় (১) মনোনিবেশ দ্বারা অন্তঃপ্রাণায়াম সাধনের বিশেষ সহায়তা হয়। ইহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলে, সাংসারিক কার্য্য ও শারীরিক কার্য্যসকল অভ্যাসবশতঃ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়; সুতরাং সাধকের মনে কোন প্রকার আসক্তির সংশ্রব না থাকায়, তিনি মুক্ত হয়েন। এই অবস্থাই চৈতন্য-সমাধি। ইহাই উৎকৃষ্টতম

---

(১) রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ।
গুণবদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কর্ষতি॥
প্রাণাপানবশো জীবো হ্যধশ্চোর্দ্ধং চ গচ্ছতি।
অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি॥
ঊর্দ্ধাধঃ সংস্থিতাবেতৌ যো জানাতি স যোগবিৎ।
হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ॥
হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতি॥
এতৎসংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
অজপা-নাম-গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদা সদা॥
যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ।২৯-৩৩।

শ্রীপ্রসাদপরামন্ত্রমূর্দ্ধাম্নায়মধিষ্ঠিতম্।
আবয়োঃ পরমাকারং যো বেত্তি স স্বয়ং শিবঃ॥
শিবাদিক্রিমিপর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্ত্তনা।
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে॥
... ...
শ্রীপ্রসাদপরামন্ত্রং ন গায়ন্তঃ কুলেশ্বরি।
ন লভন্তে হি মোক্ষং তে ত্বৎপ্রসাদবিবর্জ্জিতাঃ।
কুলার্ণবতন্ত্রম্। তৃতীয় উল্লাসঃ।

সাধনা। ইহা দ্বারা যে অবস্থা লাভ হয় তাহাই সাধনার চরম লক্ষ্য।

এই অজপার সাহায্যে যে সহজ যোগ-সাধনা হয়, এবং যাহা অবলম্বন করিলে সর্ব্বদা আত্মস্বরূপে অবস্থান করা যায়, সেই যোগ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগেই সাধু-মহাজনগণ কর্ত্তৃক আচরিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

সপ্তম অধ্যায়।

—:*:—

যোগ।

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "জ্ঞানকে যোগাত্মক বলিয়া জানিবে; এই যোগ অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট; জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাই যোগ বলিয়া উক্ত হয় (১)।" দেবীগীতায়ও আছে, যাঁহারা যোগ-বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, "জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকেই, অর্থাৎ এই উভয়ের অভেদ-সাধনকেই, যোগ কহে (২)।"

পরমের সহিত জীবের মিলনই যোগ। যোগ আর বিয়োগ দুটী অবস্থা। জীব সর্ব্বদাই পরম হইতে দূরে আছে,—বিয়োগে আছে। স্বয়ম্ভূ (বিধাতা) ইন্দ্রিয়সকলকে বহির্ম্মুখীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়সকল বাহিরের বিষয়ে—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে—আসক্ত। সুতরাং দেহাভিমানী জীবসকল কেবল বাহিরের বিষয়ই দেখে, আর দিবানিশি বাহিরের বিষয়ের কথাই ভাবে,—ভিতরের দিকে তাকাইতে

---

(১) জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগশ্চাষ্টাঙ্গসংযুতম্।
সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
যোগীযাজ্ঞবল্ক্যম্।১।৪৩।

(২) ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহু র্যোগং যোগবিশারদাঃ॥
দেবীগীতা।৫।২।

পারে না, ভিতরের অবস্থা বুঝে না। পরমের সহিত তাহাদের দেখা হইবে কেমন করিয়া? তাহারা সর্ব্বদাই বিয়োগে আছে। কেবল কোন কোন জ্ঞানী লোক চক্ষুকে ভিতরের দিকে ঘুরাইয়া আনেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে আকর্ষণ করিয়া ভিতরের দিকে ফিরাইয়া আনেন, এবং তাঁহারাই অন্তরাত্মাকে দেখিতে পারেন (১),—কেবল তাঁহারাই পরমের সহিত মিলিত হইতে পারেন, কেবল তাঁহারাই পরম অবস্থা লাভ করিতে পারেন। পরমের সহিত জীবের এই যে মিলন, ইহারই নাম যোগ।

এই যোগই জীবের সাধনা, ইহাই জীবের ভব-যাতনা হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়। জীবের চিত্ত ভগবানে (পরমে) যুক্ত না হইয়া বিষয়ে যুক্ত হয়, ভগবানের সহিত মিলিত না হইয়া বিষয়ের ভাবে ভাবিত হয়, সুতরাং জীব সময়ে সময়ে বিষয়জাত কিছু কিছু সুখ ভোগ করিলেও, জীবনের অধিকাংশ সময়েই শারীরিক ও মানসিক বিবিধ অসুখে তাপিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছে,—ইহাই ভবযাতনা। চিত্ত যতদিন অন্তর্মুখীন না হইতেছে, জীব যতদিন নিজের অন্তরের দিকে এবং জগতের যাবতীয় বস্তুর ভিতরের দিকে লক্ষ্য করিয়া, এক অখণ্ড অনন্ত সনাতন চিদানন্দময় বস্তুর সত্তা অনুভব করিতে না পারিতেছে, ততদিন এ যাতনার বিরাম নাই।

এই যাতনার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, মানব আপন আপন প্রকৃতি ও অধিকার-অনুসারে নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে, এবং

---

(১) পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ কঠোপনিষৎ।২।১।১

সেই সেই চেষ্টার ফলে হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, মন্ত্রযোগ, কর্ম্মযোগ ইত্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে। অনেক সাধক এই সকলের কোন না কোন একটী অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অবলম্বিত সাধনার রহস্য বুঝিয়া আচরণ করেন তাঁহারা উত্তম, আর যাঁহারা তাহা বুঝেন না, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধান মাত্র পালন করিয়া যান, বহুকালেও তাঁহাদের উন্নতি তেমন কিছু অনুভব করিতে পারা যায় না। আর এক শ্রেণীর সাধক আছেন, যাঁহারা ঐ সকল সাধনা অনেক করিয়া হয়ত বিশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হয়েন নাই, অথবা যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ঐরূপ সাধনা বহু করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে আর উহা করিবার স্পৃহা যাঁহাদের নাই (১)। এরূপ সাধকদিগের জন্য আর একটী পথ আছে, আর একপ্রকার যোগ আছে। সেই যোগের নাম রাজগুহ্য যোগ। ইহা অনুষ্ঠান করিবার জন্য কোন প্রকারের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। এই সাধনা অতি সরল ও সুখকর, এবং ইহাতে অক্ষয় শান্তি লাভ হয় (২)। ইহা যোগসমূহের

---

(১) প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৬।৪১-৪৪

(২) রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৯।২।

মধ্যে রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং ইহার বিধান শাস্ত্রে কোথায়ও তেমন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, অর্থাৎ ইহা চিরদিনই গুরুবক্তৃগম্য (গুরুর নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়), এইজন্য ইহার নাম রাজগুহ্য যোগ (১)। ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্মেরও অপূর্ব্ব সম্মিলন আছে (২)।

এই যে পরবর্ত্তী সাধকশ্রেণীর কথা বলা হইল, ইহারা রাগমার্গের (৩) সাধক। ইহারা বিষয়ের মধ্যে থাকুন আর নাই থাকুন, নিজ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য বিষয়ভোগে ইহাদের স্পৃহা আদৌ নাই,

---

(১) বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥
জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্।

ইহা যে ইচ্ছা করিয়া গোপন করা হয় তাহা নহে। ইহা ভাষায় প্রকাশ করাই যায় না। গুরু শিষ্যকে ক্রমে প্রক্রিয়াগুলি দেখান এবং তাহার অবস্থা বিচার করিয়া তাহাকে চালাইতে থাকেন।

(৩) ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চাহেতু অভেদ-ভাবের উপলব্ধি হওয়ায় জ্ঞানযোগ, আত্মবস্তুতে মন স্থাপন করায় আত্যন্তিক ভক্তি বা পরা ভক্তি এবং অনাসক্তভাবে প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় কর্ম্মযোগ সাধিত হয়।

(৪) মার্গ অর্থ পথ। সাধনা দ্বারা ভগবানে পৌঁছান যায় অর্থাৎ ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, এজন্য সাধনাকে মার্গ বলা হয়। সাধনা যত প্রকারেরই থাকুক না কেন, উহা দুই ভাগে বিভক্ত, বিধিমার্গের সাধনা ও রাগমার্গের সাধনা, সংক্ষেপে বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। এই এই প্রকারে সাধনা করিলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ এইরূপ ভাবে না চলিলে পাপ হয় ও নরক ভোগ করিতে হয়, সুতরাং এইরূপ এইরূপ

কিম্বা কোন প্রকার বিভূতির প্রত্যাশীও ইহারা নহেন, কেবল ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্তই ইহারা একান্ত লালায়িত। ইহাদের জন্যও শাস্ত্র পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি গুপ্তভাবে আছে, শাস্ত্রের স্থানে স্থানে অতি সংক্ষেপে ও কৌশলে তাহার বিষয় লিখিত আছে। কেবল সিদ্ধ পুরুষগণই সে পথ জানেন এবং তাঁহারা কৃপা করিয়া যাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেন তাঁহারাই তাহা দেখিতে পান। মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই।

ভাবে চলিতে হয় ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রে পাঠ করিয়া, অথবা গুরুর নিকট বা মহাজনের মুখে শুনিয়া, সেই সেইরূপে চলা বা সাধনা করাকে বিধিমার্গে চলা বলা হয়। বিধি আছে, ব্যবস্থা আছে, সেইজন্য সেইরূপ অনুষ্ঠান করা হয়, উহাতে সাধকের নিজের প্রবল আসক্তি নাই, ভালবাসার প্রবল-প্রবাহে বাহিত হইয়া সাধক এ পথে ছোটেন না। রাগ অর্থ অনুরাগ, প্রবল আসক্তি। যে সাধনে সাধ্য ইষ্টবস্তুর প্রতি প্রবল অনুরাগই প্রধান উপাদান, তাহাকে রাগমার্গ কহে। সাধনার চরম লক্ষ্য ভগবান্ বা ব্রহ্ম, তাঁহা অপেক্ষা বড় ইষ্ট আর কেহ নাই, তিনিই পরম মঙ্গলের একমাত্র আধার, ইহা জানিয়া তাঁহার প্রতি যাঁহার একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাঁহাকে না দেখিলে অর্থাৎ না অনুভব করিলে যিনি অস্থির হইয়া পড়েন, তাঁহাতে ছাড়া আর কাহারও প্রতি যাঁহার মন ধাবিত হয় না, সেইরূপ সাধকের সাধনাই রাগমার্গ নামে অভিহিত। ইহাতে কোন বিধি ব্যবস্থার অপেক্ষা নাই, কাহারও মতামত বা নিন্দা-প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, ইহাতে ব্রহ্ম বা ভগবান্ ব্যতীত আর কোন বস্তুতেই সাধকের লক্ষ্য যায় না। এইপথে গমনকারী সাধক দেখেন ব্রহ্মই অব্যক্ত-মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং তিনিই সকলের একমাত্র গতি, প্রভু, পালনকর্ত্তা,

সকল লোক এক প্রকারের নয়, সকল সাধকও এক প্রকার রুচি-বিশিষ্ট নহেন। যাত্রা বা নাটকে সকল প্রকার রসেরই অভিনয় করা হয়, কারণ এক প্রকার রসের অভিনয় করিলে দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করা যায় না। দর্শক ও শ্রোতৃগণের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বীররস ভালবাসেন, কেহ করুণ-রস ভালবাসেন, কেহ বা হাস্যরস ভালবাসেন, কেহ নৃত্য দেখিতে ভালবাসেন, কাহারও গান শুনিতে ভাল লাগে, কাহারও বা বক্তৃতা শুনিয়া তৃপ্তি হয়; সুতরাং সকল বিষয়ই অল্প বিস্তর উহার মধ্যে থাকে। যাঁহার যেটী ভাল লাগে তিনি সেইটীই মনোযোগ সহকারে দেখেন বা শুনেন, অন্যগুলি উপেক্ষা করেন, এবং রঙ্গস্থল হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় যাঁহার যেটী ভাল লাগিয়াছে তিনি সেইটীরই প্রশংসা করিতে করিতে যান। কিন্তু দর্শক ও শ্রোতৃগণের মধ্যে এক দল লোক থাকেন, তাঁহারা ঐ অভিনয়ের মধ্যে যে যে স্থানে সামাজিক বা ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ আছে সেই গুলির প্রতি বিশেষ করিয়া মনোযোগ করেন, এবং তাহার সার মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া লইয়া যান যে, তাহা দ্বারা তাঁহাদের নিজের জীবন ও অপর পাঁচ জনের জীবন গঠিত করিয়া

আশ্রয়স্থান ও সুহৃৎ; ব্রহ্মেরই অধীনে প্রকৃতি বা মায়া কার্য্য করিতেছেন। এই শ্রেণীর সাধক অনন্যমনে পরমাত্মার চিন্তায়ই নিযুক্ত থাকেন এবং আহার, হোম, তপস্যা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মই তাঁহাতে সমর্পণ করেন। তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে এরূপ ভাব আসিতে পারে না। এরূপ সাধক ব্যবহারিক জগতের কার্য্যসমূহের মধ্যেও অন্তরে ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকেন, কিন্তু বাহিরের লোকে তাহা বুঝিতে পারে না, সুতরাং অধিকাংশ সময়ই গোপনে গোপনে তাঁহার সাধনা চলে। এইজন্য ইহাকে গোপীভাবের সাধনাও বলা যাইতে পারে।

উঠিতে পারিবেন। অন্যেরা কেবল আমোদ উপভোগ করিতেই যান, তাঁহারা সাময়িক একটা আনন্দ উপভোগ করিয়া চলিয়া আসেন, এবং হয়ত দুই চারিটী অসার ভাব মাত্র হৃদয়ে পোষণ করেন। পুরাণাদি শাস্ত্রেও সেইরূপ নানা ভাব ও নানা কথা থাকে। যিনি যেমন অধিকারী, তিনি উহার মধ্য হইতে সেই প্রকার অংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মহাপুরুষেরাই কেবল শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য জানেন, এবং তাহার মধ্যে লুক্কায়িত যে অতি সহজ, সুখগম্য এবং সরল একটী পথ আছে তাহাও তাঁহারাই জানেন। যাঁহারা দীর্ঘপথ ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন অথচ গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারেন নাই, অথবা হয়ত গন্তব্য স্থানের সন্ধান পর্য্যন্ত পান নাই, তাঁহারাই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে নানাবিধ সেবায় সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সেই পথের সন্ধান জানিয়া (১), পরম বস্তুকে সত্বরেই লাভ করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী উৎকৃষ্ট বৈদ্য যেমন বিবিধ-উপসর্গযুক্ত কোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, উপসর্গ মাত্র নিবারণের জন্য ঔষধ না দিয়া, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক মূল ব্যাধি নির্ণয় করতঃ, প্রধানতঃ তাহারই ঔষধ দেন এবং তাহাতে মূল ব্যাধি নাশের সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গগুলি আপনা আপনি দূর হয়, সেই প্রকার মহাপুরুষগণ শিষ্যের কামক্রোধাদি উপসর্গ নিবারণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া, ঐ সকলের মূল যে দেহাত্মবোধ-রূপ ব্যাধি ("দেহই আমি" এই জ্ঞানরূপ রোগ) তাহাতে আঘাত করেন, সুতরাং দেহাত্মবোধ-নাশের সঙ্গে

(১) তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥
শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ৪।৩৪।

সঙ্গে কাম ক্রোধাদি আপনা আপনি কমিয়া যাইতে থাকে, এই কারণে শিষ্য শীঘ্র শীঘ্র শাস্তি লাভে সক্ষম হয়।

এই শ্রেণীর সাধকগণ আন্তর পূজায় নিযুক্ত থাকায় বাহিরে সাধারণ সাধকদিগের মত আচার অনুষ্ঠান বড় করেন না, সে জন্য অনেকে তাঁহাদের আচরণের তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা (সমালোচনাকারিগণ) জানেন না যে, বিধিমার্গের আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানসকলে আর ইঁহাদের প্রয়োজন নাই, সেই সকল অনুষ্ঠানের ফলে যত দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে ইঁহারা তাহা হইয়াছেন,—যে পরিমাণে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে তাহা লাভ করিয়াছেন, এখন প্রকৃত বস্তুকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার মধুর আস্বাদ সম্ভোগ করাই ইঁহাদের কর্ম্ম (১)।

তবে অবশ্য এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ পথেও কণ্টক আছে। অনেক দুষ্ট লোক মহাপুরুষ সাজিয়া সরলপ্রাণ লোকদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকে, ইহলোক ও পরলোকের অনিষ্টকর এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর মনগড়া দুই একটী কর্ম্মকে রাগমার্গ বলিয়া উপদেশ দেয়, এবং বিধিমার্গের সাধনে উহারা যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিল সেই স্থান হইতে উহাদিগকে বহু পশ্চাতে সরাইয়া আনে ও অধঃপতিত করে। অপর দিকে, যাহারা সাধন-ভজনে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহা আদৌ পছন্দ করে না, তাহারাও ঐ ভ্রান্ত পথকে উৎকৃষ্ট মনে করিয়া, হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া, তাহা অবলম্বন করে। তাহাদের ভাগ্য নিতান্তই মন্দ। মন কিঞ্চিৎ পরিমাণে বশ না হওয়া

---

(১) যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ২।৪৬।

পর্য্যন্ত, এবং বিচারশক্তির বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রবর্ত্তকগণের বিধিমার্গেই চলা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে রাজগুহ্য যোগ বা রাগ-মার্গের যে সাধনা তাহারই কথা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র অবলম্বনে যতদূর সম্ভব, এই অধ্যায়ে বলা হইবে। অন্য প্রকারের যোগ-সমূহের কথা অনেক শাস্ত্রেই সবিশেষ বর্ণিত আছে, এজন্য আর সে সম্বন্ধে কিছু লেখা হইল না।

বৈদিক যুগের ঋষিগণ প্রথম সেই যোগ সাধনার কথা শুনাইয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শ্লোকে দেখিতে পাই, "অরণিকাষ্ঠে অগ্নি আছে, কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অগ্নি যে ঐ কাষ্ঠের মধ্যে নাই এরূপ নহে। ঐ অরণিকাষ্ঠ দুই খণ্ড পরস্পর ঘর্ষণ করিলে কাষ্ঠের মধ্যে যে অগ্নি লুক্কায়িত ছিল তাহা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ প্রণবের সাধনা দ্বারাও এই দেহে আত্মার দর্শন লাভ হয়। নিজের দেহকে অধঃ অরণি ও প্রণবকে উত্তর অরণি কল্পনা করিয়া (১), পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ নির্ম্মথনের দ্বারা, অরণিকাষ্ঠে লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় দেহে লুক্কায়িত আত্মাকে সাধক দর্শন করেন। যে প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে তিল হইতে তৈল বাহির করা যায়, মন্থন-দণ্ডের সাহায্যে দধি হইতে ঘৃত (মাখন) লাভ করা যায়, খনিত্রাদিদ্বারা শুষ্ক নদীগর্ভ খনন করিলে (অথবা স্রোতের মধ্যে ঘটাদি নিমজ্জিত করিয়া তুলিলে) জল পাওয়া যায়, এবং ঘর্ষণ দ্বারা অরণিকাষ্ঠে অগ্নি প্রকাশিত হয়,

---

(১) অগ্নি-উৎপাদনের জন্য বর্ত্তমানে যেমন দেশলাইয়ের বাক্স ব্যবহৃত হয়, অতি প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না, অরণিকাষ্ঠ-নির্ম্মিত এক প্রকার যন্ত্র ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। যাঁহারা পিচকারি দেখিয়াছেন তাঁহারা এই যন্ত্র সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন।

সেইরূপ যিনি সত্যনিষ্ঠা ও ধ্যানযোগাদি দ্বারা পরমাত্মার অন্বেষণ করেন তিনি এই দেহেই তাঁহার (অর্থাৎ পরমাত্মার) সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। ঘৃত যেমন দুগ্ধের সকল অংশের মধ্যেই ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে, কিন্তু মন্থনদণ্ড দ্বারা মন্থন করিয়া উহা বাহির করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ আত্মা দেহের সর্ব্বস্থানে এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকিলেও, আত্মবিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) ও তপস্যা (ধ্যান-নির্ম্মথন) দ্বারা তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়। ঐ আত্মার স্বরূপ উপনিষদেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানের সাহায্যে, যিনি সাধনা দ্বারা ভগবানের অন্বেষণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন (১)। মুণ্ডকোপনিষদেও আছে, "প্রণবই ধনু, আত্মা (মন) শর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন লক্ষ্য বস্তু। যেমন সুসন্ধানে ধনুকে বাণ

---

(১) বহ্নে র্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি
ন র্দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য
স্তদ্বোভয় বৈ প্রণবেন দেহে॥ ১৩।
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ ১৪।
তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি
রাপঃ স্রোতঃস্বরণিষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি॥ ১৫।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যা তপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্॥ ১৬।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিলে, উহা লক্ষ্য বস্তুকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়া থাকে, সেইরূপ প্রমাদবিহীন-চিত্তে পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রে ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া সাধককে তন্ময় হইতে হইবে (১)।

মহর্ষিগণ এইরূপভাবে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, পরমাত্মাকে লাভ করিবার এই একমাত্র পন্থা। বস্তুতঃ, যিনি নিজের ঘরে যে রত্ন আছে তাহা চিনিতে চেষ্টা না করেন এবং চিনিয়া লইতে না পারেন, তিনি কি প্রকারে অন্যত্র যে রত্ন রহিয়াছে তাহা চিনিতে পারিবেন (২)? সুতরাং নিজের দেহে যাঁহার বাস তাঁহাকে আগে চেনা চাই, তাঁহাকে আগে ধরা চাই, নচেৎ অন্যত্র তাঁহাকে কিরূপে চেনা যাইবে? সমুদ্রের এক স্থান হইতে একটু জল তুলিয়া পরীক্ষা করিলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে যে, সমুদ্রের জল সর্ব্বত্রই লবণাক্ত ও স্বচ্ছ, সেইরূপ নিজ দেহে আত্মার গতি কর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লইলে, অন্যত্রও তাঁহাকে জানিতে পারা যায় এবং ক্রমশঃ সর্ব্ব ভূতে, অবশেষে সর্ব্বময়, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় (৩)। নচেৎ "ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন" এই কথা শুনিয়া বা শাস্ত্রে পড়িয়া, অনুমানের

---

(১) প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ।

(২) 'ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং সিদ্ধি র্ব্বরাননে॥'

(৩) যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ॥

উপর নির্ভর করিয়া, নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলে কোন লাভ নাই। সুতরাং প্রথমতঃ নিজের দেহে তাঁহাকে ধরিতে হইবে। দেহে ভগবান্ আছেন, শুধু ইহা জানিলে হইবে না, তাঁহাকে ধরিতে হইবে। তাঁহাকে ধরার একটা কৌশল আছে, এবং তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দুগ্ধবতী গাভীর সর্ব্ব শরীরেই দুগ্ধ আছে, কারণ দুগ্ধ গাভীর শরীরের এক প্রকার রস ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু দুগ্ধ পাইতে হইলে গাভীর দেহের অন্য কোন অংশ টানিলে তাহা পাওয়া যায় না, কেবল বাঁট টানিলেই তাহা পাওয়া যায়। সেইরূপ আত্মা কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিলেও, কেবল পূর্ব্বোক্ত ধ্যানরূপ মন্থন-ক্রিয়া দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় (১)। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মাও এই প্রকারের সাধনবলেই ভগবানের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন (২)। সুতরাং বেদ-প্রকাশক ব্রহ্মা যে সাধনা করিয়াছিলেন, এবং আদি ধর্ম্মশাস্ত্র বেদে যে সাধনা

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বাত্মদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ২।১৪-১৫।

(১) "গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযোগাত্তাষামেব তদৌষধম্ ॥
তথা সর্ব্বশরীরস্থঃ সর্পির্ব্বৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু ॥"

(২) ততো নিবৃত্তোঽপ্রতিলব্ধকামঃ
স্বধিষ্ণ্যমাসাদ্য পুনঃ স দেবঃ।

উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সত্যযুগের সাধনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগেই ভগবান্‌কে পাইবার উপযুক্ত এই একই সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। বহিরঙ্গ সাধন বহু প্রকার ছিল এবং আছে। সে সমুদায়ই চিত্তশুদ্ধির জন্য (১)। সেই সকল অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি সকামভাবে করেন, তাঁহার চিত্ত বহুদিনে বা বহু জন্ম পর শুদ্ধ হইয়া জ্ঞানলাভের উপযুক্ত হয় (২), আর নিষ্কামভাবে যিনি করেন, তাঁহার চিত্ত সত্বর নির্ম্মল হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে, ভগবৎ-প্রাপ্তির যে মুখ্য সাধন, তাহাতে অধিকার জন্মে। যাঁহারা নিত্য ও বিমল আনন্দ চান, তাঁহারা বিষয়ের অস্থায়িত্ব ও দুঃখমিশ্রিত ভাব দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহারা, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব ও বিষয় হইতে সুখ লাভের আশা এ উভয়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক, সদা বর্ত্তমান যে জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ বস্তু তাহার অন্বেষণ করেন। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য চারি

শনৈর্জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তো
হৃষীদদারূঢ়সমাধিযোগঃ ॥
কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাভি-
প্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ।
স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাত-
মপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্ব্বম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্।৩।৮।২১-২২।

(১) কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৫।১১

(২) বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৭।১৯।

যুগেই এক প্রকার সাধনার কথা বলা হইয়াছে। সেই পথ ছাড়া মুক্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই (১)। সত্যযুগের সাধনার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের সাধনা ক্রমে দেখান যাইতেছে।

যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বশিষ্টদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন :— অভ্যাসবলেই (অন্য উপায়ে নহে) পুরুষ শোকাতীত, আত্মারাম এবং অন্তরে সুখসম্পন্ন হয়েন, সুতরাং তুমি অভ্যাসপরায়ণ হও। অভ্যাসের দ্বারা প্রাণের পরিস্পন্দন দূরীভূত হইলে মন প্রশমিত হয়, তখন নির্ব্বাণ-সুখ লাভ হয় (২)। পদ্মপুরাণান্তর্গত শিবগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেবাদিদেব মহাদেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, "যে ধীর পুরুষগণ কেশাগ্রপ্রমাণ (অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম), বিশ্বদেবতা, জাতবেদরূপ (অগ্নিরূপ অর্থাৎ প্রকাশকরূপ) এবং বরণীয় আমাকে আপনার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহারা অনন্ত শান্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন, আর যাঁহারা ভেদদর্শী তাঁহারা সেই সুখ লাভে সমর্থ হন না (৩)"। ইহাই ত্রেতা যুগের সাধনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

---

(১) নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।৩।৮।

(২) আত্মারামো বীতশোকো ভবত্যন্তঃসুখঃ পুমান্।
অভ্যাসাদেব নান্যস্মাৎ তস্মাদভ্যাসবান্ ভব॥
অভ্যাসেন পরিস্পন্দে প্রাণানাং ক্ষয়মাগতে।
মনঃ প্রশমমায়াতি নির্ব্বাণমবশিষ্যতে॥
যোগবাশিষ্টরামায়ণম্। উপশমপ্রকরণম্।৭৮।৪৫-৪৬।

(৩) বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে
বিশ্বদেবং জাতবেদং বরেণ্যম্।
মামাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্। শিবগীতা।৬।৪৬।

দ্বাপরযুগে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই যোগের বিষয়ই উপদেশ দিয়াছেন :—'কেহ কেহ প্রাণকে অপানে এবং কেহ বা অপানকে প্রাণে আহুতি দেন, এইরূপে প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া তাঁহারা প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকল সংযত করিয়া প্রাণসকলকে প্রাণেই আহুতি দেন্ (ইন্দ্রিয়গণকে মুখ্য প্রাণে বিলীন করেন) (১)। বাহ্য বিষয়গুলিকে বাহিরে রাখিয়া অর্থাৎ মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে না দিয়া, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া, এবং নাসিকার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানকে সমভাবাপন্ন করিয়া (২), যিনি ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, সেই ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধহীন এবং মোক্ষপরায়ণ যে মুনি তিনি সদা মুক্ত (ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই মুক্ত) (৩)।

---

(১) অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৪।২৯-৩০।

(২) অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধ ও অধোগতি দূর হয়, সুতরাং বায়ু শুধু নাসিকার ছিদ্রের ভিতরেই বিচরণ করে, বাহিরে অনুভূত হয় না।

(৩) স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি র্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৫।২৭-২৮।

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকল জীবকে ঘুরাইয়া (অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া) তাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুগ্রহে পরম শান্তি ও নিত্য ধাম প্রাপ্ত হইবে (১)।' অতএব, দ্বাপরযুগের নিমিত্ত এই সাধন, ইহা বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে, কলিযুগের সাধন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে, তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ ভাগে, উক্ত হইয়াছে, "কলিযুগের সঞ্চার হইবা মাত্রই, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম জ্ঞান প্রভৃতি লইয়া নিজ ধামে প্রস্থান করায়, লোকসকল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে; সেই অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্তই এক্ষণে এই ভাগবত-রূপ সূর্য্য উদিত হইল (২)।" সেই শ্রীমদ্ভাগবতে আত্মরূপী ভগবানের পূজাই সর্ব্বত্র বিহিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে মহাদেব দেবী পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "হে প্রিয়ে, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, পুনরায় ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে গতি নাই।......সকল বেদ, পুরাণ, স্মৃতি এবং সংহিতাদি শাস্ত্র দ্বারা একমাত্র আমি প্রতিপাদ্য, আমা বিনা জগতে সকলের উপাস্য দেবতা

---

(১) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৮।৬১-৬২।

(২) কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১.৩।৪৫।

আর কেহই নাই (১)।" সুতরাং, কলিযুগে পুরাণ ও তন্ত্রমতে যে সাধন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় সেই আত্মার উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চ-সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুগণ-মধ্যে বর্ত্তমানে সৌর ও গাণপত্যের সংখ্যা নিতান্ত কম। এক্ষণে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব উপাসকের সংখ্যাই ভারতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা তন্ত্র ও পুরাণের মতানুসারে চলিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে তন্ত্রের স্থূল সাধন অবলম্বন এবং পুরাণের গল্পাংশ পাঠ ও আলোচনা করিয়াই তৃপ্ত থাকেন। অল্প লোকেই তন্ত্রের ও পুরাণের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে সক্ষম। শৈবগণ ভস্ম মাখেন, রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করেন, শিবনাম উচ্চারণ ও শিবমন্ত্র জপ করেন। শাক্তগণ মৎস্য ও মাংস আহার করেন, এবং ভগবতীর নাম উচ্চারণ ও শক্তিমন্ত্র জপ করেন; কেহ কেহ রক্ত বস্ত্র পরিধান করেন এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ ও ললাটে সিন্দূরের বা রক্তচন্দনের ফোঁটা ধারণ করেন। বৈষ্ণবগণ ললাটে তিলক ও গলদেশে তুলসীমালা ধারণ করেন, মাংস আহার করেন না, (অনেকে

---

(১) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥

... ...

সর্ব্বৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।
প্রতিপাদ্যোঽহম্মি নান্যোঽস্তি প্রভু র্জগতি মাং বিনা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

বেদ, স্মৃতি ও পুরাণে আত্মার উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। আর বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রতিপাদ্য এবং উপাস্য বস্তু যখন একই, তখন তন্ত্রেও আত্মপূজার উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে।

মৎস্যও ভোজন করেন না), এবং বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ ও বিষ্ণুমন্ত্র জপ করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রানভিজ্ঞ এবং সাধনার প্রকৃত রহস্য অবগত নহেন, তাঁহারা ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর নাম-রূপ লইয়া এত ব্যস্ত যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। কিন্তু, ঐ সকল সম্প্রদায়-মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ বা যাঁহারা ভগবানের কৃপায় কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরে উঠিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা গোঁড়ামি করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করেন না, এবং সকল সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত উপাদেয় সারভাগটুকু উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হয়েন। তন্ত্র ও পুরাণ যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পান যে, বৃক্ষের মূল যেমন মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত থাকে এবং অতি অল্প স্থানই অধিকার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি বাহিরে বহুস্থান ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ সকল শাস্ত্রে ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য স্থানে স্থানে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বাহ্যানুষ্ঠানের রীতি, দেবতার নাম, রূপ, ধ্যান, স্তব এবং ঐ সকলের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক কথা (পুরাণসমূহে ঐ সকলের পোষক ও শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক উপাখ্যানসকল) বিস্তৃতরূপে লেখা হইয়াছে। কিন্তু, এই গ্রন্থের "পঞ্চোপাসনা"নামক অধ্যায়ে আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মদেবের পূজা ও ভজন প্রচারই পুরাণ এবং তন্ত্রেরও উদ্দেশ্য।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কলিযুগের জন্য একটা পৃথক্ সাধন বা পৃথক্ ধর্ম্ম কিছুই নাই। পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। তবে, যুগ-পরিবর্ত্তনে, লোকের শক্তি ও অবস্থা অনুসারে, বাহ্য অনুষ্ঠানের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, নচেৎ পুরাণসমূহে রূপক ও উপাখ্যান-ভাগের মধ্য দিয়াও সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেও কেবল উচ্চাধিকারীরাই ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য ও

উচ্চতত্ত্ব বুঝিয়া তদ্ভাবে ভাবিত হইতেন, আর জন-সাধারণ তাঁহাদের ভাবের অনুকরণ করিত এবং ধর্ম্মের বাহ্য স্থূল আচরণাদি করিত, এখনও তাহাই হইতেছে।

কলিযুগে শাক্তমতে যে পঞ্চ মকারের সাধন চলিত আছে, তাহাও তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভেদে ত্রিবিধ। তামসিক মতে অনুকল্প পদার্থ শস্যাদি দ্বারা পঞ্চ মকারের কল্পনা করা হয়, রাজসিক মতে মদ্য মাংস মৎস্য প্রভৃতি দ্বারাই পঞ্চ মকারের সাধনা হয়, আর সাত্ত্বিক মতে যোগের বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা পঞ্চ মকারের কার্য্য করা হইয়া থাকে। আগমসার ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এই সাত্ত্বিক পঞ্চ মকারের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, স্থানান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে (দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় দেখুন)। বৈষ্ণবদের যে পঞ্চরসের সাধনা আছে, তাহার মধ্যে মধুর-রস বা শৃঙ্গার-রস শ্রেষ্ঠতম (১)। এই শৃঙ্গার-রস তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক ভেদে ত্রিবিধ বলা যাইতে পারে। তামসিক ভাবে ভজনাঙ্গ বলিয়া ইহা করিলেও, কেবল কামবৃত্তির চরিতার্থতারূপ সুখের প্রতিই লক্ষ্য থাকে ; রাজসিকভাবে ইহাতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার উদ্দেশ্য

---

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আদিলীলা। ৪র্থ পরিচ্ছেদ।
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁ'র উপাসন॥
ঐ মধ্যলীলা। ৮ম পরিচ্ছেদ।
তটস্থ হইয়া হৃদি'বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
ঐ আদিলীলা। ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

থাকে না, কেবল বীর্য্য-ধারণের সামর্থ্য পরীক্ষিত হয়; আর সাত্ত্বিক ভাবে ইহাতে স্ত্রীপুরুষের সম্মিলনরূপ ব্যাপার কিছুই থাকে না,—তখন ইহা আন্তর প্রাণায়াম দ্বারা নিষ্পন্ন বিশুদ্ধ যোগের ক্রিয়া মাত্র। এই সাত্ত্বিক শৃঙ্গার ও শাক্তের সাত্ত্বিক মৈথুনের (১) মধ্যে কোন পার্থক্য নাই (দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে মৈথুন-তত্ত্ব ও শৃঙ্গার-রসের সাধনা যে কি তাহা দেখান হইবে)। এই ক্রিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই নামে কথিত হইত না। এই অধ্যায়ে বৈদিকযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগের সাধনা-সম্বন্ধে প্রমাণ উল্লিখিত করিয়া যে যোগের কথা বলা হইয়াছে, মৈথুনতত্ত্ব বা শৃঙ্গাররসের সাধন তাহা হইতে ভিন্ন নহে। এই শ্রেষ্ঠতম সাধনার যে দুইটী নাম রাখা হইয়াছে, তাহাতে কলির দুর্ব্বলমনা বহু সাধক, ভ্রমে পতিত হইয়া, অধঃপতিত হইতেছেন। নিতান্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণকে, প্রবৃত্তি-মার্গের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে উচ্চতম স্তরে আনিবার জন্য এরূপ করিলেও (২), শাস্ত্রকারগণ যথাযোগ্য স্থানে সাধককে সাবধান করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

সাধারণ লোকের একটা ধারণা এই যে, "কলিযুগে অন্য কোন সাধনা নাই, কলিতে কেবল নাম-সংকীর্ত্তন। কলির জীব অন্নগত-প্রাণ,

---

(১) মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥

আগমসারতন্ত্রম্।

(২) নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈথুনম।
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।৯।২৪৮।

(ইহা ব্যতীত সাত্ত্বিক মৈথুনতত্ত্ব ও শৃঙ্গার রসের ব্যাপার দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

ধ্যান ধারণা সমাধি ও সব কলিযুগে হইতে পারে না। শাক্ত মতে সাধন করিতে হয়, 'মুখে মায়ের নাম কর', বৈষ্ণব মতে সাধন করিতে হয় 'মুখে হরির নাম কর', তাহা হইলেই মুক্তি পাইবে। কলিযুগ বড় ধন্য যুগ, এ যুগে সামান্য সাধনাতেই জীব উদ্ধার পায়।" কোন কোন পুরাণ বা তন্ত্রে এইরূপ কথা কোন কোন স্থানে আছে সত্য, কিন্তু ঐ ঐ শাস্ত্রের অন্যান্য স্থানে যে সব কথা আছে তাহার উপরও লক্ষ্য করিতে হয়। উৎসাহবাক্য না বলিলে কাহাকেও কোনও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা যায় না, সেইজন্য সাধনারাজ্যেও উৎসাহবাক্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। "স্থূলে" (অর্থাৎ একান্ত স্থূলবুদ্ধি লোকের পক্ষে) নাম করা ভিন্ন অন্য কোন সাধনা বোধগম্যও হয় না এবং করাও যায় না; প্রবর্ত্তক অবস্থায় মন্ত্রাদির জপ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিতে হয়, এইরূপে স্তরে স্তরে উঠিতে হয়। সুতরাং, যে যে স্তরের লোক, তাহার নিকট সেই স্তরের উপযোগী সাধনার কথাই বলিতে হয়, এবং সেই সাধনারই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিতে হয়, নচেৎ উহাতে তাহার বিশ্বাস বা রুচি হইবে না। শাস্ত্রকারগণ এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্র লিখিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি যে, সকল শ্রেণীর সাধকের জন্য, তাহা নহে। বস্তুতঃ, ত্রিতাপে তাপিত মানব শান্তি চায়, শান্তি পাইতে হইলে শান্তির আধার সেই 'শান্তং শিবং সুন্দরং'কে পাওয়া চাই, অর্থাৎ পরমের সহিত জীবের মিলন চাই,—ইহাই শাস্ত্রে "যোগ" নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং সাধককে এই স্তরে আসিতেই হইবে।

এই অধ্যায়ে যোগ-সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে যে শ্রেণীর সাধকগণ মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইয়া এই রাজগুহ্য যোগ প্রাপ্ত হন তাঁহারা, তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চাদ্বারা অভেদ-ভাবের উপলব্ধি-হেতু জ্ঞানযোগ, আত্মবস্তুতে নিয়ত মন স্থাপনা দ্বারা আত্যন্তিক ভক্তি বা পরা ভক্তি এবং অনাসক্তভাবে প্রারব্ধ কর্ম্মের

অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মযোগ, এই তিনেরই সাধন একসঙ্গে করিতে সক্ষম হন, এবং সেই হেতু অতি শীঘ্র মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

উপসংহারে, আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ যোগের বিষয়টী পরিস্ফুট করা যাইতেছে। পাতঞ্জল দর্শনে "চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধই" যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে (১)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "তুমি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক এবং আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি লাভ হউক বা না হউক, উভয় অবস্থায়ই চিত্তের যে সাম্যভাব তাহার নাম যোগ" (২)। আবার তিনি বলিতেছেন, "জ্ঞানী ব্যক্তি (যিনি বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বদা ব্রহ্মে যুক্ত থাকেন) ইহলোকে থাকিয়াই পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন (পাপ ও পুণ্যের অতীত অবস্থা লাভ করেন)। সুতরাং তুমি যোগ অবলম্বন কর। কর্ম্মের কৌশলকেই যোগ বলে। (কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, যে কৌশল অবলম্বন করিলে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু না হইয়া মুক্তির হেতু হয়, তাহার নাম যোগ) (৩)।"

এক্ষণে যোগের এই ব্যাখ্যা তিনটী একটু বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখা যাউক :—

পাতঞ্জল দর্শন চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধকে যোগ বলেন। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই চারিটীকে অন্তঃকরণ (ভিতরের করণ বা অন্তরিন্দ্রিয়)

---

(১) যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। পাতঞ্জলদর্শনম্।

(২) যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।২।৪৮।

(৩) বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ ঐ ।২।৫০।

বলে। মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প এই দুই বৃত্তি, বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, চিত্তের অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি এবং অহঙ্কারের অভিমানাত্মিকা বৃত্তি। মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ের সংস্পর্শে আসে। তাহাতেই দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি, মৈত্রী, ভক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বিবিধ বৃত্তির উদয় হয়। চিত্তক্ষেত্রে অনবরত নানা বৃত্তির খেলা চলিতেছে। নিরন্তর বায়ু প্রবাহিত হইলে যেমন জলাশয়ে অবিরাম তরঙ্গের উত্থান পতন হইতে থাকে, চিত্তক্ষেত্রেও সেই প্রকার নিয়ত বৃত্তির তরঙ্গ উত্থিত ও পতিত হইতেছে। কাজেই জীবাত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিতেছেন না। মন যতই চঞ্চল হইবে বৃত্তিসকলের খেলাও ততই অধিক চলিবে। প্রতি মুহূর্ত্তে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হওয়াই মনের স্বভাব। সুতরাং, কোন একটী বিষয়ে উহাকে লাগাইয়া রাখিতে না পারিলে, উহার চঞ্চলতা নিবারিত হইবে না, বৃত্তিসকলও নিরুদ্ধ হইবে না। কিন্তু, এই যে একটী বিষয়, তাহা কোন জাগতিক বিষয় হইলে শান্তি লাভ হইবে না, কারণ জাগতিক বিষয়মাত্রেই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ও অল্প-কালস্থায়ী। যাহাতে মনোনিবেশ করিতে হইবে, তাহা যদি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তাহা হইলে মনকেও ঐ বস্তুর অবস্থা হইতে অবস্থান্তরের প্রতি ধাবমান হইতে হইল, সুতরাং সে স্থিরভাব অবলম্বন করিতে পারিল না। ইহাতে শান্তি লাভ হয় না। এজন্য যে বস্তু কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না, যাহা সকল আনন্দের আধার, সকল আনন্দের উৎপত্তিস্থান-স্বরূপ, তাহাতেই মনোনিবেশ করিতে হয়। সেই বস্তু আত্মা বা ব্রহ্ম। তিনি রসস্বরূপ, তিনি সচ্চিদানন্দ; তাঁহাতে মন নিবিষ্ট হইলে, সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। এই হেতু, সাধনার অপরিপক্ক অবস্থায়, বিশেষ যত্নের সহিত মনকে অন্য বিষয় হইতে উপরত করিয়া, সেই আত্মাতেই যুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে মনকে

সংযত করিতে পারিলে, চিত্তের বৃত্তিসকলের যে নিরোধ-ক্রিয়া সাধিত হয় তাহার নাম যোগ, কারণ ইহাতে আত্মা স্বরূপে অবস্থান করেন (১) (অন্য যোগতত্ত্বজ্ঞগণের ভাষায় "জীবের সহিত পরমের মিলন হয়")।

পাতঞ্জল দর্শনের মতে, চিত্তের বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের ন্যায় সমাধি অবস্থা আসে, এবং আত্মা নিজ মহিমায় পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েন। ইহাতে মনে হইতে পারে যে, চিত্তের বৃত্তিসমূহকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে, মানবকে সাংসারিক কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া, সর্ব্বদা আসনবদ্ধ অবস্থায়, নিশ্চল-ভাবে ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ সেরূপ ভাবে সর্ব্বদা থাকিতে পারে না (২)। কর্ম্মের সংস্কার বশতঃই জীব দেহ ধারণ করে; সুতরাং অবশ হইয়া তাহাকে, অল্প হউক, অধিক হউক, সহজ হউক, কঠিন হউক, কর্ম্ম করিতেই হয়। এই প্রাক্তন সংস্কার অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে যাইয়া, জীব, চিত্তের চঞ্চলতা বশতঃ বিবেক-বিহীন হইয়া, নূতন কর্ম্মে জড়িত হইয়া পড়ে, এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগেও দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করে। এই যাতনা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, এবং ভবিষ্যতে আর বদ্ধ হইতে না হয় এই আশায়, সাধনা করিতে হয়। প্রত্যহ যথাসময়ে গুরুদত্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা সমাধিস্থ হইয়া স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং সমাধি-ভঙ্গে অন্য সময়ে এই স্ব-স্বরূপকে মনশ্চক্ষে দর্শন করিতে হইবে। তাহা

---

(১) তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। পাতঞ্জলদর্শনম্।
* ইতরত্র বৃত্তিসারূপ্যম্। ঐ

(২) তালুকুহরে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া খেচরী-মুদ্রার সাহায্যে দীর্ঘ সময় সমাধিতে থাকা যায় সত্য, কিন্তু তাহা এই যোগের বিষয়ীভূত নহে।

হইলে সে সময় হয়, মন স্ব-স্বরূপে মগ্ন থাকায়, প্রারব্ধ-বশতঃ যে সকল কর্ম্ম করা হইবে তাহা অভ্যাসবলে বা প্রকৃতি হইতে সম্পাদন করা হইবে, না হয় সর্ব্বভূতে আত্মসত্তার উপলব্ধি হওয়ায় ঐ সকল কর্ম্মে লীলাময় আত্মারই লীলা দর্শন হইবে ; অতএব কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায়, লাভালাভে, সুখদুঃখে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে বিচলিত হইবার কোনই কারণ থাকিবে না। এ অবস্থায় যে সকল চিত্তবৃত্তি দেখা যাইবে, তাহা যেন গম্ভীর সমুদ্রের উপরিভাগে মৃদুপবনে রচিত ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ-সমূহ ভিন্ন আর কিছু নহে। যেরূপ প্রখর রৌদ্রের সময় অনাবৃত স্থানে চলিতে হইলে, কোন লোক যদি মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া গমন করে, তাহা হইলে সে যেখানেই যাউক না কেন তাহার শরীর ছায়ার মধ্যেই থাকে, তাহাকে রৌদ্রের তাপ ভোগ করিতে হয় না, সেই প্রকার যিনি আত্মাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রাখেন তাঁহাকে, প্রারব্ধ কর্ম্মবশে নানা কার্য্য করিতে হইলেও, সাংসারিক শোক তাপ ব্যাধি প্রভৃতিরূপ রৌদ্রে ক্লেশ দিতে পারে না, তিনি যে অবস্থার মধ্যেই থাকুন না কেন কিছুতেই তাঁহার শান্তির অভাব হয় না। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণ-কথিত যোগের দুইটী সংজ্ঞা সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা চলে। পরমাত্মায় মনের অবিচ্ছিন্ন গতি না থাকিলে, "সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবে অবস্থান করা", অথবা "ইহ জীবনেই সুকৃতি ও দুষ্কৃতি ত্যাগের দ্বারা বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মকে বন্ধন-মোচনের উপায়ে পরিণত করার যে কৌশল" তাহা লাভ করা, সম্ভবপর নহে। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মার প্রতি মনের নিবিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিলে, বাহিরে ইন্দ্রিয়গণের নানা প্রকার কর্ম্ম দেখা গেলেও, সাধক নিজস্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। চিত্তবৃত্তির পূর্ণ নিরোধের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ইহাতেও তাহাই হইল।

একক্ষণে, এই যোগ-সাধনের অনুকূল নিয়মাবলী অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ সমূহ অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে গেলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিতে হয়, "যে ব্যক্তি অতিশয় আহার করেন অথবা একেবারেই ভোজন করেন না, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা যান অথবা একেবারেই নিদ্রা যান না, তাঁহার যোগ-সাধনা হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতরূপে আহার বিহার করেন, কর্ম্মসকলে নিয়মিতরূপ চেষ্টা করেন এবং নিয়মিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখ নিবারক হয় (১)। আহার নিদ্রা প্রভৃতি বৈধ ও সংযতভাবে না হইলে বায়ু, পিত্ত এবং কফের সাম্যাবস্থা থাকে না। এজন্য দেহ-যন্ত্রের বিকার উপস্থিত হয় এবং প্রাণ ও (সেই সঙ্গে সঙ্গে) মন চঞ্চল হইয়া উঠে। উহারা ক্রমে রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সুতরাং যোগের অন্তরায় উপস্থিত হয়। সকলের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা একরূপ নয়, সে নিমিত্ত সকলের জন্য এক সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যায় না। অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিতে হয়। মোটের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যাহাতে চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় বা চিত্তের অবসাদ আসে এরূপ কিছু করা না হয়।

চিত্তের প্রশান্ত এবং একাগ্র ভাব স্থায়ীরূপে আনিতে হইলে, গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা যথানিয়মে করিতে

---

(১) নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৬।১৬-১৭।

হইবে। নির্জ্জন ও নিরুপদ্রব স্থানে, সুখাসনে (১) উপবেশন পূর্ব্বক, এই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। এই ক্রিয়াযোগ অনেকাংশেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত ধ্যানযোগের (২) ন্যায়।

---

(১) যিনি যেরূপ ভাবে বসিলে দীর্ঘ সময় অনায়াসে ধারণা ধ্যান প্রভৃতি স্থিরভাবে করিতে পারিবেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে সুখাসন।

(২) যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভী র্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি"॥

... ...

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই ধ্যানযোগকে অভ্যাসযোগও বলে। আমাদিগকে যাবতীয় কর্ম্মই অভ্যাস করিতে হইয়াছে। কি ব্যবসায়-বাণিজ্য, কি লেখাপড়া, কি কোন শিল্পকার্য্য, যে কিছুই হউক না কেন, অন্যের নিকট উপদেশ লইয়া, পরিশ্রম পূর্ব্বক নিয়মিতভাবে আমাদিগকে তাহা অভ্যাস করিতে হইয়াছে। স্থূল জগতের স্থূল-বিষয়ক যে সকল কর্ম্ম, তাহাও যখন বিনা অভ্যাসে হয় না, তখন আর পারমার্থিক সাধনা বিনা চেষ্টায় ও বিনা অভ্যাসে কি প্রকারে হওয়া সম্ভব ?

এই অধ্যায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সাধন রাজগুহ্য যোগের বিষয় যতদূর সম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং সেই সাধনার আনুকূল্যের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ পূর্ব্ব অধ্যায়সকলে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি ঐ সমুদায় পাঠ করিয়াই সেই সাধনায় সিদ্ধকাম হওয়া যাইতে পারে না। সাধনা করিতে হইলেই উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। সাংসারিক সামান্য সামান্য বিষয় শিক্ষার জন্য (ঐ সকল বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ পুস্তকাদিতে থাকিলেও) যখন কাহারও না কাহারও আশ্রয় লইতে হয়, তখন এই পারমার্থিক শিক্ষায় কোন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হইবে না, ইহা মনে করাই অন্যায়। কঠোপনিষদে যমরাজও নচিকেতাকে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়াছেন (১)। যিনি দেহাত্মবোধ-

---

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৭।১০-১৫ ও ২৪-২৮।

(১) উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

কঠোপনিষৎ। ৩।১৪।

রূপ অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিতে পারেন, এবং যে সচ্চিদানন্দ বস্তু অখণ্ড-চরাচর-বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন তাঁহার অবস্থা যিনি দেখাইয়া দিতে সক্ষম (১), তিনিই সদ্‌গুরু। আবার গুরু-শুশ্রূষা-পরায়ণ, অনুরক্ত, কষ্টসহিষ্ণু ও চিন্তাশীল এবং ভগবদ্বিষয়ে বিদ্বেষবিহীন না হইলে, সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণের অধিকারীই হওয়া যায় না (২), এবং ঐ প্রকার গুণযুক্ত না হইয়া উপদেশ গ্রহণ করিলেও কোন ফল দর্শে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির নিকট প্রণত হইয়া এবং তাঁহাকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া প্রশ্ন করিবে, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ দিবেন (৩)।"

শ্রেষ্ঠ সাধনের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে ভাষায় যতটা প্রকাশ করা সম্ভব, তাহা এই গ্রন্থে করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উহা পাঠে অনেকেরই সাধনা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হওয়ায় সাধনার কার্য্য অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে,

---

(১) অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ গুরুগীতা।

(২) ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৮।৬৭।

(৩) তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৪।৩৪।

এবং সাধনা যে মোক্ষের জন্য একান্তই প্রয়োজন ও মোক্ষ ব্যতীত মানব-জীবন যে বিফল, ইহা বোধগম্য হওয়ায় শ্রেয়ঃ-লাভেচ্ছুক ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সাধনার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদিত হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় খণ্ডে আনুসঙ্গিক অন্যান্য সাধনার বিষয় আমরা আলোচনা করিব।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট।

—:*:—

মায়া অতি আশ্চর্য্য, ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত.................. বিক্ষেপশক্তি দ্বারা তাঁহাকে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় জগদাকারে বিবর্ত্তিত করে। ৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা।

শৃণু মহাদ্ভুতা মায়া সত্ত্বাদিত্রিগুণান্বিতা।
উৎপত্তিরহিতাঽনাদি নৈর্সর্গিক্যপি কথ্যতে॥
অবিদ্যা বস্তুবদ্ভাতি বস্তুসত্তাসমাশ্রিতা।
সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা সাস্তা চ ভাবরূপিণী॥
ব্রহ্মাশ্রয়া চিদ্বিষয়া ব্রহ্মশক্তি র্মহাবলা।
দুর্ঘটোদ্ঘটনাশীলা জ্ঞাননাশ্যা বিমোহিনী॥
শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপকম্।
তমোঽধিকাবৃতিঃ শক্তি র্বিক্ষেপাখ্যা তু রাজসী॥
বিদ্যারূপা শুদ্ধসত্ত্বা মোহিনী মোহনাশিনী।
তমঃপ্রাধান্যতোঽবিদ্যা সাবৃতিশক্তিমত্ত্বতঃ॥
মায়াঽবিদ্যা ন বৈ ভিন্না সমষ্টি-ব্যষ্টি-রূপতঃ।
মায়া বিদ্যা সমষ্টিঃ সা চৈকৈব বহুধা মতা॥
চিদাশ্রয়া চিতি ভাস্যা বিষয়ং তাং করোতি হি।
আবৃত্য চিৎস্বভাবং সদ্বিক্ষেপং জনয়েত্ততঃ॥

শান্তিগীতা।৪।১৭-২৩।

ব্রহ্মের শক্তিই মায়া। ... ... অস্তিত্বই যাহার নাই তাহার আবার নাশ কি? ৫৭ পৃষ্ঠা।

সদ্ব্রহ্মশক্তি র্যা মায়া সাপি নাশ্যা ভবেৎ কথম্।
যদি মিথ্যা হি সা মায়া নাশস্তস্যাঃ কথং বদ॥

শান্তিগীতা।৪।২৪।

ভাবময়ী মায়ার কথা তোমাকে বলিতেছি, শুন। ... ...
যাঁহারা মায়ার স্বভাব জানেন. মায়া তাঁহাদের নিকট থাকিতে চাহে না। ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা।

মায়াখ্যাং ভাবসংযুক্তাং কথয়ামি শৃণুষ মে।
প্রকৃতিং গুণসাম্যাত্তাং মায়াঞ্চাদ্ভুতকারিণীম্॥
প্রধানমাত্মসাৎ কৃত্বা সর্ব্বং তিষ্ঠেদুদাসিনী।
বিদ্যানাম্মা তথাঽবিদ্যা শক্তির্ব্রহ্মাশ্রয়ত্বতঃ॥
বিনা চৈতন্যমন্যত্র নোদেতি ন চ তিষ্ঠতি।
অতএব ব্রহ্মশক্তিরিত্যাহু র্ব্রহ্মবাদিনঃ॥
শক্তিতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ তৎ সমাহিতঃ।
ব্রহ্মণশ্চিজ্জড়ৈর্ভেদাৎ দ্বে শক্তী পরিকীর্ত্তিতে॥
চিচ্ছক্তিঃ স্বরূপং জ্ঞেয়া মায়া জড়া বিকারিণী।
কার্য্যপ্রসাধিনী মায়া নির্ব্বিকারা চিতিঃ পরা॥
অগ্নে র্যথা দ্বয়ী শক্তির্দাহিকা চ প্রকাশিকা।
ন হি ভিন্নাঽথবাঽভিন্না দাহশক্তিশ্চ পাবকাৎ॥
ন জ্ঞায়তে কথং কুত্র বিদ্যতে দাহতঃ পুরা।
কার্য্যানুমেয়া সা জ্ঞেয়া দাহেনানুমিতির্যতঃ॥
মণিমন্ত্রাদি-যোগেন রুধ্যতে ন প্রকাশতে।
সা শক্তিরনলাদ্ভিন্না রোধনান্ন হি তিষ্ঠতি॥
নোদেতি পাবকাদ্ভিন্নং ততোঽভিন্নেতি মন্যতে।
নানলে বর্ত্ততে সা চ ন কার্য্যে স্ফোটকে তথা॥
অনির্ব্বাচ্যাদ্ভুতা চৈব মায়াশক্তিস্তথেষ্যতাম্।
যা শক্তির্নানলাদ্ভিন্না তাং বিনাগ্নি র্ন কিঞ্চন॥
অনলস্বরূপা জ্ঞেয়া শক্তিঃ প্রকাশরূপিণী।
চিচ্ছক্তি র্ব্রহ্মণস্তদ্বৎ স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥

দাহিকা সদৃশী মায়া জড়া নাশ্যা বিকারিণী।
মৃষাত্মিকা তু যাঽবস্তু তন্নাশস্তত্ত্বদৃষ্টিতঃ॥
মিথ্যেতি নিশ্চয়াৎ পার্থ মিথ্যাবস্তু বিনশ্যতি।
আশ্চর্য্যরূপিণী মায়া স্বনাশেন হি হর্ষদা॥
অজ্ঞানাং মোহিনী মায়া প্রেক্ষণেন বিনশ্যতি।
মায়া স্বভাববিজ্ঞানাং সান্নিধ্যং ন হি বাঞ্ছতি॥

শান্তিগীতা।৪।২৫-৩৮।

মায়া অবস্তু ও মিথ্যারূপিণী ... ... মায়ার কার্য্য-বিস্তারও আমার নিকট সেইরূপ বলিয়া মনে হয়। ৬০ পৃষ্ঠা।

মায়াঽবস্তু মৃষারূপা কার্য্যং তস্যা ন সম্ভবেৎ।
বন্ধ্যাপুত্রো রণে দক্ষো জয়ী যুদ্ধে তথা ন কিম্॥
ব্যোমারবিন্দবাসেন যথা বাসঃ সুবাসিতম্।
মায়ায়াঃ কার্য্যবিস্তারস্তথা যাদব মে মতিঃ॥

শান্তিগীতা।৫।১-২।

হে ভারত, মিথ্যা বস্তুর নানা প্রকার কার্য্য দেখা যায়। . . .. তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মায়া ও মায়ার কার্য্যও সেইরূপ প্রকাশ পায় না। ৬০ পৃষ্ঠা।

দৃশ্যতে কার্য্যবাহুল্যং মিথ্যারূপস্য ভারত।
অসত্যো ভুজগো রজ্জ্বাং জনয়েদ্ বেপথুং ভয়ম্॥
উৎপাদয়েদ্ রূপ্যখণ্ডং শুক্তৌ চ লোভমোহনম্।
স্মর্য্যতে হি মৃষা মায়া ব্যবহারাস্পদং জগৎ॥
তত্ত্বজ্ঞস্য মৃষা মায়া পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ।
মৃষা মায়া চ তৎকার্য্যং মৃষা জীবঃ প্রপশ্যতি॥
সর্ব্বং তৎ স্বপ্নবস্তানং চৈতন্যেন বিভাস্যতে।
অজ্ঞঃ সত্যং বিজানাতি তৎকার্য্যেণ বিমোহিতঃ॥

প্রবুদ্ধতত্ত্বস্ত তু পূর্ণবোধে
ন সত্যমায়া ন চ কার্য্যমস্তাঃ।
তমস্তমঃকার্য্যমসত্যসর্ব্বং
ন দৃশ্যতে ভানুমহাপ্রকাশে॥ শান্তিগীতা।৫।৩-৭।

শ্রুতিতে দেখা যায় ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ... ... জগৎ কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল, তাহা আমাকে বলুন। ৬১ পৃষ্ঠা।

নির্গুণং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং বিনিষ্ক্রিয়ম্।
জগৎসৃষ্টিঃ কথং তস্মাদ্ভবতি তদ্বদস্ব মে॥ শান্তিগীতা।৭।৮।

সৃষ্টি নাই, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বরও নাই ... ... মায়া ও মায়ার কার্য্য সেইরূপ অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মকে স্পর্শ বা মলিন করিতে পারে না। ৬১-৬৫ পৃষ্ঠা।

সৃষ্টির্নাস্তি জগন্নাস্তি জীবো নাস্তি তথেশ্বরঃ।
মায়য়া দৃশ্যতে সর্ব্বং ভাস্যতে ব্রহ্মসত্তয়া॥
যথা স্তিমিতগম্ভীরে জলরাশৌ মহার্ণবে।
সমীরণবশাদ্বীচি র্ন বস্তু সলিলেতরৎ॥
তথা হি পূর্ণচৈতন্যে মায়ায়া দৃশ্যতে জগৎ।
ন তরঙ্গো জলাদ্ভিন্নো ব্রহ্মণোঽন্যজ্জগন্ন হি॥
চৈতন্যং বিশ্বরূপেণ ভাসতে মায়য়া তথা।
কিঞ্চিদ্ভবতি ন সত্যং স্বপ্নকর্ম্মেব নিদ্রয়া॥
যাবন্নিদ্রা ঋতং তাবৎ তথাঽজ্ঞানাদিদং জগৎ।
ন মায়া কুরুতে কিঞ্চিন্মায়াবী ন করোত্যণু।
ইন্দ্রজালসমং সর্ব্বং বদ্ধদৃষ্টিঃ প্রপশ্যতি॥
অজ্ঞান-জন-বোধার্থং বাহ্যদৃষ্ট্যা শ্রুতীরিতম্।
বালানাং প্রীতয়ে যদ্বদ্ধাত্রী জল্পতি কল্পিতম্।
তৎপ্রকারং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কুন্তিনন্দন॥

চৈতন্যে বিমলে পূর্ণে কস্মিন্ দেশেঽণুমাত্রকম্॥
অজ্ঞানমুদিতং সত্তাং চৈতন্যস্ফূর্ত্তিমাশ্রিতম্॥
তদজ্ঞানং পরিণতং স্বস্যৈব শক্তিভেদতঃ।
মায়ারূপা ভবেদেকা চাবিদ্যারূপিণীতরা॥
সত্ত্বপ্রধানমায়ায়াং চিদাভাসো বিভাসিতঃ।
চিদধ্যাসাচ্চিদাভাস ঈশ্বরোঽভূৎ স্বমায়য়া॥
মায়াবৃত্ত্যা ভবেদীশঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিমান্।
ইচ্ছাদিসর্ব্বকর্ত্তৃত্বং মায়াবৃত্ত্যা তথেশ্বরে॥
ততঃ সঙ্কল্পবানীশস্তদ্‌বৃত্ত্যা স্বেচ্ছয়া স্বতঃ।
বহুঃ স্যামহমেবৈকঃ সঙ্কল্পোঽস্য সমুত্থিতঃ॥
মায়ায়া উদ্গতঃ কালো মহাকাল ইতি স্মৃতঃ।
কালশক্তি র্মহাকালী চাস্যা সত্ত্বসমুদ্ভবাৎ॥
কালেন জায়তে সর্ব্বং কালে চ পরিতিষ্ঠতি।
কালে বিলয়মাপ্নোতি সর্ব্বে কালবশানুগাঃ॥
সর্ব্বব্যাপী মহাকালো নিরাকারো নিরাময়ঃ।
উপাধিযোগতঃ কালো নানাভাবেন ভাসতে॥
নিমেষাদির্যুগঃ কল্পঃ সর্ব্বং তস্মিন্ প্রকল্পিতম্।
কালতোঽভূন্মহত্তত্ত্বং মহত্তত্ত্বাদহঙ্কৃতিঃ॥
ত্রিবিধঃ সোঽপ্যহঙ্কারঃ সত্ত্বাদিগুণভেদতঃ।
অহঙ্কারাদ্ভবেৎ সূক্ষ্মতন্মাত্রাণ্যপি পঞ্চ বৈ॥
সূক্ষ্মাণি পঞ্চভূতানি স্থূলানি ব্যাকৃতানি তু।
সত্ত্বাংশাৎ সূক্ষ্মভূতানাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
অন্তঃকরণমেকং তৎ সমষ্টিগুণসত্ত্বতঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি রজসঃ প্রত্যেকং ভূতপঞ্চকাৎ।
পঞ্চবৃত্তিময়ঃ প্রাণঃ সমষ্টিপঞ্চরাজসৈঃ॥

পঞ্চকৃতং তামসাংশং তৎপঞ্চস্থূলতাং গতম্।
স্থূলভূতাৎ স্থূলসৃষ্টির্ব্রহ্মাণ্ডশরীররাদিকম্॥
মায়োপাধির্ভবেদীশশ্চাবিদ্যা জীবকারণম্।
শুদ্ধসত্ত্বাধিকা মায়া চাবিদ্যা সা তমোময়ী॥
মলিনসত্ত্বপ্রধানা হ্যবিদ্যাবরণাত্মিকা।
চিদাভাসস্তত্র জীবঃ সল্লজ্ঞশ্চাপি তদ্বশঃ।
চৈতন্যে কল্পিতং সর্ব্বং বুদ্‌বুদ ইব বারিণি॥
তৈলবিন্দু র্যথা ক্ষিপ্তঃ পতিতঃ সরসীজলে।
নানারূপেণ বিস্তীর্ণো ভবেত্তন্ন জলং তথা॥
অনন্ত-পূর্ণ-চৈতন্যে মহামায়া বিজৃম্ভিতা।
কস্মিন্ দেশে চাণুমাত্রং বিস্তৃতা নামরূপতঃ॥
ন মায়াতিশয়ং কর্ত্তুং ব্রহ্মণি কশ্চিদর্হতি।
চৈতন্যং স্ববলেনৈব নানাকারং প্রদর্শয়েৎ॥
বিবর্ত্তং স্বপ্নবৎ সর্ব্বমধিষ্ঠানে তু নির্ম্মলে।
আকাশে ধূমবন্মায়া তৎকার্য্যমপি বিস্তৃতম্।
সঙ্গঃ স্পর্শস্ততো নাস্তি নাম্বরং মলিনং ততঃ॥

শান্তিগীতা।৭।৯-৩৩।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

—:#:—

ব্রহ্মচর্য্য।

প্রথম খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে রাগমার্গের সাধনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বেদান্ত বা উপনিষদ্ বিহিত সাধনাই রাগমার্গের সাধন (১)। মানব যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তখন ভগবৎ-স্বরূপেই তাহার চিত্ত ধাবমান হয়। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।

সর্ব্বত্র হয় তা'র ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)। এই অবস্থায় বিধিমার্গের সমুদায় স্থূল ও একদেশী কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার বা অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যকতা বা সময় সাধকের থাকে না। সেরূপ করিতে গেলে, তাঁহার বিশ্বব্যাপী বিশাল ভাবকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিয়া, তাঁহাকে মিথ্যাচার করিতে হয়। তিনি বিধিমার্গের দাস হইয়া না থাকিলেও, এ কথা যেন কেহ মনে করেন

---

(১) উপনিষদে ভয়ের ধর্ম্ম বা লোভের ধর্ম্মের নাম গন্ধ নাই, আছে কেবল সাধনা দ্বারা অমৃতত্ব লাভের কথা,—অমৃতের সন্তান আবার কি প্রকারে নষ্টগৌরব লাভ করিয়া সচ্চিদানন্দ হইতে পারে, তাহারই কথা।

না যে, তিনি স্বাধীন ইচ্ছায় নানাবিধ অনাচার বা পাপকার্য্যও করেন বা করিতে পারেন। তাঁহার চিত্ত সেরূপ নিকৃষ্ট পথে যাইতেই পারে না (১)। সর্ব্বত্র ঈশ্বর-সত্তার অনুভব হেতু, তিনি ব্যবহারিক-ভাবেও যে সব কর্ম্ম করেন তাহা শিষ্টাচার-সম্মতই হয়, কদাচিৎ কখনও তাঁহার কোনও কাজ হয় ত প্রথমদৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া বোধ হইতে পারে। তিনি কর্ম্মের মূল সূত্র দৃঢ়রূপে

---

(১) রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তা'রে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥
... ...
বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে নহে তা'র মন॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত॥
বিধিভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥
রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তা'র অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। মধ্যলীলা। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধরিয়া বসিয়া আছেন, সুতরাং তাঁহার পদস্খলনের সম্ভাবনা খুবই কম। এই হইল রাগমার্গের উন্নত স্তরের সাধকের কথা। তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য কর্ম্মযোগ উপাসনাদি বিষয়ে উপদেশের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। তাই বলিয়া, রাগমার্গে পদার্পণ করা মাত্রই এই উচ্চ অবস্থা কাহারও আসে না। সুতরাং, রাগমার্গের প্রাথমিক সাধকদিগের প্রধানতঃ যে সকল বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকিলে পদস্খলনের সম্ভাবনা, তাহাই দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে। রাগমার্গের সাধককে ক্রমশঃই গভীর হইতে গভীরতর ভাবে ডুবিতে হইবে, শাস্ত্রের বিধিনিষেধসমূহের অন্তর্নিহিত ভাবগুলিকে (Spirit) সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া নিজ গন্তব্য পথে বীরদর্পে অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত হইবে, এবং কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতার জন্য হয় ত বহু সাধনার ফল মুহূর্ত্তমধ্যে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। রাগমার্গের প্রাথমিক সাধকদিগের যেমন এই সব রহস্য জানা প্রয়োজন, বিধিমার্গের সাধকগণেরও তেমনি ধীরে ধীরে এই সব বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক, কারণ এগুলি জানিলে তাঁহারাও নিজেদের অনুষ্ঠিত ও অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের রহস্য বুঝিয়া শীঘ্র সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। বর্ত্তমান্ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় আলোচিত হইবে।

শুধু কঠোরতা করিলেই তপস্যা হয় না। "ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আচরিত না হইলে কোন তপস্যাই ফলদায়ক হয় না। ব্রহ্মচর্য্যই উৎকৃষ্টতম তপস্যা (১)।

"ব্রহ্মচর্য্য" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "যে কার্য্য দ্বারা ব্রহ্মে বিচরণ

---

(১) ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥
জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্।

করা যায় অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা বা ভগবানের সত্তায় অবস্থিতি করা যায়"। সুতরাং, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত করিয়া, চিত্তকে একান্তভাবে চৈতন্য-সত্তায় সংযোজিত করাই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃতপক্ষে যোগেরই নামান্তর মাত্র। তথাপি সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্য বলিতে বিন্দুধারণ বুঝায় (১)। পণ্ডিতগণ অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জনকে ব্রহ্মচর্য্য বলেন (২)। অষ্ট প্রকার মৈথুন, যথা,—রসপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের বিষয় শ্রবণ ও কীর্ত্তন, তাহার সহিত ক্রীড়া, তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ, তাহার সহিত গোপনে আলাপ, স্ত্রীলোকে উপগত হইবার জন্য সঙ্কল্প, সেজন্য চেষ্টা ও তাহাতে উপগত হওয়া। এই অষ্ট প্রকার মৈথুন-বর্জ্জনই অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্যপাত না হউক, কামভাবে স্ত্রীলোকের বিষয় শ্রবণ কীর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারাও বিন্দু স্বস্থান হইতে স্খলিত হয়, সুতরাং প্রকৃতভাবে বিন্দু ধারণ করা হয় না, অতএব ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না জানিতে হইবে। বিন্দু-ধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলার একটা বিশেষ কারণ আছে। আমরা যাহা কিছু আহার করি, তাহার সার অংশ হইতে ক্রমে রস রক্ত মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র গঠিত হয়। শুক্র হইতে ওজঃ-ধাতু উৎপন্ন হয়। এই শুক্রই জীবনী শক্তি। শুক্র বা বিন্দুর ক্ষয়ে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের নাশ হয়; সুতরাং সে অবস্থায় যতই চেষ্টা করা যাউক না কেন, চিত্ত স্থির ভাব অবলম্বন করিতে পারে না, এবং সূক্ষ্ম চৈতন্য-সত্তায় দীর্ঘ সময় ধরিয়া মনোনিবেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে, অতএব ব্রহ্ম-

---

(১) "বীর্য্য-ধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।"

(২) "শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্ব্বৃত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্য মেতদষ্টাঙ্গলক্ষণম্"॥

সত্তার অনুভব হইতে পারে না। শুক্রনাশ হেতু মানবের দেহ ও মন অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে (১)। অযথা শুক্রব্যয় মানবের অধঃপতনের পক্ষে প্রশস্ত রাজপথ স্বরূপ। এই কারণেই বীর্য্যধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হইয়াছে। বীর্য্যধারণ পূর্ব্বক, সদ্‌গুরুর উপদেশে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে স্ববশে আনিয়া, ব্রহ্মধ্যানে মনোনিবেশই ব্রহ্মচর্য্য। ইহা না করিয়া, শুধু বীর্য্য ধারণ করিলে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য হয় না।

দেব-কার্য্যের জন্য সংযম ও উপবাস করিবার নিয়ম আছে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, সংযম বলিতে দিবসে একবার হবিষ্যান্ন আহার করা আর উপবাস অর্থে কিছু আহার না করিয়া থাকা, ইহাই লোকে বুঝিয়া থাকে ও করিয়া থাকে। সংযম ও উপবাস কি বাস্তবিক তাহাই? সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে ভগবৎসত্তা অনুভব করা যায় না। তাই, পূর্ব্বে সংযম অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে বশে আনয়ন এবং পরে উপবাস (উপ+বস+ঘঞ্) অর্থাৎ ভগবানের নিকটে বাস। পূর্ব্বদিন একবার পবিত্র হবিষ্যান্ন আহারে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকলকে সংযত করিবার ও অন্তর্মুখীন করিবার সুবিধা হয়, তৎপরদিন আহারাদি না করায় খাদ্য-সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি করা বা মল-মূত্রাদি ত্যাগের তত আবশ্যকতা থাকে না, তজ্জন্য প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যানকার্য্যে বিশেষ সুবিধা হয়, সুতরাং মনটী একমুখীন হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে লাগিয়া থাকার সুযোগ পায়, এই জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থাকে উপবাস বলা হয়। নচেৎ এক দিবস শুধু হবিষ্যান্ন আহার করিয়া, তাহার পর দিবস অনাহারে থাকিলেই যে, দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, এরূপ হইতে

(১) মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নতঃ কুরুতে বিন্দুধারণম্॥ শিবসংহিতা।

পারে না। সেইরূপ বিন্দুধারণে চিত্তের বল বাড়ে (১) ও ধ্যানে সামর্থ্য জন্মে বলিয়া বিন্দুধারণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। নচেৎ, ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা না করিলে এবং সাধনায় নিযুক্ত না হইলে, শুধু বিন্দুধারণ দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না।

এই বিন্দুধারণের সহায়তার জন্য বিলাসিতা-বর্জ্জন এবং স্ত্রীচিন্তনাদি পরিত্যাগের ব্যবস্থা আছে। ঐ সকল নিষিদ্ধ বিষয় স্বভাবতঃই চিত্তের চঞ্চলতা জন্মাইয়া থাকে। চিত্ত স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহার উপর যদি তাহাকে চাঞ্চল্য-বৃদ্ধির উপাদানের সংসর্গে থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহার স্থিরতা-সাধন একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য সাধন-অবস্থায় যতদূর সম্ভব ঐ সকল বিষয় হইতে দূরে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু দূরে থাকিলে কি হইবে? যদি এ জীবনে কেহ একবার বিলাসিতা স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতির রস আস্বাদন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার মন ঐ গুলি ভোগ করিতে না পারিলেও, উহাদের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে। আর যদি এমন হয় যে, বাল্যকাল হইতেই বা কেহ কেহ ঐ সমুদায় হইতে দূরে থাকিলেন, তথাপি ইহা অসম্ভব নয় যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারবশতঃ কৈশোর বা যৌবন সময়ে মন আপনা আপনি ইন্দ্রিয়-সুখাদির জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে। এমত অবস্থায়, ঐ বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, সকল আনন্দের আধার পরমাত্মতত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে ধরিতে হইবে। 'এ জগতের যত সুখ, যত সৌন্দর্য্য, সবই সেই ভগবান্ হইতে আসিয়াছে। তিনি সকল সুখের ও সকল সৌন্দর্য্যের আধার। তাঁহাকে লাভ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহার সীমা নাই; তাঁহাকে অনুভব করায় যে সুখ হয়, তাহার এক কণার সহিত এই জগতের সমস্ত সুখের

(১) ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। পাতঞ্জলদর্শনম্।

তুলনা হইতে পারে না (১)।' এই মহাসত্য তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর-ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে, এই পরমানন্দের লোভে তাঁহাদের মন বিভোর হইয়া অন্য বিষয়-রস বা ইন্দ্রিয়-সুখের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না, সেই পরমানন্দের অন্বেষণেই নিযুক্ত হইবে, এবং ক্রমে যতই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উহা অনুভব করিবে ততই সেই লক্ষ্যের দিকে অধিক বেগে অগ্রসর হইতে থাকিবে। এই লক্ষ্য বা প্রাপ্তব্য বস্তুর সন্ধান সাধককে দিতে হইবে, ইহাই গুরুর কার্য্য।

কিন্তু, এই আদর্শ সম্মুখে ধরিয়াও, যদি সাধকদিগকে সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে, বিশেষতঃ প্রথম অবস্থায়, প্রলোভন-সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে শতকরা নিরানব্বই জনেরই অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকিবে। আদর্শ সম্মুখে ধরা মাত্রই সাধক তাহার সম্যক্ মাধুর্য্য ধারণা করিতে কখন সক্ষম হয় না। শুদ্ধ মন ও বুদ্ধির গোচর যে সূক্ষ্ম ও স্থায়ী পরমানন্দ, তাহা ধারণা করা অপেক্ষা স্থূলইন্দ্রিয়-সুখের ধারণা করা কোটিগুণে সহজ। সুতরাং সাধক যে, সেই পরম-সুখ-স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষণিক এবং উপস্থিত সুখে মজিয়া ও ডুবিয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সেই নিমিত্ত, সিদ্ধিলাভ না করা পর্য্যন্ত বিলাসিতা ও স্ত্রীসঙ্গ হইতে দূরে থাকা আবশ্যক, নচেৎ বীর্য্যরক্ষা হইবে না; এবং

---

(১) বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।২।৫৯

সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনু-শশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপ-জীবন্তি। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৪।৩।৩২।

বীর্য্যরক্ষা না হইলে, পারদবিহীন দর্পণে মুখ দেখার চেষ্টার ন্যায় সাধকের ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে। সিদ্ধিলাভের পর, মন ভগবৎস্বরূপে ডুবিয়া থাকে বলিয়া, এ সকলের সংস্পর্শে আসিতে হইলে তেমন কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না, বরং দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়াতে, সিদ্ধ পুরুষ ঐ সকলের মধ্যে ভগবানের অন্য প্রকার লীলা দর্শন করেন, কিন্তু নিজে লিপ্ত হন না।

বিবাহিত গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য কি ভাবে রক্ষিত হইতে পারে, এ স্থলে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক পুত্র পিণ্ড দান করিয়া পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণের উর্দ্ধগতির সহায়তা ও তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করেন। এই প্রকার কুলপাবন পুত্রলাভের জন্যই শাস্ত্রে বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে (১)। সুতরাং, যাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন, সেই বিবাহিত পুরুষগণের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে ভগবান্ মনু এইরূপ লিখিয়াছেন :—"স্বদারনিরত ব্যক্তি ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে। ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়েও ভার্য্যার তৃপ্তিসাধনের জন্য তাহাতে উপগত হইতে পারে, কিন্তু কি ঋতুকালে, কি অন্য সময়ে, অমাবস্যাদি পর্ব্বদিনে স্ত্রীগমন করিবে না। স্ত্রীদিগের ঋতুকাল স্বভাবতঃ ষোড়শ অহোরাত্র জানিবে, তন্মধ্যে শোণিতদর্শন হইতে প্রথম চারি অহোরাত্র শিষ্টগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত। এই ষোড়শ অহোরাত্রের মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি—এই ছয় রাত্রি স্ত্রীগমনে নিষিদ্ধ, অবশিষ্ট দশ রাত্রি প্রশস্ত। এই দশ রাত্রির মধ্যে ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ রাত্রিতে স্ত্রীসঙ্গমে যদি গর্ভ হয় তবে পুত্র জন্মে, আর পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও পঞ্চদশ রাত্রিতে স্ত্রীসহবাসে গর্ভ হইলে কন্যা জন্মে, এজন্য পুত্রার্থী ব্যক্তি ষষ্ঠ অষ্টমাদি যুগ্ম রাত্রিতেই

---

(১) "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যাং পুত্রপিণ্ডং প্রয়োজনম্॥"

স্ত্রীগমন করিবে। অযুগ্ম রাত্রি হইলেও যদি পুরুষের বীর্য্যাধিক্য হয় তবে পুত্রসন্তান জন্মে, এবং যুগ্ম রাত্রি হইলেও স্ত্রীর রজঃ-আধিক্য হইলে কন্যাসন্তান জন্মে; স্ত্রীরজঃ ও পুরুষের বীর্য্য সমান হইলে ক্লীব অথবা যমজ পুত্র-কন্যা হয়, আর ঐ দুই জিনিস যদি অসার বা অল্প হয় তবে গর্ভ হয় না। ঐ নিন্দিত ছয় রাত্রি এবং অবশিষ্ট অনিন্দিত দশ রাত্রির মধ্যে যে কোন আট রাত্রি বাদ দিয়া, অর্থাৎ ষোল রাত্রির মধ্যে এই চৌদ্দ রাত্রি বাদ দিয়া, যে দুই রাত্রি থাকে তাহাতে যদি অমাবস্যাদি পর্ব্বদিন না পড়ে, তবে সেই দুই রাত্রিতে যে ব্যক্তি স্ত্রীসহবাস করিবেন তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলা যাইবে, তা' তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন (১)।" বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষকেও এতটা নিয়মের মধ্যে থাকিয়া সংযত হইয়া চলিতে হইবে।

অনেক লোককে বলিতে শোনা যায় যে, গুরুদত্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির প্রতি

---

(১) ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীনাং রাত্রয়ঃ ষোড়শঃ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥
তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ॥
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্ যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্ত্তবে স্ত্রিয়ম্॥
পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়ঃ।
সমেঽপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেঽল্পে চ বিপর্য্যয়ঃ॥
নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥

মনুসংহিতা।৩।৪৬-৫০।

দৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইহা সব অবস্থায় ঠিক নহে। যে সকল লোক, সংসারের সুখে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ হইয়া, কেবল ভগবান্‌কে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের শুধু গুরূপদিষ্ট ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেই কাজ হইতে পারে, কারণ তাঁহাদিগের মন ত অন্তর্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ভোগসুখের লালসা তাঁহাদের হৃদয়ে উদিতই হয় না। কিন্তু, এ কথা তত্ত্বজ্ঞানহীন প্রবর্ত্তকের পক্ষে খাটে না, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি পালন করিতেই হইবে। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে সাধনারাজ্যে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদিগেরও মাদক-সেবন, উগ্রবীর্য্য ও রজোগুণ-বৃদ্ধিকর খাদ্য গ্রহণ, স্ত্রী-চিন্তন ও বিলাসিতা হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। সংসারী লোকদিগের মধ্যে অনেককে এরূপ অবস্থার মধ্যে থাকিতে হয় যে, তাহাদের নিজের ঐ সমস্ত দোষ না থাকিলেও তাহাদিগের সঙ্গীদিগের অধিকাংশই অল্প বিস্তর ঐ সব দোষে দূষিত। এরূপ স্থলে, তাহাদিগকে বাহিরে সেই সব লোকের সঙ্গে কার্য্যোপলক্ষে ব্যবহার করিতে হইলেও, মনে মনে আপনাদিগকে পৃথক্ রাখিতে হইবে, নচেৎ হয় ত অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে অধঃপতিত হইতে হইবে। সাধককে নিজের আরাধ্য বস্তুতে মন-প্রাণ লাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ঐ সব বিষয়েও যথাসাধ্য সাবধান থাকিতে হইবে। ইহা না করিলে জীবনী শক্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে, এবং সিদ্ধি-লাভের কল্পনা বাতুলের প্রলাপে পরিণত হইবে। আত্ম-কল্যাণের পথ অতীব দুর্গম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:*:—

কর্ম্ম-রহস্য।

দেহ ও মন সবল ও প্রফুল্ল রাখিবার জন্য, এবং চরম কল্যাণময় বস্তুতে লক্ষ্য স্থির রাখিতে সামর্থ্য লাভ করিবার উপায়-স্বরূপে, ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বাধ্যায়ে আলোচনা করা গিয়াছে। এক্ষণে, কিরূপভাবে চলিলে মানব কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হয় না, তাহা বিবৃত হইতেছে।

যতদিন মানব জীবিত থাকিবে, ততদিন কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব (১)। শরীর নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়, মন ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে। সুষুপ্তি-সময়ে মন নিশ্চলভাব ধারণ করে, মনের কোন ক্রিয়া থাকে না সত্য, কিন্তু দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে, শোণিত-সঞ্চালন হইতে থাকে, এ সকল কর্ম্ম বন্ধ হয় না। সুতরাং কর্ম্ম নিঃশেষরূপে ত্যাগ করা জীবিত মনুষ্যের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

কর্ম্মই বন্ধনের কারণ। কর্ম্মফলেই জীবের উচ্চ বা নীচ যোনিতে জন্ম হয়, কর্ম্মফলেই জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের অধীন হইতে হয়। কতকগুলি কর্ম্ম মোক্ষের গৌণ উপায় স্বরূপ হইলেও কর্ম্মত্যাগ না হইলে মুক্তি নাই, ইহাই জ্ঞানিগণের মীমাংসা। অতএব কর্ম্ম-সম্বন্ধে সকল মনুষ্যেরই একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা, অর্থাৎ যাহাতে কর্ম্মত্যাগ হয় অথবা কর্ম্ম যাহাতে বন্ধনের কারণ না হয় তাহা জানা থাকা, এবং তদনুসারে চলা, আবশ্যক।

---

(১) ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৮।১১।

শাস্ত্রে কর্ম্ম পঞ্চবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, স্বাভাবিক ও নিষিদ্ধ। বেদে যে সকল কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এবং যাহা না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহাই নিত্য কর্ম্ম। কোন নিমিত্ত উপলক্ষ করিয়া যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সে গুলিকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা হয়, যেমন—পুত্রের জন্মাদি উপলক্ষে জাতেষ্টি ও অন্নপ্রাশন, বিবাহাদি উপলক্ষে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, মৃত পিতা মাতা বা বন্ধুগণের শ্রাদ্ধ, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে দান এবং তর্পণাদি কর্ম্ম ইত্যাদি। স্বর্গসুখ সম্ভোগের বাসনায় এবং ইহলোকে সুখসমৃদ্ধি কুশল জয় ইত্যাদি লাভের কামনায় যে সকল কর্ম্ম করা যায়, সেইগুলিকে কাম্য কর্ম্ম বলে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস, শিরা-ধমনী প্রভৃতিতে রক্ত-সঞ্চালন, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ইত্যাদি দৈহিক কার্য্যসকলই জীবের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ইহা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যপূর্ব্বক করা হয় না বলিয়া, এই স্বাভাবিক কর্ম্ম সম্বন্ধে বেদ ঔদাসিন্য অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ জীবের বন্ধন বা মুক্তির সহিত এই সকল কর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আছে এরূপ বলেন নাই। যে সকল কর্ম্ম করিতে বেদ নিষেধ করিয়াছেন সেইগুলিই নিষিদ্ধ কর্ম্ম (১), অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম দ্বারা নিজের বা পরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন অনিষ্ট হইতে পারে সেইগুলিই নিষিদ্ধ কর্ম্ম।

---

(১) নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্বাভাব্যঞ্চ নিষেধিতম্।
এতৎ পঞ্চবিধং কর্ম্ম বিশেষং শৃণু কথ্যতে॥
কর্ত্তুং বিধানং যদ্বেদে নিত্যাদি বিহিতং মতম্।
নিবারয়তি যদ্বেদস্তন্নিষিদ্ধং পরন্তপ।
বেদঃ স্বাভাবিকে সর্ব্ব ঔদাসীন্যাবলম্বিতঃ॥
প্রত্যবায়ো ভবেদ্ যস্যাঽকরণে নিত্যমেব তৎ॥

কোন কোন পণ্ডিত বলেন নিত্যকর্ম্মে কোন ফলোদয় হয় না, কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ নিষ্ফল কর্ম্ম কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। ফলে আশা না থাকিলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসিতে পারে না, এবং প্রবৃত্তি না হইলে কর্ম্মের অনুষ্ঠানও সম্ভব হয় না। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত-শুদ্ধি হয় এবং উহা না করিলে প্রত্যবায় হয়,—মন মলিন হইতে মলিনতর হওয়ায় মানব ক্রমশঃ অধঃপতিত হয়। নিত্যকর্ম্ম না করিলে যখন অশুভ ফল উৎপন্ন হয়, তখন উহা করিলে অশুভের বিপরীত অর্থাৎ শুভফল অবশ্যই হইবে,—কোন ফল হইবে না, ইহা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না (১)। নিত্য কর্ম্মের দ্বারা যেমন চিত্ত শুদ্ধ হয়, নৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারাও সেইরূপ

... ...

নৈমিত্তিকং নিমিত্তেন কর্ত্তব্যং বিহিতং সদা।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে দানং শ্রাদ্ধাদি তর্পণং তথা ॥
কাম্যং তৎ কামনাযুক্তং স্বর্গাদিসুখসাধনম্।
ধনাগমশ্চ কুশলং সমৃদ্ধি র্জয় ঐহিকে ॥

শান্তিগীতা।৫।২০-২২ ও ২৬-২৭।

(১) প্রত্যবায়ো ভবেদ্ যস্মাৎকরণে নিত্যমেব তৎ।
ফলং নাস্তীতি নিত্যস্য কেচিদ্বদন্তি পণ্ডিতাঃ ॥
ন সৎ তদ্ যুক্তিতঃ পার্থ কর্ত্তব্যং নিষ্ফলং কথম্।
ন প্রবৃত্তিঃ ফলাভাবে তাং বিনাচরণং ন হি ॥
নিত্যেনৈব দেবলোকস্তথৈব বুদ্ধিশোধনম্।
ফলমকরণে পাপং প্রত্যবায়াচ্চ দৃশ্যতে ॥
প্রত্যবায়ঃ ফলং পাপং ফলাভাবে ন সম্ভবেৎ।
নাভাবাদ্ জায়তে ভাবঃ ফলাভাবো ন সম্মতঃ ॥ ঐ ৫।২২-২৫।

হৃদয়ের নির্ম্মলতা সাধিত হয়। নিতান্ত মূঢ় এবং অজ্ঞান লোকেরই দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ, দেহাদির সুখ-লালসায়, নিষিদ্ধ কর্ম্মে মতি জন্মে। নিষিদ্ধ কর্ম্ম অত্যন্ত অকল্যাণকর, উহাতে ক্রমশঃই জীবের অধঃপতন হইতে থাকে। সুতরাং উহা বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। কাম্য কর্ম্মও দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃই লোকে করিয়া থাকে। কাম্য কর্ম্মও হেয় এবং বর্জ্জনীয়, তবে অধিকারিবিশেষের পক্ষে উহা উপকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কামনা সিদ্ধ হয়, এই প্রলোভন দেখাইয়া, যাহারা বহির্ম্মুখীন (বিষয়াসক্ত), কল্যাণকর বিহিত কর্ম্ম হইতে বিমুখ, দুরাচার এবং দুর্ব্বৃত্ত, তাহাদের কুপ্রবৃত্তি নাশ করা ও সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করাই কাম্য-কর্ম্ম-বিধানের উদ্দেশ্য। যাহারা কাম্য কর্ম্ম করে, তাহাদের লক্ষীকৃত অবান্তর ফলভোগের পর চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ ফলের লোভে বহুজন্ম সৎকর্ম্ম করিতে করিতে তাহাদের সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠে। ঈশ্বর-আরাধনারূপ দুগ্ধ কামনারূপ জলে মিশ্রিত করিয়া বৈরাগ্যরূপ অনলের তাপে সেই জলকে পরিশোষণ করিবে, তাহা হইলে অবশেষে ঈশ্বর-আরাধনারূপ দুগ্ধই অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে। ইহাই কাম্য কর্ম্মের তাৎপর্য্য (১)।

---

(১) তদ্বদ্ধদৃঢ়তাহেতুঃ সত্যবুদ্ধেস্তু সংস্মৃতৌ।
অতঃ প্রযত্নতস্ত্যাজ্যং কাম্যঞ্চৈব নিষেধিতম্॥
অধিকারিবিশেষে তু কাম্যস্যাপ্যুপযোগিতা।
কামনাসিদ্ধিকৃত্ত্বাৎ কাম্যে লোভপ্রদর্শনাৎ॥
প্রবৃত্তিজননাচ্চৈব লোভবাক্যং প্রলোভনাৎ।
বহির্ম্মুখানাং দুর্ব্বৃত্তিনিবৃত্তিঃ কাম্যকর্ম্মভিঃ॥

সন্ধ্যা, উপাসনা, হোম, তপস্যা, দান ইত্যাদিই নিত্য কর্ম্ম। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা নিত্য-সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হয় এবং মুমুক্ষুগণের আত্মোন্নতি হয়। হোম বা যজ্ঞ, তপস্যা ও দান এই কথা কয়েকটী এখানে একটু পরিষ্কাররূপে বুঝা প্রয়োজন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে যে ঘৃতাদি অর্পণ করা, মাত্র তাহাকেই হোম বা যজ্ঞ বলে (ক), অনাহার, অনিদ্রা ও শারীরিক যাবতীয় ক্লেশ ভোগ করাকেই তপস্যা বলে (খ), এবং সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্র-গ্রহণ বা কোন তিথিবিশেষে, কাশী বৃন্দাবন কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসী বেশধারী ব্যক্তিকে ভোজ্য বস্ত্র বা অর্থাদি দেওয়াকেই দান বলে (গ)। অনেক লোকে এই ভাব প্রচার করিতে এবং দৃঢ় করিতে বদ্ধপরিকর আছেন ও চেষ্টা করেন, এরূপও দেখা যায়। বিচার ও শাস্ত্রবাক্য দ্বারা এই কথাগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এইগুলির ব্যাপক ভাব ও প্রকৃত মর্ম্ম এবং স্থান ও কাল ভেদে ব্যবহার প্রত্যেক কল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তির জানা উচিত।

(ক) যজ্ঞ। মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতাদি অর্পণ করাকে হোম বা যজ্ঞ বলে, এ কথা সত্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিতেছেন, জীবের দেহ-পোষণকারী শস্য উৎপাদনের জন্য যে বৃষ্টি

সৎপ্রবৃত্তিবিবৃদ্ধ্যর্থং বিধানং কাম্যকর্ম্মণাম্।
কাম্যোঽবান্তরভোগস্তু তদন্তে বুদ্ধিশোধনম্॥
ঈশ্বরারাধনাদুগ্ধং কামনাজলমিশ্রিতম্।
বৈরাগ্যানলতাপেন তজ্জলং পরিশোষ্যতে॥
ঈশ্বরারাধনা তত্র দুগ্ধবদবশিষ্যতে।
তেন শুদ্ধং ভবেচ্চিত্তং তাৎপর্য্যং কাম্যকর্ম্মণঃ॥

শান্তিগীতা।৫।২৮-৩৩।

আবশ্যক, সেই বৃষ্টির নিমিত্ত মেঘ উৎপাদনই (১) পূর্ব্বোক্ত প্রকার যজ্ঞের উদ্দেশ্য, এবং ইহা দ্বারা আমাদিগের অভীষ্ট-ভোগ-দানকারী দেবতাদিগেরও পরিবর্দ্ধন হয় (২)। কিন্তু, তাঁহার মতে যজ্ঞ আবার অনেক প্রকার আছে, যথা,—দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ (৩)। মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃত, শস্যাদি, ফল, মূল প্রভৃতি অগ্নিতে অর্পণ করাও যজ্ঞ, তপস্যা করাও যজ্ঞ, যোগানুষ্ঠানও যজ্ঞ, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য শাস্ত্রপাঠও যজ্ঞ, এবং তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চা ও তদ্ভাবে চলাও যজ্ঞ। প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে এই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(খ) তপস্যা। ইন্দ্রিয় চায় বিষয় ভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে। মানুষ যদি সেই ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়ে তাহা হইলে আপাততঃ সুখ পায়, কিন্তু পরে তাহাকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহার অধঃপতন হয়, সে মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব—পরে জড়ত্ব—প্রাপ্ত হয়। মানুষকে উন্নত হইতে হইলে ঐ সুখভোগের প্রলোভন ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলেই আপাততঃ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, কেন না ইন্দ্রিয়গণ তাহাতে সুখ বোধ করিবে না, কিন্তু পরে চিত্তের

---

(১) অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৩।১৪।

(২) ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৩।১২।

(৩) দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৪।২৮।

বল বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ও আনন্দ আসিবে। এই যে প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির চেষ্টা, ইহা কষ্টকর বলিয়া, ইহার নাম তপস্যা। শারীরিক, বাচিক ও মানসিক, এই তিন প্রকারের তপস্যা আছে। দেবতা ব্রাহ্মণ (১) গুরু ও তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা, ব্রহ্মচর্য্য, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতিই শারীরিক তপস্যা (২)। (দেবতা ও ব্রহ্মজ্ঞানীর অর্চনা দ্বারা দৈবী সম্পৎ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, অহিংসা পালনে ন্যায়-পথে থাকিয়া নিজের অভীষ্ট পূরণের চেষ্টা করিতে হয়, ব্রহ্মচর্য্য পালনে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া স্ববশে আনিতে হয়।) সত্য প্রিয় ও হিতজনক বাক্য বলা, বেদ-পাঠ প্রভৃতি বাচিক তপস্যা (৩)। মনঃ-সংযম, চিত্ত-প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা, আন্তরিক ভাব সংশোধন প্রভৃতি মানসিক তপস্যা (৪)। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে আছে, কেবল শারীরিক

---

(১) সামাজিক জটিলতা ইহার মধ্যে আনিবার প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ-বংশে জাত, অথচ ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণ নাই, পক্ষান্তরে শূদ্রোচিত যথেষ্ট দোষ আছে, এমন ব্যক্তির পূজা এ স্থানের অভিপ্রায় নহে, কারণ তাঁহার পূজায় শূদ্রোচিত দোষই লাভ হইবে। আদর্শ ব্যক্তিকেই লোকে পূজা করিয়া থাকে।

(২) দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৭।১৪।

(৩) অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৭।১৫।

(৪) মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৭।১৬।

ক্লেশ ভোগকেই তপস্যা বলে না, ব্রহ্মচর্য্য-পালনই শ্রেষ্ঠ তপস্যা (১)। মুণ্ডকোপনিষদে আছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সব যিনি জানেন, তাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, অর্থাৎ জ্ঞানবিকারই ব্রহ্মের তপস্যা (২)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, কোন বিষয়ের বিশেষ আলোচনাই তপস্যা (৩)। এই সব জানিয়া এতদনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম তপস্যা, নচেৎ শুধু শরীর শোষণ করিলেই চিত্ত-শুদ্ধিকর তপস্যা হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন, আত্ম-পীড়ন দ্বারা অথবা পরের বিনাশ সাধনের জন্য কৃত তপস্যা তামসিক তপস্যা (৪)। দম্ভ, অহঙ্কার, অভিলাষ, আসক্তি ও আগ্রহ বিশিষ্ট যে সকল অবিবেকী ব্যক্তি (উপবাসাদিরূপ কঠোরতা দ্বারা) শরীরস্থ পঞ্চ ভূতকে ও অন্তঃশরীরস্থ আত্মাকে পীড়িত করিয়া অশাস্ত্রীয়ভাবে ঘোরতর

---

(১) ন তপস্তপ ইত্যাহু র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্।

(২) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ। ১।১।৯

(৩) সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ২।৬।

স তপস্তপ্ত্বান্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ৩।২।

স তপস্তপ্ত্বা প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ৩।৩।

(৪) মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৭।১৯।

তপস্যা করে, তাহারা অতি ক্রূরকর্ম্মা (১)। এই ক্রূর ব্যক্তিগণ পরে আসুরী যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, এবং জন্মজন্মান্তরে কেবল অধঃপতিতই হইতে থাকে; তাহারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না (২)।

(গ) দান। সূর্য্যগ্রহণাদি কালে, কাশী প্রভৃতি তীর্থে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ভোজ্য বস্ত্র অর্থাদি দেওয়াকে দান বলে, সত্য। কিন্তু ইহা ছাড়াও দান বহু প্রকারের হইতে পারে। ন্যায্য অভাব পূরণের জন্যই ত দান। যাহার যেটী নাই, অথচ একান্ত আবশ্যক, সেইটী তাহাকে দেওয়াই ত দানের উদ্দেশ্য (৩)। তৈলাক্ত মস্তকে অনর্থক তৈল মর্দ্দন,

---

(১) অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যসুরনিশ্চয়ান্॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৭।৫-৬।

(২) অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৬।১৮-২০।

(৩) "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ক্ষুধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥"

অথবা কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিকে দান করিয়া সমাজের বিপদ ডাকিয়া আনা, নিশ্চয়ই দানের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছেন ও জ্ঞান-উপদেশ দিতেছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতেছেন ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের হয় ত খাদ্যের অভাব আছে, বস্ত্রের অভাব আছে, অর্থের অভাব আছে, তাঁহাদিগকে সেইগুলি দিতে হইবে। একজন হয় ত রোগ-যন্ত্রণায় ভুগিতেছে, অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারিতেছে না, তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে; যে ব্যক্তি অন্ধ বা খঞ্জ অথবা অন্য কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-বিকলতা বশতঃ অর্থ উপার্জ্জন করিতে অক্ষম, অথচ তাহার ভরণ-পোষণ করে এমন কেহও নাই, এরূপ ব্যক্তির ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইরূপ ব্যক্তিসকলের জন্য অন্ন বস্ত্র ঔষধাদি দান করিতে হইবে। যাঁহাদের যথেষ্ট অর্থ আছে, ভোজ্য আছে, কিন্তু জ্ঞানের অভাব বা ধর্ম্মের অভাব, তাঁহাদিগকে সেইগুলিই দিবে; খাদ্য বস্ত্র বা অর্থ তাঁহাদিগকে দিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-দানই বড় দান। যাঁহারা জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞানীদিগকে জ্ঞান দান করেন না, বরং ছলনা করিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞানে ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা সমাজের মহা শত্রু। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই সকল দুঃখের মূল। সেই তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়া জীবকে অভয় দান করার সঙ্গে কোন প্রকার দানেরই তুলনা হইতে পারে না (১)। যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে, যে কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে ন্যায্য অভাব উপস্থিত হইলে, সেই সময়ে, সেই স্থানে এবং প্রতিদানের আশা না রাখিয়া, শ্রদ্ধার সহিত, সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিকে সেই

---

(১) সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ।
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্। ৩।৭।৪১।

বিষয়ের দানই প্রকৃত দান (১)। অভাব কি সময় স্থান বা সম্প্রদায়-বিশেষের অপেক্ষা রাখে ?

হোম বা যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের এই সকল রহস্য জানিয়া, তদনুসারে ঐগুলির অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, তবে চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া মানবকে মুক্তির প্রকৃত অধিকারী করিবে।

দেহান্তে স্বর্গাদি লাভের জন্য কৃত অশ্বমেধ-যজ্ঞ সোম-যজ্ঞ ইত্যাদি, এবং ইহলোকে নাম যশ ও প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্ত জলাশয় খনন চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি, সকলই সকাম কর্ম্ম। কিন্তু, লোকের ক্লেশ ও অভাব নিবারণ এবং শান্তি ও উন্নতি বিধানের জন্য, যদি নিঃস্বার্থভাবে জলাশয় খনন, পান্থাবাস চিকিৎসালয় বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে সেগুলি নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেহ ইন্দ্রিয় মন বা বুদ্ধি দ্বারা যে কোন ক্রিয়াই সাধিত হউক না কেন, তাহাই কর্ম্ম। তন্মধ্যে যেগুলি মানুষ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সহকারে করে না—যেমন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, শিরা ধমনী প্রভৃতিতে রক্ত সঞ্চালন, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক ইত্যাদি যে সকল কর্ম্ম স্বভাবতঃ নিষ্পন্ন হয়—সেগুলি মানুষের বন্ধনের কারণ হয় না। ইহা ব্যতীত যে কোন ক্রিয়া সে কোন উদ্দেশ্যপূর্ব্বক করিবে, তাহার জন্য সে দায়ী হইবেই হইবে, অর্থাৎ উহার সংস্কার তাহাকে পবিত্র বা অপবিত্র কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিয়া, তাহাকে ঊর্দ্ধগামী বা অধোগামী করিবে। আবার, কোন লক্ষ্য না থাকিলে, অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত, কেহ কোন কাজ করিতেই পারে না। সুতরাং সকল

(১) দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৭।২০।

কর্ম্মেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে, স্বীকার করিতে হইবে। তবে, যে কর্ম্মগুলি প্রকৃত কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে বা ভগবৎপ্রীতির জন্য করা হয় (১), সেইগুলিই শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, কারণ এ সব কর্ম্মের উদ্দেশ্য থাকিলেও ইহাতে কোন বন্ধন হয় না, বরং ইহাতে চিত্তশুদ্ধিই সাধিত হয়। ভগবানের প্রীতি কিসে হয় এ কথাটা এখানে জানা একান্ত দরকার, নচেৎ তাঁহার সন্তোষের জন্য কোন্ কার্য্য আমার করা উচিত, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? ভগবান্ জগতের আত্মরূপী, সুতরাং প্রত্যেক জীবদেহই তাঁহার দেহ বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব, যাহাতে সকলের হিত হয় সেইরূপ কর্ম্ম করিলে সকলে সন্তুষ্ট হইবে, এবং তাহা হইলেই বিশ্বাত্মা ভগবান্‌ও সন্তোষ লাভ করিবেন। ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের "জীবে দয়া" এবং বৌদ্ধধর্ম্মের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"। শাক্ত মতও তাহাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন, "বিশ্বের হিত সাধন করিলে আত্মা-রূপী বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন, কারণ বিশ্ব তাঁহারই আশ্রিত (২)''। উদ্দেশ্য থাকিলেই যে, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইবে, এরূপ নহে। নিষ্কাম কর্ম্মই মানুষের চিত্ত নির্ম্মল করিয়া মানুষকে মুক্তির নিকটবর্ত্তী করে। দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ নিজের ইহলোকে বা পরলোকে কোন সুখ-সম্পদ হইবে, এরূপ উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলে, তাহাই বন্ধনের কারণ হইবে। ভোগের কামনা থাকায় ভোগই লাভ হইবে, মুক্তিলাভ হইবে না।

---

(১) যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৩।৯।

(২) কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।

প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।২।৩৩।

যাঁহারা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিচার-পরায়ণ, সুতরাং উচ্চ অধিকারী, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মত্যাগ করিতে সক্ষম। কর্ম্মের বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহারা দেখিতে পান যে, আত্মা নিষ্ক্রিয় এবং সাক্ষিস্বরূপ, তিনি কোন কর্ম্ম করেন না, কেবল ইন্দ্রিয়গণ আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ চেতনবৎ হইয়া কর্ম্ম করিতেছে (১)। আবার, সাধনা ও বিচার দ্বারা তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পান আত্মাই তাঁহাদের স্বরূপ, সুতরাং কর্ম্ম তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহাদের কোন বন্ধনও হয় না। বাহিরে কাজ করিলেও, তাঁহারা আত্মস্থ থাকায়, কর্ম্মে তাঁহাদের কোনই আসক্তি থাকে না, সেইজন্য তাঁহারা পদ্মপত্রে স্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকায় বদ্ধ হন না (২)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্মেরই পাঁচটী হেতু আছে, যথা,—অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, বিবিধ করণ, করণসমূহের বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব। মানব শরীর

---

(১) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।৩।২৭।

(২) ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।৫।১০।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।৯।২৭-২৮।

মন বা বাক্য দ্বারা উত্তম বা অধম যে কোন প্রকার কর্ম্মই করুক না কেন, তাহার এই পাঁচটি হেতু আছে (১)। মনুষ্যের শরীরই অধিষ্ঠান, অহঙ্কারই কর্ত্তা, জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতিই বিবিধ করণ, প্রাণ-অপানাদি দ্বারা নিমেষ উন্মেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের বিবিধ উদ্যমই বিবিধ চেষ্টা এবং সর্ব্ব কার্য্যের নিয়োগকর্ত্তা অন্তর্নিহিত শক্তিবিশেষই দৈব। এক্ষণে, ক্রিয়ার আশ্রয় এবং কর্ম্মের প্রবর্ত্তক কি তাহাই দেখা যাউক। ক্রিয়ার আশ্রয় তিনটী, যথা,—করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্যকরণ, এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ। অভিলষিত ফল লাভের জন্য কর্ত্তা যে কোন ক্রিয়া করেন তাহাই কর্ম্ম। ক্রিয়ার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে সেই কারক। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ—এই ছয় কারক। কিন্তু, কর্ম্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ এই পঞ্চ ইতর কারকের অধীন না হইয়া, যিনি উহাদিগকে নিয়মিত করেন তিনিই কর্ত্তা, অর্থাৎ কর্ত্তা কোন ক্রিয়া বা কার্য্য করিতে গেলে তবে ঐ গুলির আবশ্যক হয়, কর্ত্তার অভাবে ওগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা বা কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকে না, কর্ত্তাই ঐগুলির নিয়ন্তা। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক তিনটী, যথা, জ্ঞান জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা। ইহাতে ইষ্ট

---

(১) পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্মনোভি র্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৮।১৩-১৫।

হইবে এই বোধই জ্ঞান, ইষ্টসাধক কর্ম্মই জ্ঞেয় এবং ঐ জ্ঞানের আশ্রয়ই পরিজ্ঞাতা। ইষ্ট লাভ হইবে, এরূপ বোধ না জন্মিলে, কেহই কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও চেতনার আশ্রয়ভূমি স্থূল শরীরই অধিষ্ঠান। এই অধিষ্ঠানের মধ্যে করণাদি রহিয়াছে, তথাপি তাহারা কর্ম্মের হেতু বলিয়া তাহাদের বিষয় পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধিযুক্ত আত্মাই কর্ত্তা। নচেৎ নিরুপাধি আত্মার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। কেবল উপাধিযোগেই তাঁহার অভিমান হয় (১)। মন ও বুদ্ধি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনবরত পাপ ও পুণ্য কার্য্যে ব্রতী হইতেছে, তজ্জন্য তাহারাও কর্ম্মের হেতু। মানুষরূপ কর্ত্তা (উপাধিযুক্ত আত্মা), শরীররূপ অধিষ্ঠানে অবস্থিতি করিয়া, বাক্য মন প্রভৃতি রূপ করণ দ্বারা, ইহ জন্মের চেষ্টা বা পুরুষকার ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দৈব-শক্তিবলে পাপ ও পুণ্য কার্য্য করিতেছে (২)। নিঃসঙ্গ আত্মা যে কর্ত্তা নহেন, ইহা বুঝিতে হইলে,

---

(১) আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

কঠোপনিষৎ।১।৩।৩-৪।

(২) দৈব ও পুরুষকার লইয়া অনেক সময়ই অনেককে বাগ্বিতণ্ডা করিতে শুনা যায়। এক দলের মত, পুরুষকার বা চেষ্টা দ্বারা সকল কর্ম্মই সম্পন্ন করা যাইতে পারে। যাঁহাদের চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয় নাই, এবং যত্নের সাফল্য সম্বন্ধে যাঁহারা অধিক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অভিমত ঐ প্রকার। অন্য দলের মত এই যে, দৈব বা অদৃষ্টই বলবান্,

এই কর্ম্ম-বিশ্লেষণে বোধ থাকা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত কর্ম্মত্যাগী হইতে পারেন। অনেকের ধারণা, বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কর্ম্ম না করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেই কর্ম্মত্যাগ হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে।

পুরুষকার দৈবের অধীন ; সুতরাং মানুষের চেষ্টায় কোন ফল হয় না। যাঁহাদের চেষ্টা অনেক স্থলে ব্যর্থ হইয়াছে, এবং যত্নের দ্বারাও কৃতকার্য্যতা লাভ হয় না এরূপ দৃষ্টান্ত যাঁহারা অধিক দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মত এই প্রকার। প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এখন দৈব বা অদৃষ্ট জিনিসটা কি, ইহাই বিচারের বিষয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে জীব যাহা করিয়াছে তাহারই সংস্কার (impression) তাহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। উহা জীবের চিন্তাকে পরিচালিত করে বলিয়া "দৈব", এবং উহা বর্ত্তমানে দেখা যায় না বলিয়া "অদৃষ্ট"।

"পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥"

ঐ কর্ম্ম-সংস্কারের গভীরতা বা তীক্ষ্ণতার পরিমাণ-অনুসারে উহার উদ্দীপনা-শক্তির ও কার্য্যে সফলতা দানের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে আজ যাহা আমার অদৃষ্ট বা দৈব, একদিন তাহা আমারই কৃত কর্ম্মের দ্বারা সংস্কাররূপে আমার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাই আমাকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয় ও অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পরিচালিত করে। ইহাই হইল আধ্যাত্মিক ভাবে দৈব বা অদৃষ্ট, আর অধিদৈব ভাবের দৈব হইতেছে সমষ্টি জগতের পরিচালক শক্তিসমূহ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাতেই মানুষের অধিকার আছে, কর্ম্মের

পরমাত্মা লীলা-বিলাসের জন্য জগৎ-রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, সুতরাং জাগতিক নিখিল কর্ম্মই তাঁহার সগুণ অবস্থা দ্বারা কৃত হইতেছে, মনবুদ্ধিযুক্ত দেহ কেবল তাঁহার যন্ত্র মাত্র, ইহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন,

---

ফল কিন্তু তাহার নিজের হাতে নয়। কেবল ফলার্থী হইয়া কর্ম্ম করা উচিত নহে (কেন না সেরূপ করিলে, যদি সিদ্ধিলাভ না হয় তাহা হইলে অতিশয় মনঃকষ্ট হইবে), অথবা কর্ম্মত্যাগ করিয়া অলস হওয়াও উচিত নহে (কেন না দৈববশতঃ অনুকূল অবস্থা লাভ হইলেও বিনা চেষ্টায় কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না)। আর ঐ গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের পঞ্চ প্রকার হেতুর মধ্যে "চেষ্টা" বা "পুরুষকার" একটী এবং "দৈব" আর একটী হেতু। বাস্তবিকও মানুষকে এই উভয়েই বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহাকে কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্ন করিতেই হইবে। আর তাহার কাজে যে বাধা পড়ে নাই, বা পড়িলেও কার্য্য যে পণ্ড হয় নাই, ইহা অনেকটা দৈবেরই অনুকূলতা বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং দৈব এবং পুরুষকার যেন কর্ম্মরূপ রথের দুইখানি চাকা, ইহার একখানি চাকা না থাকিলে ঐ রথ গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে না, অর্থাৎ সিদ্ধি লাভ হইবে না।

"যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধতি॥"

তবে যদি কোন অজ্ঞাত-কারণবশতঃ সিদ্ধিলাভ না হয়, অথবা কোন অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রতিকূল অবস্থা আসিয়া সমুদায় যত্ন ব্যর্থ করিয়া দেয়, তাহা হইলে দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়া অপেক্ষা, "দৈব" প্রতিকূল এই হেতু এ কার্য্য সিদ্ধ হইল না, ইহা জানিয়া শান্তি লাভ করা কর্ত্তব্য। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, এ অবস্থায় সিদ্ধি লাভ না হইলে আমি দোষমুক্ত, কিন্তু আমি অলস

তাঁহাদের যাবতীয় কর্ম্মই ভগবানে সমর্পিত হয়। ইহাই প্রকৃতপক্ষে ভগবানে কর্ম্মসমর্পণ (১)। (কেবল মৌখিক বাক্য দ্বারা কর্ম্ম সমর্পণ করিলে কোন ফল হয় না, কেন না উহা দ্বারা শান্তি লাভ হয় না।) এই প্রকারের ব্যক্তিগণই নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন, কারণ আপনার পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব-বোধ না থাকায় জড়দেহের তৃপ্তির জন্য তাঁহারা কিছু করেন না, তাঁহারা যাহা কিছু করেন সমস্তই আত্মাতে লক্ষ্যযুক্ত থাকিয়া করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, যোগই একমাত্র মোক্ষের হেতু, আর যে কৌশলের সহিত কর্ম্ম করিলে কর্ম্মসকল বন্ধনের হেতু না হইয়া মোক্ষের হেতু স্বরূপ হয়, সেই কৌশলকেই যোগ বলা যায়। সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয়, এই সমুদায়ে সমজ্ঞান করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে বন্ধন হয় না; কর্ম্মে এই সমচিত্ততা অবলম্বনই সেই কৌশল বা যোগ (২)।

হইয়া যদি চেষ্টা না করি তবে সে অসিদ্ধির জন্য আমি দোষী। তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট অবশ্য এ সব বিবাদ নাই। তিনি নিষ্কাম, তিনি কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতেই কর্ম্ম করিয়া যান, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে তাঁহার কোন চঞ্চলতাই আসে না।

(১) সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৮।৫৬-৫৭।

(২) সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

কিন্তু, যতক্ষণ "আমি কর্ত্তা" এই জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ এইরূপ সমচিত্তত্ব লাভ করা অসম্ভব। এই "আমি কর্ত্তা"রূপ মিথ্যা জ্ঞান দুই উপায়ে যাইতে পারে। সাংখ্যযোগ দ্বারা (আত্মানাত্ম-বিচারের দ্বারা) আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারিলে ঐ মিথ্যা জ্ঞান দূর হয়; অথবা, ভগবানের শক্তিতেই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, জীব ভগবানের দাস, সুতরাং কোন কাজেই জীবের স্বাধীনতা নাই, এইরূপ বিচারের দ্বারা নিজের শক্তিহীনতা বুঝিতে পারিলেও ঐ মিথ্যা জ্ঞান দূরীভূত হয়। এই উভয় প্রকার উপায়ের মধ্যে প্রথমটী শ্রেষ্ঠ হইলেও, যাহাদের চিত্ত নিতান্ত দুর্ব্বল এবং যাহারা সূক্ষ্ম বিচারে একান্তই অসক্ত, তাহাদের দাস-অভিমান হৃদয়ে পোষণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করাই কর্ত্তব্য (১)। প্রভাতে শয্যা-ত্যাগ-সময়ে হিন্দু-দিগকে যে কয়েকটী শ্লোক স্মরণ ও আবৃত্তি করিতে হয়, তাহার একটী

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

... ...

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।২।৩৮,৪৮,৫০।

(১) যাঁহারা অলসতা ভালবাসেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য, অথবা কৃতিত্বগুলি নিজেদের শক্তিতে হয়, আর দোষ পাপ পরাজয় এসব ভগবানের ইচ্ছায় হয়, কার্য্যতঃ যাঁহারা এই ভাব দেখান, তাঁহাদের সুবিধার জন্য এই মত নহে। সাধনারাজ্যে অলসতা, ধূর্ত্ততা বা শঠতার কোন স্থান নাই। যাঁহারা সরল ও উদ্যোগী কর্ম্মী এবং মুক্তিপ্রয়াসী তাঁহাদের জন্যই এই সব কথা।

শ্লোক আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমরা ভগবানের দাস, তাঁহারই আজ্ঞাধীন হইয়া, তাঁহারই প্রীতির জন্য, আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে। শ্লোকটীর (১) বঙ্গানুবাদ এই, "হে লোকসমূহের নাথ, হে চৈতন্যময় অধিদেব, হে লক্ষ্মীকান্ত, হে বিষ্ণো, তোমার আজ্ঞা বশতঃই, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, আমি তোমারই প্রীত্যর্থে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।" অর্থাৎ হে চৈতন্যময় সর্ব্বেশ্বর, তোমার আদেশেই আমি জগতে আসিয়াছি, এ জগৎ তোমারই লীলাভূমি, তোমার সেই লীলা-পুষ্টির জন্য, তোমারই সন্তোষের নিমিত্ত, ক্ষুদ্র অভিনয়কারী আমি, আমার ক্ষুদ্র জীবন-লীলার অভিনয়ে যেটুকু আবশ্যক বুঝি, তাহা করিব। সাধারণ মানব সংসারে যে সকল অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে, তাহাতে ভগবদধীনতার ভাবটী হৃদয়ে ধারণা করিবার জন্য, পরবর্ত্তীরূপ বিচার সে অনায়াসেই করিতে পারে। "আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না,—কোনটী পূর্ণ হয়, কোনটী পূর্ণ হয় না, কোনটীর বিপরীত ফল হয়; সুতরাং আমার চেষ্টার ফল কোন অদৃষ্ট শক্তির অধীন। আবার সকল বিষয়ে আমার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করাও ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং আমার কর্ম্মশক্তিও কোন অজ্ঞাত শক্তির অধীন। জগৎ ভগবানের শক্তিতেই পরিচালিত হইতেছে, আর তিনি সর্ব্বশক্তির ঈশ্বর। কাজেই আমি সেই ভগবানের শক্তির অধীন। তিনি আমার যে বাসনা পূর্ণ করেন সেইটীই পূর্ণ হয়, অন্যগুলি হয় না। তিনি প্রভু, আমি দাস। তিনি আমাকে যে ভাবে চালাইতেছেন, সেইভাবে চলা ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই। তিনি যখন প্রভু, আমি যখন তাঁহার দাস, তখন আমার দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত

---

(১) "লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রীয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥"

হইতেছে, তাহার ফলে আমার কোনই অধিকার নাই, ও অধিকার। যে কর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে তাহা সেই সর্ব্বময় প্রভুর ইচ্ছায়ই হইতেছে, তাহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই, আবার যেটী সিদ্ধ হইতেছে না সেটী তাঁহার অভিপ্রেত নহে বলিয়াই হইতেছে না, অতএব তাহাতে আমার মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কিছুই নাই।" পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বোক্তরূপ বিচারের দ্বারা দাস-অভিমান হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারিলেও সুখদুঃখে, লাভালাভে, জয়পরাজয়ে সমচিত্ত হওয়া যায়। এইরূপ সমচিত্ত হইলে আসক্তি আর থাকে না, আসক্তি না থাকিলে বন্ধনও ঘটিতে পারে না। সুতরাং, সাধক মুক্ত হইয়া শান্তি ভোগ করিতে পারেন।

কাম্য কর্ম্মের ন্যাস বা ত্যাগই সন্ন্যাস এবং সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগই কর্ম্মত্যাগ বলিয়া জানিতে হইবে (১)। নচেৎ দেহধারীর পক্ষে কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইতে পারে না (২)। যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই, কেন না তাঁহারা সর্ব্বদাই আত্মতৃপ্ত (৩)। কোন কাজ করিলেও তাঁহাদের পুণ্য হয় না, না

---

(১) কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৮।২।

(২) ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১৮।১১।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ঐ। ৩।৫।

(৩) যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ঐ। ৩।১৭।

করিলেও তাঁহারা প্রত্যবায়ভাগী হন না (১)। তথাপি, সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠ লোকদিগের অনুকরণ করে বলিয়া, লোক-সংগ্রহার্থে করণীয় কর্ম্মসমুদায় অনাসক্তভাবে তাঁহাদেরও করা উচিত (২), যে হেতু তাঁহারাই প্রকৃতভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন। নিম্নাধিকারিগণ, শত চেষ্টা করিলেও, আত্মানাত্ম-জ্ঞানের অভাব বশতঃ, ঠিক ঐরূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে পারে না, তাহাদের কার্য্যে মুখ্য বা গৌণ ভাবে স্বার্থ প্রবেশ করিবেই করিবে। যেথানেই স্বার্থ আছে সেখানেই ব্যস্ততা অনিবার্য্য, সুতরাং চিত্তের স্থিরতার অভাবে সে স্থলে যথাযথ-

---

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৪।২২।

(১) নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৩।১৮।

(২) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৩।১৯-২১।

সক্তাঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৩।২৫।

রূপে কার্য্য করা হয় না। আরও, যে কার্য্যে স্বার্থের সংশ্রব আছে সে কার্য্যে, স্বার্থের পরিমাণ-অনুসারে, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অভাব আসিয়া পড়ে। তবে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে এবং ভগবৎপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতেছি এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, মহাপুরুষগণের কর্ম্মের অনুকরণ করিতে করিতে, তাহাদের চিত্ত ক্রমে বিশুদ্ধ হইবে, এবং তাহারাও সময়ে প্রকৃতরূপে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইবে। ইহাই মুক্তিলাভের পথ।

নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে গেলে নিজের দেহসুখের বা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের সুখের ধারণা হৃদয়ে আসে না। এইরূপে দীর্ঘ দিন কর্ম্ম করিতে পারিলে, নিজের একটা পৃথক্ সত্তার জ্ঞান কমিয়া যায়। অবশেষে কর্ম্মযোগী দেখেন তিনি আর কিছুই নহেন, তিনি এই অনন্ত বিশ্বসংসারের একটী অংশ মাত্র। তিনি ভোক্তা আর জগৎ তাঁহার ভোগ্য, এ জ্ঞান আর তাঁহার না থাকায়, তিনি অনুভব করেন যে, এই অনন্ত চৈতন্য-সমুদ্রে তিনি একটী তরঙ্গ মাত্র। ইহাই অভেদ-জ্ঞান, ইহাই সাধনার চরম ফল। এ অবস্থায় তিনি দেখিতে পান যে, যিনি করিতেছেন, যাহা করা হইতেছে, যাহা দ্বারা করা হইতেছে এবং যে ক্রিয়া হইতেছে সে সব একই ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ—সবই ব্রহ্মময় (১)। এইভাবে ব্রহ্মসত্তায় জীবসত্তার লয়ই মুক্তি। জীবসত্তায় ভোগের কোন তাড়না না থাকায় তখন কেবল এক অপূর্ব্ব শান্তির প্রবাহই বহিতে থাকে।

---

(১) ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৪।২৪।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:•:—

উপাসনা।

কর্ম্মময় জীবনকে সরস রাখিবার জন্য ঈশ্বর-উপাসনা একান্ত প্রয়োজন। আবার, উপাসনা ব্যতীত মানব স্ব-স্বরূপ-উপলব্ধির পথে অগ্রসরও হইতে পারে না, সে জন্য উপাসনা করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সগুণ ব্রহ্মের প্রতি মনের ক্রিয়াবিশেষের নাম উপাসনা (১)। নিগুর্ণ ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্মই সাধনার চরম লক্ষ্য। কিন্তু, যাহা ব্রহ্মের স্বরূপ তাহা উপাসনার বিষয়ীভূত পদার্থ হইতে পারে না, কারণ তাহা বাক্য ও মনের অগোচর। সাধারণতঃ, মানুষ গুণের অধীন, অতএব যাহা সগুণ তাহাই তাহার চিন্তা ও ধারণার মধ্যে আসিতে পারে (২)। তবে নিগুর্ণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া যে সাধনা (৩),

---

(১) উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি
শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি।” বেদান্তসারঃ।

(২) স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। তৃতীয় উল্লাসঃ।

(৩) অক্রিয়ৈব পরা পূজা মৌনমেব পরো জপঃ॥
অচিন্তৈব পরো যোগঃ অনিচ্ছৈব পরং সুখম্॥
গীতাসারঃ।৬৬।

তাহাতে কেবল উচ্চ স্তরের সাধকই সক্ষম। "আমি এক আছি, ক্রীড়ার নিমিত্ত বহু হইব" এই ভাব ব্রহ্মের যে সময় আসিয়াছিল, সেই সময় তাঁহার মায়া শক্তি বা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা দূরীভূত হইয়া, প্রথম স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মের যে অংশ লইয়া মায়া প্রথম কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই টুকুই অর্থাৎ ব্রহ্মের সেই অবস্থাটাই ব্রহ্মের প্রথম সগুণ অবস্থা বা ঈশ্বর। তাঁহা হইতেই অনুলোমক্রমে জগতের বিকাশ। আবার বিলোমক্রমে জগৎ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তৎপর সূক্ষ্মতম অবস্থায় গিয়া, অবশেষে মহাপ্রলয়ে মায়ায় লয় হয়, এবং মায়া ও সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ আদি প্রকৃতি ও পুরুষ সেই নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হয়েন। তাই সাধককে চক্ষু ভিতরের দিকে ঘুরাইয়া অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, এবং এই ভাবে চলিতে পারিলে, প্রথমে তিনি যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সগুণ ব্রহ্মে পৌঁছিয়া, অবশেষে চির বিশ্রামসুখ লাভ করিতে পারিবেন।

একটী স্থূল দৃষ্টান্ত ধরিলে বিষয়টীর কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে। পারমার্থিক বিষয়ের সহিত স্থূল জগতের কোন বিষয়ের উপমাই ঠিক হইতে পারে না, তথাপি সাধকের বোধের সুবিধার জন্য শাস্ত্রে অনেক স্থলে সেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এ স্থলেও সেইরূপ করা হইতেছে। মনে করুন, একটি লোক গ্রাম বা নগর হইতে বহু দূরে নির্জ্জন স্থানে একাকী এক বাটীতে বাস করে। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া তাহার যদি লোকসঙ্গ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ সে কি করে? গ্রামে বা নগরে গিয়া কি কি করিবে, প্রথমে তাহার একটা কল্পনা সে করিতে থাকে, এবং দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাটীতে আবশ্যকীয় কাজ করিয়া, আহারান্তে, তাহার বাটী হইতে দূরে স্থিত যে পল্লী বা নগর তাহাতে সে গমন করে। সে স্থানে কয়েক জন লোকের সঙ্গে

আবশ্যক মত কার্য্য করিয়া, ইচ্ছামত আলাপাদি করিয়া, অথবা খেলা করিয়া সে আনন্দ উপভোগ করে; পরে যখন কার্য্য শেষ হয়, তৃপ্তি হয় বা ক্লান্তি বোধ হয়, তখন সে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসে, এবং সেখানকার অবশিষ্ট কার্য্য সমাপনান্তে রাত্রিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। নিজ বাটীতে থাকা সময়ে ঐ লোকটী নগরে বা গ্রামে গিয়া যাহা যাহা করিবে বলিয়া জল্পনা কল্পনা করে, এবং সেই সমস্ত কাজের জন্য যাহা যাহা আয়োজন করে, তাহা যেন সগুণ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম রাজ্যের খেলা; গ্রামে বা নগরে আসিয়া ঐ ব্যক্তি যে সকল কাজ করে, তাহা যেন জীবাদিরূপে সগুণ ব্রহ্মের স্থূল জগতের খেলা; আর ঐ মনুষ্যটীর গাঢ় নিদ্রিত অবস্থা বা সুষুপ্তি যেন সগুণ ব্রহ্মের বিলীন অবস্থা বা ব্রহ্মের স্বরূপ অবস্থা।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, যেমন ভিন্ন স্থানে যাইবার সময়, লোকটীকে নিজের বাসস্থান পিছনে ফেলিয়া দূরে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, জীবও সেইরূপ নিজ স্বরূপ ভুলিয়া, ঈশ্বরকে পশ্চাতে রাখিয়া, তাঁহা হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়ে অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ও বিষয়-ভোগে একান্ত মুগ্ধ হইয়া, আত্মবিস্মৃতির ঘন হইতে ঘনতর আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে। ক্লান্তি বোধ হইলে বা প্রয়োজন শেষ হইলে, লোকটী যেমন নিজের গৃহের দিকে মুখ ফিরায়, এবং যে সকল স্থান দিয়া ও যে সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নগরে বা গ্রামে আসিয়াছিল, সে সমুদায় ক্রমশঃ অতিক্রম করিতে করিতে নিজ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ মানবের যখন ভোগের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায় বা বিষয়-বিষে যখন দেহ-প্রাণ জর্জ্জরিত হইয়া উঠে, তখনই সে বিষয়ের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিজ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এবং বিষয়াসক্তি ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়।

এই যে বিষয়াসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা, ইহাই সাধনা বা উপাসনা।

"উপাসনা" শব্দের ধাতুগত অর্থ "নিকটে থাকা"। "উপ" এই উপসর্গের অর্থ নিকটে, আর "আস" ধাতুর অর্থ অবস্থান করা, থাকা। সুতরাং "ঈশ্বরোপাসনা" অর্থ "ঈশ্বরের নিকটে থাকা"। ঈশ্বর যখন সর্ব্বব্যাপী, তিনি যখন আমাদের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহার নিকটেই ত রহিয়াছি। নিকটে রহিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা আমরা জানিতেছি কৈ, অনুভব করিতেছি কৈ? প্রাণের জ্বালা দূর হইতেছে কৈ? মনে কর তুমি দরিদ্রতায় কষ্ট পাইতেছ। তোমার পিতার প্রচুর অর্থ ছিল। তাহা তিনি কোন সময়ে তোমার গৃহে মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; হঠাৎ বিদেশে মৃত্যু হওয়ায় তোমাকে তিনি কিছু বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তুমি প্রতিবেশীদের নিকট এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট শুনিলে যে, তোমার পিতার বহু অর্থ ছিল—নিশ্চয়ই তাহা তোমাদের বাটীতেই আছে। এ বিষয়ে তোমার বিশ্বাসও জন্মিল, এবং উহা বাস্তবিকও তোমাদের বাটীতেই রহিয়াছে। তাহাতে তোমার দরিদ্রতা দূর হইতেছে কি? তোমার যাতনার অবসান হইতেছে কি? যদি তুমি ঐ অর্থের সন্ধান পাও, কোনও উপায়ে উহা তোমার হস্তগত হয়, উহা তোমার ব্যবহারে আসে, তবেই তোমার দরিদ্রতার যাতনা দূর হইতে পারে, তবে তোমার সুখ লাভ হইতে পারে। সুতরাং মুখে বলিলে বা বিচারে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলে চলিবে না যে, ঈশ্বর আমাদের ভিতরে বাহিরে রহিয়াছেন,—আমরা তাঁহার অতি নিকটেই রহিয়াছি। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে, তবে শান্তি আসিবে। এই প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার উপায় অবলম্বনই উপাসনা।

স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যাঁহাকে জানিতে হয়, তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও তিনিই জানিবার বিষয় (১)। নির্গুণব্রহ্ম নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, সাক্ষী মাত্র, জ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ সত্তা মাত্র; তিনি কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। ব্রহ্মের প্রথম সগুণ অবস্থা বা ঈশ্বর, যাঁহার কথা কিছু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহাতে ও নির্গুণ ব্রহ্মে প্রভেদ অতি কম। ইঁহাতে পৌঁছিতে পারিলেই, উর্দ্ধগামী সাধক চিত্তের লীনপ্রায় অবস্থা হেতু বিনা চেষ্টায়ই নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "সগুণ ব্রহ্মের প্রতি মনের ক্রিয়া বিশেষের নামই উপাসনা" বা সাধনা। এই সগুণ ব্রহ্মের প্রতি একতান ধ্যানে মন ও বুদ্ধি নিশ্চল হইয়া যায় বা লয়প্রাপ্ত হয় (২), সুতরাং জীবের নিজ স্বরূপ আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এই অবস্থায় মন বা বুদ্ধির তেমন চালনা হয় না, সুতরাং সাধন ভজন কিছুই চলিতে পারে না। উপাসনা বা সাধনা কতক্ষণ? যতক্ষণ সাধক গুণের মধ্যে আছেন। সাধক যখন সেই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করেন, তখন তাঁহার আর নিজের পৃথক্ সত্তা বোধ থাকে না, সচ্চিদানন্দ-সাগরের লহরী-লীলায় তিনি ভাসিয়া যান। তিনি যে সেই অনন্ত

---

(১) স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। তৃতীয় উল্লাসঃ।

(২) বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্ দেহাদিষ্বাত্মধীঃ ক্ষণাৎ।
পুনঃ পুনরুদেত্যেবং জগৎসত্যত্বধীরপি।
বিপরীতা ভাবনেয়মৈকাগ্র্যাৎ সা নিবর্ত্ততে।
তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ।
পঞ্চদশী।৭।১০২-১০৩।

সাগরের জলরাশিরই একটী বিন্দু মাত্র, সেই সাগরপ্রবাহ যে দিকে যাইতেছে, তিনিও যে সেই দিকেই যাইতেছেন, সেই জলরাশির সত্তায়ই যে তিনি সত্তাবান্, এই ভাবসাগরে ডুবিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। তখন আর তাঁহার স্বাধীন পৃথক্ চেষ্টা কিছু থাকে না।

অনেকে বলেন উপাসনা দুই প্রকার, যথা, সাকার-উপাসনা ও নিরাকার-উপাসনা। ইঁহারা বলেন ব্রহ্মের সগুণ বিভাবে অনন্ত রূপের বিকাশ, এবং এই রূপের কোন একটী লইয়া যে উপাসনা তাহাই সাকার-উপাসনা। মানুষের মন সাংসারিক রূপে আসক্ত, সুতরাং ঈশ্বরের কোন ভক্ত-মনোহর কল্পিত মূর্ত্তিতে মনোনিবেশ করা মানুষের পক্ষে সহজ। আর এই রূপের আশ্রয় ছাড়া যে উপাসনা তাহারই নাম দেন ইঁহারা "নিরাকার-উপাসনা"। বাস্তবিকপক্ষে একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, "সাকার" শব্দের অর্থ "আকারের সহিত বর্ত্তমান যিনি"। আমরা দেখি আকার, আকারের সহিত বর্ত্তমান যিনি তাঁহাকে দেখি না। অতএব, সাকারের উপাসনা বলিলে আকারের উপাসনা বুঝায় না, আকারের সহিত বর্ত্তমান যিনি তাঁহারই উপাসনা বুঝায়। "পঞ্চোপাসনা"নামক অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, সাকার-উপাসনা বলিতে লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহাতেও আকারের আশ্রয় যে সগুণ আত্মা তাঁহারই প্রতি পুজা ও ভক্তি ব্যবস্থিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল মূর্ত্তি সগুণ আত্মার বিশেষ বিশেষ গুণের পরিচায়ক মাত্র,—ঐ সকল মূর্ত্তি দর্শনে সগুণ ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ গুণের স্ফুরণই মন-মধ্যে উদিত হয়। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, সাকার-উপাসনার লক্ষ্যও যিনি, নিরাকার-উপাসনার লক্ষ্যও তিনি। তবে সাকার-উপাসনায়, ভাবের উদ্দীপনার-জন্য, কল্পিত মানস মূর্ত্তি অথবা তদনুযায়ী ধাতু-প্রস্তরাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি একটা আলম্বন, নিরাকার-উপাসনায় সেই আলম্বনের আবশ্যকতা নাই।

অনেকে নিরাকার-উপাসনা অর্থে নির্গুণের উপাসনা বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার-উপাধি-বর্জ্জিত যে অবস্থা তাহাই তাঁহার নির্গুণ অবস্থা। ইহা সর্ব্বপ্রকার গুণের পরপারে অবস্থিত, সুতরাং মন বা বুদ্ধি সে স্থানে যাইতে পারে না (১), এবং এই জন্যই নির্গুণের কোন উপাসনা নাই।

উপরে যাহা উক্ত হইল, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, লোকে "নিরাকার-উপাসনার" নাম শুনিলে যতটা ভয় পাইয়া থাকে, তাহা পাইবে না। যাঁহারা চিত্তবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে একান্তই অক্ষম, এবং বহির্জ্জগতের অন্তর্নিহিত শক্তির ধারণা আদৌই করিতে পারেন না, অথচ ভগবানের ভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য ঐ প্রকার সাকার-উপাসনা আবশ্যক। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হইয়াছে, এবং নিজের ও বহির্জ্জগতের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি যাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁহারা সেই শক্তির কার্য্য দেখিয়াই সগুণ ব্রহ্মের গুণরাশির ভাবনা করিতে সক্ষম। এরূপ সাধকদিগের পক্ষে নিরাকার-উপাসনাই প্রশস্ত। সাকারের উপাসকগণ এক সময় এই অবস্থায়ই আসিয়া দাঁড়াইবেন। দুর্ব্বল ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না (২)। দুঃখরাশি অতিক্রম করিতে হইলে পরমাত্মাকে লাভ করিতেই হইবে। সুতরাং হৃদয়ের বল বাড়াইতে হইবে, দুর্ব্বল হইলে চলিবে না। মূর্ত্তি অবলম্বন না করিয়া ভগবানের ভজনা করা যায় না, ইহা ভাবিয়া বসিয়া থাকিলে

---

(১) যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
কেনোপনিষৎ ।১।৫।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥ ব্রহ্মোপনিষৎ।

(২) নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। মুণ্ডকোপনিষৎ ।৩।২।৪।

চলিবে না। আমরা অমৃতের সন্তান। যিনি অনন্ত শক্তির আধার, তাঁহার সন্তান হইয়া আমরা দুর্ব্বল হইব কেন? এই জন্যই সদ্‌গুরু শিষ্যকে সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ হইবার জন্য উত্তেজিত করেন। এই জন্যই যমরাজ নচিকেতাকে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন (১)।

উপাসনা "মনের ক্রিয়াবিশেষ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক বিবিধ দ্রব্য দ্বারা বাহ্য পূজাই হউক, জপ স্তব আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণাই হউক, সাধনার প্রধান উপাদান মনের ক্রিয়া। "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আমি তাঁহার অংশ। কেন আমি তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিতেছি না? আমার কতকগুলি স্বকৃত উপাধি আমাকে এমন চাপিয়া ধরিয়াছে, আমাকে এত ছোট করিয়া রাখিয়াছে এবং এমন ভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, আমি আর সেই আনন্দময়কে স্পর্শ করিতে পারিতেছিনা, দুঃখের আঁধারেই জীবন অতিবাহিত করিতেছি। আমাকে এই স্বকৃত উপাধিবন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, এই আবরণ খুলিয়া ফেলিতে হইবে, তবে আমি সেই পরমানন্দময়ের স্পর্শসুখ অনুভব করিতে পারিব।" এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া যে সমস্ত অনুষ্ঠান করা যায় তাহাই সাধনা, তাহাই উপাসনা। কাজে কাজেই, মনের ক্রিয়াই সাধনার প্রধান উপাদান। বাহ্য উপকরণ দ্বারা যে বাহ্য পূজা তাহাতে পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক

---

(১) উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

কঠোপনিষৎ।৩।১৪।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।২।৩।

বা মুদ্রাবিশেষ দেখাইয়া ঐ গুলিকে মনে মনে বিশুদ্ধ বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, মনে মনে বিঘ্নরাশি অপসারণ করিতে হয়, পুষ্পাদি দেবতাতে অর্পিত হইল ইহা মনে করিতে হয়, নৈবেদ্য প্রভৃতি দেবতা গ্রহণ করিলেন ইহা চিন্তা করিতে হয়, তাঁহার নিকট অপরাধ হইয়া থাকিলে তিনি ক্ষমা করিবেন এই মনে করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়, তিনি পূজা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ইহা মনে মনে ধারণা করিতে হয়। মন যদি ঠিক ঠিক এইগুলির সঙ্গে যুক্ত না থাকিল তবে কিছুই হইল না। সংক্ষেপে এই বলা যায়, জীব নিজেই নানাবিধ বাসনা ও কামনা দ্বারা নানাবিধ উপাধি গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াছে, এবং দুর্ব্বল হইয়া নানাবিধ যাতনা ভোগ করিতেছে, আবার নিজেরই মনের বলে ঐ সকল উপাধি দূর করিলে তবে সে শান্তিসাগরে অবগাহন করিতে পারিবে। মনই মানবের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ (১)।

সাক্ষিরূপী সচ্চিদানন্দকে জীব যতদিন না পাইতেছে, ততদিন তাহার চির বিশ্রাম-সুখের আশা মরীচিকায় জলভ্রান্তি মাত্র। কিন্তু, তিনি যে অনন্ত, তিনি যে গুণরাশির পরপারে অবস্থিত, আর আমি যে ক্ষুদ্র ও মায়া-মোহিত। তবে উপায়? উপায় আছে। তিনি অনন্ত, সুতরাং সর্ব্বত্রই আছেন, আমাতেও আছেন। অপার সমুদ্রের এক স্থান হইতে এক গণ্ডূষ জল পান দ্বারা সমগ্র সমুদ্রের জলের গুণ অনুভবের ন্যায়, আমার সমুদায় মানসিক শক্তিকে আমার হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত করিয়া, সেই অনন্তের অনুভব করিতে হইবে। আমার হৃদয়ে ব্যষ্টিরূপী সগুণ আত্মা নানা কার্য্যে গুণের আড়াল হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে অনন্ত প্রশান্ত অমৃত-সিন্ধু পরমাত্মা বিরাজমান

---

(১) "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।"

আছেন। আমাকে মুখ ফিরাইয়া, গুণের স্ফুরণ ধরিয়া ধরিয়া, গুণের পশ্চাৎ দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনিমেষনয়নে চাহিয়া থাকিতে হইবে। তাহা হইলেই গুণের খেলা থামিয়া যাইবে, আর প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা আমার স্বীয় মহিমায় আপনিই ভাসিয়া উঠিবেন। তখন তিনি আমার ভিতরে, আমার বাহিরে, জগতের অণু-পরমাণুতে, সত্তারূপে জ্ঞানরূপে এবং আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতে থাকিবেন। ইহাই উপাসনার চরম ফল।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:•:—

প্রকৃত ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ।

ভক্তিই ঈশ্বর-উপাসনার প্রথম ও প্রধান উপাদান। যাহার ভক্তি নাই তাহার উপাসনা বিনা তণ্ডুলে অন্ন রন্ধনের ন্যায়।

ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগের নাম ভক্তি (১)। পিতা, মাতা, ভিন্ন ভিন্ন দেবতা, আপনা অপেক্ষা উচ্চতর কোন ব্যক্তি, উপকারী কোন লোক বা জীব প্রভৃতির প্রতি যে অনুরাগ বা সম্মান প্রদর্শন, তাহাও ভক্তি নামে অভিহিত হয়। আবার, রোগ শোক বা ভয়ে পীড়িত হইয়া, ইহলোকে বা পরলোকে কোন সুখ-সম্পদ্ লাভের জন্য, বা ভগবানের তত্ত্ব জানিবার লালসায়, ভগবানের যে আরাধনা তাহাও ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ইহার কোনটাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি দিতে পারে না। একমাত্র ভগবান্ই নিত্য, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দময়, একমাত্র ভগবানের সত্তায়ই আমার ও জগতের সত্তা ইহা জানিয়া, সর্ব্বপ্রকার বাসনা বর্জ্জন পূর্ব্বক, ভগবানের প্রতি প্রাণের যে অকপট অনুরাগ, সেই অনুরাগই মুক্তি দিতে সমর্থ, এবং তাহার নাম পরা ভক্তি। অপরাপর ভক্তি সময়ে সাধককে এই প্রকার ভক্তিতে আনিয়া উপস্থিত করে বলিয়া, তাহাদের নাম গৌণী ভক্তি (২)।

---

(১) ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। নারদভক্তিসূত্রম্।১।২।

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্রম্।১।১।২।

(২) মানবের জীবন-প্রভাতে জনক ও জননীর প্রতি তাহার যে অনুরাগ দেখা দেয়, তাহাই ভক্তির প্রথম ও প্রধান অঙ্কুর; এবং ইহার প্রতি অবহেলা না দেখাইলে, ইহাই মানবকে নানা স্তরের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া, অবশেষে তাহাকে পরা ভক্তির দ্বারে উপস্থিত করে।

যাহাদের গৌণী ভক্তিই নাই, তাহারা কোনদিন পরা ভক্তির অধিকারী হইতে পারিবে না। পরা ভক্তি গৌণী ভক্তি হইতে অনন্তগুণে ব্যাপক ও গভীর।

সংসারের যাবতীয় কর্ম্মের ফলই অল্পাধিক দুঃখজনক, ইহা জানিয়া, যাঁহারা কর্ম্মফলে বিরক্ত হইয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী। যাঁহাদের কর্ম্মফলসকলে বিরক্তি জন্মে নাই অর্থাৎ আসক্তি আছে, তাঁহারা কর্ম্মযোগের অধিকারী। আর, যাঁহারা কর্ম্মফলে বিরক্ত হন নাই অথচ অত্যন্ত আসক্তও নহেন, এবং ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহারাই ভক্তিযোগের অধিকারী। যতদিন কর্ম্মফলে বিরক্তি না জন্মিবে, অথবা যতদিন ভগবদ্বিষয়ক কথার শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মিবে, ততদিন সাধক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে (১)।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে ভক্তিও তিন প্রকার,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। হিংসা দম্ভ কিংবা মাৎসর্য্য ভরে, ক্রোধ-পরায়ণ পুরুষ, ভগবান্‌কে পৃথক্ জানিয়া, যে ভক্তি করে তাহা তামসিক ভক্তি। বিষয় যশ কিংবা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া, ভগবান্‌কে পৃথক্ জানিয়া মূর্ত্তি প্রভৃতিতে যে পূজা করা হয়, তাহা রাজসিক ভক্তি।

---

(১) নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১১।২০।৭-৯।

আর পাপ ক্ষয় করিবার মানসে, ভগবানের প্রীতি সম্পাদনে ইচ্ছা করিয়া, ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে, যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য এই বিবেচনায়, অথবা এই প্রকারের অন্যান্য অভিপ্রায়ে, ভগবানে ভেদ দর্শন পূর্ব্বক যে ভক্তি করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ভক্তি (১)। এই সকল ভক্তি হইতেও উৎকৃষ্টা ভক্তি আছে, তাহাই প্রকৃত ভক্তি, এবং

---

(১) অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অচ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ॥
কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেৎ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।৩।২৯।৮-১০।

পরপীড়াং সমুদ্দিশ্য দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরম্।
মাৎসর্য্যক্রোধযুক্তো যস্তস্য ভক্তিস্তু তামসী॥
পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ।
নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোহর্থী ভোগলোলুপঃ॥
তত্তৎফলসমাবাপ্ত্যৈ মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ।
ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্মাদন্যাং জানাতি পামরঃ।
তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধীপ তু রাজসী॥
পরমেশার্পণং কর্ম্ম পাপসংক্ষালনায় চ।
বেদোক্তত্বাদবশ্যন্তৎ কর্ত্তব্যন্তু ময়ানিশম্॥
ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তু ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ।
করোতি প্রীতয়ে কর্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্ত্বিকী॥

দেবীভাগবতম্।৭।৩৭।৫-৯।

তাহাকেই পরা ভক্তি বলা হয়। ভগবান্ সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন, তিনি মায়াতীত পুরুষোত্তম, ইহা জানিয়া, তাঁহার গুণ শ্রবণমাত্রেই কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া এবং তাঁহাতে ভেদদর্শী না হইয়া (অর্থাৎ তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, তিনি আমারই অন্তরাত্মা, ইহা জানিয়া), সাগরে যেমন গঙ্গার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন-ধারায় পতিত হইতেছে, সেইরূপে তাঁহাতে (সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানে) একতানভাবে যাঁহার মনের গতি হয়, তাঁহার ভক্তিই "নির্গুণ ভক্তিযোগ" বলিয়া কথিত হয়। ইহাই পরা ভক্তি, ইহাই ভক্তির পরাকাষ্ঠা। এই ভক্তি লাভ হইলে, ভক্ত ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়েন (১)। ভক্তির স্তর-বিভাগ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবতের মূল শ্লোক-গুলিও নিম্নে যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

---

(১) মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণাতি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।৩।২৯।১১-১৪।

অধুনা পরাভক্তিস্তু প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে।
মদ্গুণশ্রবণং নিত্যং মম নামানুকীর্ত্তনম্ ॥
কল্যাণগুণরত্নানামাকরায়াং ময়ি স্থিরম্।
চেতসো বর্ত্তনঞ্চৈব তৈলধারাসমং সদা ॥

লোকে সাধারণতঃ মনে করেন যে, ভক্তিযোগ অতি সহজ। কিন্তু, তাঁহারা যদি যথার্থভাবে ভক্তিযোগের বিষয় চিন্তা করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা অতি সহজ ব্যাপার নহে। শাস্ত্রে যে স্থানে জ্ঞানযোগের বা নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনার কথা বলা হইয়াছে সে স্থানে, কর্ম্মবাহুল্যের অভাবশতঃ (২), জ্ঞানযোগই সহজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাই বলিয়া জ্ঞানযোগ অতি সহজ সাধনা

হেতুস্তু তত্র কো বাপি ন কদাচিৎ ভবেদপি।
সামীপ্যসার্ষ্টিসাযুজ্যসালোক্যানাং ন চেষণা॥
মৎসেবাতোঽধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কর্হিচিৎ।
সেব্যসেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি॥
পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্ যো হ্যতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদেনৈব মাং নিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ॥
মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাং মাং সর্ব্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদা॥
... ...
ইতি ভক্তিস্তু যা প্রোক্তা পরাভক্তিস্তু সা স্মৃতা।
যস্যাং দেব্যতিরিক্তন্তু ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে॥
ইত্থং জাতা পরাভক্তির্যস্য ভূধর তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ॥
দেবীভাগবতম্।৭।৩৭।১১-১৭ ও ২৬-২৭।

(২) অভুক্তো বাপি ভুক্তো বা স্নাতো বাস্নাত এব বা।
সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং স্বেচ্ছাচারেণ সাধকঃ॥
বিনায়াসং বিনাক্লেশং স্তোত্রঞ্চ কবচং বিনা।
বিনা ন্যাসং বিনা মুদ্রাং বিনা সেতুং বরাননে।

নহে। মূল কথা এই যে, যে ব্যক্তি যে পথের অধিকারী সেই পথ তাঁহার পক্ষে সহজ। কর্ম্মফলে আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগ সহজ, কর্ম্মফলে বিরক্ত নহেন অথচ অধিক আসক্তও নহেন এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ, এবং যে ব্যক্তি কর্ম্মফলে অতিশয় বিরক্ত তাঁহার পক্ষে জ্ঞানযোগই সহজ।

অতি নিম্ন স্তরের সাধক, বিচার-শক্তির বিশেষ স্ফূরণ না থাকায়, কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারেন না। যখন তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক কথা শ্রবণে আসক্তি জন্মে, তখন তিনি ভক্তিযোগের অধিকারী হয়েন। ভক্তিযোগে অধিক অগ্রসর হইলে, অর্থাৎ পরা ভক্তি লাভ করিলে, জ্ঞানযোগী হইতে তাঁহার বিশেষ পার্থক্য থাকে না। সর্ব্বপ্রকার সাধনারই শেষ ফল তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি (১), এবং সাধকের স্ব-স্বরূপ লাভ।

বিনা চৌরগণেশাদিজপঞ্চ কুল্লুকং বিনা।
অকস্মাৎ পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।৩।১১৭-১১৯।

(১) শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াজ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৪।৩৩।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ঐ।৪।৩৮-৩৯।
ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ॥
দেবীভাগবতম্।৭।৩৭।২৮।

ভক্তগণ ভগবানের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না। ভগবানের সহিত একত্ব লাভ তাঁহারা ইচ্ছা করেন না (১)। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, তাঁহাদের ভক্তির যখন পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়েন (২)। দেবীভাগবতের মতে এরূপ ভক্ত ভগবতীর চৈতন্যরূপে বিলীন হয়েন (৩)। ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, সৎ ও অসৎ স্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ অবিদ্যা-বশতঃই আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে ; সাধক যখন তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে ইহা বুঝিতে পারেন, ও অনুভব করেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয় অর্থাৎ তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারেন। আচ্ছন্নকারিণী মায়া যখন জ্ঞানরূপে পরিণত হয়েন, তখন সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, এবং সাধক পরমানন্দ-

---

(১) সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণাতি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।৩।২৯।১৩।

হেতুস্তু তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্ ভবেদপি।
সামীপ্যসার্ষ্টিসাযুজ্যসালোক্যানাং ন চেষণা॥
মৎসেবাতোঽধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কর্হিচিৎ।
সেব্যসেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি॥

দেবীভাগবতম্।৭।৩৭।১৩-১৪।

(২) স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।৩।২৯।১৪।

(৩) ইত্থং জাতা পরা ভক্তি র্যস্য ভূধর তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ॥

দেবীভাগবতম্।৭।৩৭।২৭।

স্বরূপে নিজ মহিমায় বিরাজিত হয়েন (১)। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা-সম্বরণ করিলে, তাঁহার প্রিয় সখা অর্জ্জুন, অতিশয় শোকাকুল হইয়া, দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হয়েন। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের লীলাসম্বরণ-রূপ হৃদয়বিদারক সংবাদ জানিতেন না। সেই জন্য তিনি, অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া, অর্জ্জুনকে তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অর্জ্জুন মর্ম্মন্তুদ সংবাদ সহসা মুখে আনিতে পারিলেন না। তিনি কেবল প্রিয়তম সখার করুণা স্নেহ প্রভৃতি গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে, প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার মন নির্ম্মল ও শান্ত হইয়া আসিল। কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের প্রাক্কালে, তিনি ভগবানের নিকট যে জ্ঞানোপদেশ শুনিয়াছিলেন, তাহা এতদিন কাল কর্ম্ম ও ভোগাসক্তি বশতঃ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বাসুদেবের চরণ-কমল ধ্যান

---

(১) (এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্ব্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি॥
যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্ব্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ॥
অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎপুনর্ভবঃ॥)
যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিসিদ্ধে স্বসম্বিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥
যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।৩।৩০-৩৪।

করিতেছিলেন বলিয়া, তাঁহার ভক্তি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার কামাদি সকল মলিনতা নষ্ট হইল, এবং তিনি পুনরায় সেই জ্ঞান লাভ করিলেন। ব্রহ্মসম্পৎ প্রাপ্ত হওয়ায়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়ায়, তাঁহার অবিদ্যা নাশ প্রাপ্ত হইল, এবং সেই হেতু সত্বাদি গুণও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। সেই জন্য, সূক্ষ্ম-দেহ-বিষয়ক জ্ঞানও দূর হইল, এবং স্থূল দেহ সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান থাকিল না। তাঁহার দ্বৈত-জ্ঞান-রূপ সংশয় ছিন্ন হওয়ায় তিনি শোক-মুক্ত হইলেন (১)। এই হেতুই দেবী-ভাগবত বলিয়াছেন যে,ভক্তির যাহা পরাকাষ্ঠা তাহাই জ্ঞান (২)। নিম্ন স্তরের ভক্তগণ সগুণ ভক্তির পথে নিজ নিজ অধিকার-অনুসারে চলিতেছেন, তাঁহাদিগকে একদিন পরা ভক্তি লাভ করিতে হইবে। পরা ভক্তিই ভক্তিমার্গের চরম। যাঁহারা সগুণ ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, এবং নির্গুণ ভক্তিযোগ বা পরা ভক্তির যথেষ্ট নিন্দা করেন, তাঁহাদের প্রশংসা করা যায় না।

---

(১) এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহম্।
সৌহার্দ্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাসীদ্ বিমলা মতিঃ॥
বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যানপরিবৃংহিতরংহসা।
ভক্ত্যা নির্ম্মথিতাশেষ-কষায়ধিষণোঽর্জ্জুনঃ॥
গীতং ভগবতা জ্ঞানং যত্তৎ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্ বিভুঃ॥
বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ।
লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।১৫।২৮-৩১।

(২) ভক্তেস্তু যা পরা কাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ॥
দেবীভাগবতম্।৭।৩৭।২৮।

কোন প্রকার কামনা পূরণের আশায় ঈশ্বরে যে ভক্তি করা যায়; তাহা বণিগ্‌বৃত্তি ভিন্ন কিছু নহে। বাসনা ত্যাগ না হইলে প্রকৃত ভক্তি জন্মিতে পারে না। যতক্ষণ বাসনার পূরণ না হয় ততক্ষণই এরূপ ভক্তের ভক্তি থাকে, আশামত ফল লাভ হইলেই সে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায় (১)। যেখানে স্বার্থের গন্ধ আছে সেখানে প্রকৃত ভালবাসা থাকিতে পারে না। সুতরাং বিরাগ না জন্মিলে, লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যে স্পৃহা দূর না হইলে (২), এবং ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ও আনন্দের আকর এরূপ অনুভব না হওয়া পর্য্যন্ত, যথার্থ ভক্তি আসিতে পারে না। ভগবান্ আর ইন্দ্রিয়সুখ, এ দুটীকে একসঙ্গে ভজনা করা সম্ভব নয়; একটীকে চাহিলে অপরটীকে ছাড়িতেই হইবে। কাজেই ইন্দ্রিয়-সুখের দিকে দৃষ্টি থাকিলে ভগবানের দিকে চাহিবার অবসর থাকে না। হিন্দিভাষায় একটা চলিত কথা আছে,—যেখানে রাম আছেন সেখানে কাম নাই, যেখানে কাম আছে সেখানে রাম নাই (৩)।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন, আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ে অনুরাগের নাম ভক্তি (৪)। মনকে জগতের ভোগ হইতে টানিয়া লইয়া, সমস্ত সত্তা আত্মচৈতন্যে ডুবাইয়া দিয়া, পরমানন্দে মাতোয়ারা হওয়ার নাম

---

(১) ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ।

নারদভক্তিসূত্রম্ ।২।৭।

(২) ওঁ নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারসন্ন্যাসঃ।

নারদভক্তিসূত্রম্ ।২।৮।

(৩) যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম,

যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।

(৪) ওঁ আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ।

নারদভক্তিসূত্রম্ ।৩।১৮।

আত্মরতি। এই আত্মরতিতে চিত্তের একটানা প্রবাহের নামই ভক্তি। অনেকের ধারণা এই যে, ঈশ্বরকে ভালবাসিলেই ভক্তির কার্য্য শেষ হইল, তাঁহার মাহাত্ম্য-বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নাই। কিন্তু, নারদভক্তিসূত্রের মতে, ভগবানের মাহাত্ম্য ভুলিয়া তাঁহার প্রতি যে ভক্তি করা যায়, তাহা ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের প্রতি উপপতির প্রীতির ন্যায় জানিতে হইবে (১)। ভগবানের মাহাত্ম্য না জানিলে, তিনি যে জীবগণের একমাত্র গতি, যাবতীয় কল্যাণ যে তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করে, সকল আনন্দের তিনিই যে একমাত্র প্রস্রবণ, এবং তিনিই যে একমাত্র নিত্য সত্যবস্তু, সুতরাং একমাত্র তাঁহার ভজন হইতেই নিত্যানন্দ লাভ হয়, এ জ্ঞান আসিতে পারে না। এ জ্ঞান যদি না আসে, তাহা হইলে যখন যখন তাঁহার ভজনে আনন্দ বোধ হয় তখন তখন জীব তাঁহার ভজন করে, আর অপর সময় বিষয়-সুখ লইয়া মত্ত হইয়া থাকে। ইহাতে ভগবানে একান্ত শরণাগতি আসে না। ব্রজগোপীগণ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রেম করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মাহাত্ম্য-জ্ঞান-পূর্ব্বকই করিয়াছিলেন, গোপীগণের উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই জানিতে পারা যায় (১)। তবে, যে সময়ে

---

(১) ওঁ ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ।

নারদভক্তিসূত্রম্ ।৩।২২।

ওঁ তদ্বিহীনং জারাণামিব। নারদভক্তিসূত্রম্ ।৩।২৩।

(১) যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।১০।২৯।৩২।

তাঁহাতে তন্ময়তা আসিয়া যায় তখনকার কথা পৃথক্। রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-সময়ে তন্ময়তা-প্রাপ্ত গোপীগণ প্রত্যেকেই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন।

সুতরাং, নিখিল জগতের আত্মরূপী ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ, (তাঁহার প্রীতির জন্যই কার্য্যের অনুষ্ঠান, জগতের হিতেই হিতজ্ঞান, জগতের প্রীতিতেই নিজের প্রীতি, এক কথায় ভগবানের সত্তায় আত্মসত্তা ডুবাইয়া দেওয়াই), প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ। এরূপ ভক্তিমান্ সাধকের চরিত্র কিরূপ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে,—যিনি কোন প্রাণীকে হিংসা করেন না, সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও দয়াশীল, যাঁহার "আমি আমার" জ্ঞান দূর হইয়াছে (অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নিজ ইন্দ্রিয়-সুখের অভিলাষে যে আসক্তি, তাহা যিনি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন), দুঃখ ও সুখে যাঁহার সমভাব (অর্থাৎ যিনি দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়েন না এবং সুখ লাভ করিলেও উৎফুল্ল হইয়া উঠেন না), যিনি ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যোগী এবং সংযতচিত্ত, ভগবানের বিষয়ে যাঁহার নিশ্চয় দৃঢ় হইয়াছে অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, যিনি ভগবানেই তাঁহার সমস্ত মন ও বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়াছেন, তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত। যিনি কাহারও কোন উদ্বেগের কারণ হন না এবং কাহারও ব্যবহার বা কার্য্য দেখিয়া নিজে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ পরশ্রীকাতরতা ভয় ও

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান সাত্বতাং কুলে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১০।৩১।৪॥

উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই ভগবানের প্রিয়। যিনি কাহারও কোন অপেক্ষা রাখেন না, বাহিরে ও ভিতরে পবিত্র, আলস্যশূন্য পক্ষপাতশূন্য, কোন প্রকার ক্লেশে যিনি উদ্বিগ্ন নহেন, এবং নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই বলিয়া যিনি কোন কার্য্যে উদ্যম করেন না, যিনি কোন প্রিয় বস্তু লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন না বা অপ্রিয় বস্তুর সংযোগে দ্বেষ করেন না, যিনি ইষ্টনাশে দুঃখিত হয়েন না বা কোন অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত। শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে, শীত ও গ্রীষ্মে, সুখ ও দুঃখে যাঁহার সমভাব, বিষয়ে যাঁহার আসক্তি নাই, নিন্দা ও প্রশংসা যিনি একইভাবে গ্রহণ করেন, যিনি বৃথা বাক্যালাপ করেন না, যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট হয়েন, কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে যিনি আবদ্ধ নহেন এবং যাঁহার চিত্ত কখনও চঞ্চল হয় না, এমন যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি তিনিই ভগবানের প্রিয় (১)। ইহাই হইতেছে প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। এই সকল গুণ যিনি যতটা আয়ত্ত করিতে পারিবেন, তিনি তত উত্তম ভক্ত হইবেন, নচেৎ শুধু মালা, ঝোলা, তিলক, ফোঁটা ধারণে ভক্ত হয় না।

---

(১) অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

আবার, আত্মশ্লাঘা-ত্যাগ, দম্ভ না করা, অন্যকে হিংসা না করা, ক্ষমা বা সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, অন্তরে ও বাহিরে পবিত্র থাকা, স্থিরতা, আত্মনিগ্রহ বা মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-ত্যাগ অর্থাৎ "আমি, আমার" এই ভাব ত্যাগ, জন্ম মৃত্যু জরা এবং ব্যাধিতে যে দুঃখ ও দোষ আছে তাহা দেখা, আসক্তিশূন্যতা, স্ত্রী পুত্র গৃহ প্রভৃতিতে অনাসক্তি, ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে চিত্তের সমতা রক্ষা করা অর্থাৎ উভয় অবস্থায়ই অবিচলিত থাকা, অনন্যমনে একমাত্র ভগবানে ভক্তি করা, নির্জ্জন স্থানে বাস, মনুষ্য-সমাজের কোলাহলে বিরাগ, সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানে থাকা এবং তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার প্রতি দৃষ্টি,—এই সকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে জ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়। এই সকল গুণ যাঁহার আছে তিনিই জ্ঞানী, আর যাঁহার নাই তিনি অজ্ঞানী (১)। এই সকল গুণ যিনি যত অধিক পরিমাণে নিজ চরিত্রে প্রতিফলিত করিতে পারিবেন তিনি তত উচ্চ

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১২।১৩-১৯।

(১) অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥

স্তরের জ্ঞানী হইবেন, নচেৎ 'সোঽহং' (আমিই সেই অর্থাৎ ব্রহ্ম), তত্ত্বমসি (তুমিই সেই অর্থাৎ ব্রহ্ম), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম) ইত্যাদি বাক্য শুধু মুখে আবৃত্তি করিলে এবং লোকের সঙ্গে ধর্ম্ম-বিষয় লইয়া বাদ-বিতণ্ডা করিলেই জ্ঞানী হয় না।

অতএব, তত্ত্বজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির চরিত্র ও প্রকৃত ভক্তের চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যাইতেছে না। বস্তুতঃ প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত ভক্তের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই।

আচার্য্য রামানুজের মতে, ভগবানের অর্চ্চা অর্থাৎ (ভগবানের গুণ ও কর্ম্ম প্রকাশক) মৃৎপ্রস্তরাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি অবলম্বনে প্রথমে আরাধনা করা স্থূলবুদ্ধি লোকদিগের কর্ত্তব্য। এই আরাধনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, ভগবানের বিভব অর্থাৎ রাম-কৃষ্ণাদি অবতারের অর্চ্চনায় তাহাদিগের অধিকার জন্মে। তদনন্তর বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ (১) ও প্রদ্যুম্ন এই ব্যূহচতুষ্টয়ের, তৎপর সূক্ষ্ম ব্রহ্মের এবং সর্ব্বশেষে অন্তর্যামী অর্থাৎ

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৩।৭-১১।

(১) শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সত্ত্বগুণযুক্ত চিত্ত মহত্তত্ত্বের স্বরূপ এবং তাহাই বাসুদেব নামে আখ্যাত, মহত্তত্ত্ব হইতে জাত অহঙ্কারই সঙ্কর্ষণ এবং ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর মনই অনিরুদ্ধ।

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥

সর্ব্বব্যাপী ও সকল ভূতের নিয়ামক আত্মার উপাসনা করিতে হয়,—এক কথায় স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে অগ্রসর হইতে হয় (১)। আচার্য্য রামানুজ ভক্তগণের সাধনার এই প্রকার ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতে ভগবান্ রামচন্দ্রের, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীচৈতন্যের পূজা সমধিক প্রচলিত আছে। তাঁহাদের পুণ্যনাম যাহাতে বিলুপ্ত না হয় এবং তাঁহাদের গুণ ও কর্ম্মের স্মরণ ও অনুকরণ দ্বারা (২) মানব যাহাতে

মহত্তত্ত্বাদ্ বিকুর্ব্বাণাদ্ ভগবদ্বীর্য্যসম্ভবাৎ।
ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যতে॥
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি॥
সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্ যমনন্তং প্রচক্ষতে।
সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্॥
... ...
বৈকারিকাদ্ বিকুর্ব্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত।
যৎ সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ত্ততে কামসম্ভবং॥
যদ্ বিদুঃ হ্যনিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকানামধীশ্বরম্।
শারদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।৩।২৬।২০, ২২-২৪, ২৬-২৭।

(১) অর্চ্চোপাসনয়াক্ষিপ্তে কল্মষেঽধি ততো ভবেৎ।
বিভবোপাসনে পশ্চাদ্ব্যূহোপাস্তৌ ততঃ পরম্।
সূক্ষ্মে তদনু শক্তঃ স্যাদন্তর্যামিনমীক্ষিতুম্।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহম্।

(২) যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা করাই এই সমুদায় অবতার-পূজার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রথম উদ্দেশ্যটী কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইলেও দ্বিতীয়টীর প্রতি লক্ষ্য করিতে খুব কম লোককেই দেখা যায়। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, প্রজাবাৎসল্য ও ব্রহ্মজ্ঞান; শ্রীকৃষ্ণের দুষ্টদমন, শিষ্টপালন, ন্যায়মর্য্যাদা, স্বজনপ্রীতি, শান্তিপ্রিয়তা, শৌর্য্য, বীর্য্য ও ব্রাহ্মীস্থিতি; এবং শ্রীগৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক স্মৃতি-পীড়িত ও আচার-সর্ব্বস্ব মৃতকল্প সমাজে প্রাণের সঞ্চার করিয়া মানবপ্রীতির সুগন্ধি ও সুকোমল পুষ্প দ্বারা জগন্নাথের অর্চ্চনা,—এই সকলের অনুকরণ কয় জনে করিতেছেন? এই সকল বিষয়ে অবহেলা

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৩।২২-২৩।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥

... ...

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আদির তৃতীয় পরিচ্ছেদ

করা হইতেছে বলিয়া, তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়াও সুখ শান্তি বা উন্নতি লাভ হইতেছে না।

ভগবানের চারি প্রকার ভক্ত আছেন:—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। এই চতুর্ব্বিধ ভক্তই উদারপ্রকৃতি, যেহেতু ইহারা সকলেই ভগবানের শরণাগত, কিন্তু ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত, কারণ তিনি বিষয়সকলের ভোগ হইতে চিত্ত সংযত করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট-গতিস্বরূপ যে ভগবান্, একমাত্র তাঁহারই আশ্রয় চিরদিনের তরে এবং সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানী সংযত-চরিত্র এবং কেবলমাত্র ভগবানেই নিষ্ঠাবান্, তাঁহার ভক্তি একমুখী—একমাত্র ভগবানে ব্যতীত আর কিছুতেই তাঁহার মনের গতি কখনও হয় না, এইজন্য জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠতম ভক্ত। তত্ত্বজ্ঞানী সাধকের ভগবান্ই একমাত্র প্রিয়তম বস্তু, তিনি ভগবান্কে নিজের প্রাণের প্রাণ বলিয়া জানেন, ভগবান্কে সর্ব্বক্ষণ নিজের আত্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করেন। এই অভেদভাবে মেশামিশিতে ভগবান্ যেমন তাঁহার প্রাণস্বরূপ, তেমনি ভগবানের প্রিয় পাত্র বলিয়া তিনিও ভগবানের প্রাণস্বরূপ। বহু জন্মের কর্ম্মফলে সাধকের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন তিনি দেখিতে পান, জগতের যাবতীয় বস্তু ভগবান্ বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে (১)—শ্রুতির ভাষায় সমস্তই ব্রহ্ম। বাস্তবিক, এইরূপ জ্ঞানের উদয় না হইলে, প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা প্রকাশ পায় না। আবার, জ্ঞানমার্গের সাধকও সরলপ্রাণে নিজ পথে অগ্রসর

---

(১) চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

হইলে, অবশেষে দেখিতে পান, তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ভক্তের লক্ষণরাশি তাঁহাতে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং ভক্তিমার্গ-গামীরা যে জ্ঞানবাদীদিগকে ঘৃণা করেন, এবং জ্ঞানবাদিগণও ভক্তির নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন, ইহা সমীচীন নহে। উচ্চ স্তরে আরোহণ করিলে, ভক্তও একমাত্র ভগবানেই মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেন, জ্ঞানীও তাহাই করেন, সুতরাং উভয়ের মনোবৃত্তি তখন একই প্রকারের হয়।

ভক্তিমার্গের ও জ্ঞানমার্গের নিম্ন স্তরের সাধকদিগের মধ্যে,—এবং যাঁহারা ইহার কোন পথেরই পথিক নহেন, কেবল শাস্ত্রের বচন মুখে আবৃত্তি করেন, তাঁহাদের মধ্যে—দীর্ঘদিন যাবৎ কলহ চলিয়া আসিতেছে। বাস্তবিকও ঐ দুই পথের গৌণ ভাবগুলি—প্রথম-পথিক-দিগের অনুষ্ঠেয় আচরণগুলি—সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। ভক্তিমার্গের সাধক-দিগের বাহ্য পূজা, জপ, স্তুতি, মালা তিলক সিন্দুরবিন্দু রক্তচন্দনের ফোঁটা বা বিভূতি ধারণ প্রভৃতি, আর জ্ঞানমার্গের সাধকদিগের বিষয়-বর্জ্জনে চেষ্টা, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ, শ্রবণ, মনন, স্বাধ্যায় প্রভৃতি কর্ম্মযোগের অঙ্গবিশেষ বই কিছুই নহে। এগুলি প্রকৃত ভক্তি বা প্রকৃত জ্ঞানের উদ্দীপনার সোপান মাত্র (১)। এই দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৭।১৮-১৯।

(২) সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৪।৩৩

মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু এইগুলি করিতে করিতে যতই সাধকদিগের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে থাকে ততই তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য কমিয়া যাইতে থাকে, বাহ্য অনুষ্ঠান ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আরাধ্য বস্তুর ধ্যান প্রভৃতির আধিক্য হইতে থাকে, এবং তন্ময়ত্ব-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বাহ্য পার্থক্য দূর হয় ও সকলে একই ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। মানুষসকল যখন বিভিন্ন প্রকৃতির তখন তাহাদের বিভিন্ন পথ অবলম্বন স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাদের গন্তব্য স্থানের বিষয়ে ধারণা থাকা আবশ্যক, এবং কোথায় যাইতেছে, কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রতিও তীব্র দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এরূপ করিলে, অযথা যে বিবাদ-বিসম্বাদ হইতেছে এবং পরস্পরের নিন্দাবাদে গগনমণ্ডল যে মুখরিত হইতেছে, তাহা থামিয়া যাইবে ও নির্ব্বিবাদে শান্তমনে সকলেই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

এই প্রকৃত ভক্তি মানুষের যখন লাভ হয়, তখন ভক্তি-মন্দাকিনীর অমৃত-প্রবাহে অবগাহন করিয়া, চিরতরে তাহার মনপ্রাণ শীতল হয়, তাহার জীবন ধন্য হইয়া যায়।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।৪।৩৯।

পরাভক্তেঃ প্রাপিকেয়ং ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাৎ।
পূর্ব্বপ্রোক্তে হ্যভে ভক্তী ন পরপ্রাপিকে মতে॥

শ্রীশ্রীদেবীগীতা ।।৭।১০।

ভক্তেস্তু যা পরা কাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ॥ ঐ ।৭।২৮।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:•:—

পঞ্চরস, পঞ্চমকার, পঞ্চতত্ত্ব।

বৈষ্ণবের ভক্তিশাস্ত্রে পঞ্চ রসের এবং শাক্তগণের তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ মকারের সাধন বিহিত হইয়াছে। ভক্তিতত্ত্বের বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে, এই দুই বিষয়ে এবং পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রকৃত ভক্তি বা পরা ভক্তি কি তাহা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত হইতে সেই স্থানে পাদটীকায় যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, কোন প্রকার কামনা না করিয়া এবং ভেদদর্শী না হইয়া, ভক্ত সর্ব্বভূতের আত্মা-রূপী ভগবানে যে একান্ত ভালবাসা বর্ষণ করেন, তাহাই পরা-ভক্তি। এই ভক্তির আলোকেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত রসের আস্বাদ লইয়া থাকেন। প্রথমে পঞ্চরসের বিষয়ই লিখিত হইতেছে।

পঞ্চরস।

রস,—যাহার আস্বাদ পাওয়া যায়, যাহা আস্বাদ্য। মানুষ যে বিষয়ভোগে ডুবে আছে, ইহার কারণ সে ইহাতে একটা রস পায়, সেই রসে সে মাতোয়ারা হ'য়ে থাকে। এই রসের আস্বাদ তাহার মনে থাকে; এবং এই রসের আস্বাদের জন্য যে লালায়িত, সে মৃত্যুর পরও আবার উহা (ঐ রস) আস্বাদনের নিমিত্ত পৃথিবীতে আসিয়া জন্মে।

সংসারে দেখা যায়, কেহ বা পরের উপর আধিপত্য করিতে ভালবাসে, কেহ বা পরের অধীনে থাকিয়া তাহার আজ্ঞামত কাজ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, কেহ বা পিতামাতাকে প্রাণের দেবতা তুল্য মনে করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া সুখী হয়, কেহ বা সমবয়স্ক

ও সমভাবের লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া জীবন ধন্য মনে করে, কেহ বা পুত্র-কন্যাকে একান্ত স্নেহ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করে, কেহ বা দাম্পত্যসুখে বিভোর হইয়া থাকে। এই প্রকারের একটা না একটা ভাব এক এক জনের মধ্যে প্রবল। সে ভাবটা যে কেহ বড় চেষ্টা করিয়া নিজের মধ্যে আনে, তা' নয়। স্বভাবতঃই যেন এক একটা ভাব এক এক জনকে যথাসময়ে আশ্রয় করিয়া বসে।

লৌকিক জগতে এই বিষয়ে যাহা দেখি, সাধনা-রাজ্যেও তাহার অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। হনুমান্ দাসভাবে ভগবান্‌কে ভজনা করিতেন; "তুমি প্রভু আমি দাস" এই তাঁহার ভাব। নন্দ-যশোদা ভগবান্‌কে পুত্রভাবে, অর্জ্জুন সখা-ভাবে, গোপীগণ মধুর ভাবে (স্বামীভাবে), ভজন করিতেন।

এই ভাবগুলিতে যে যে রসের আস্বাদন হয়, ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাহা পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। আদিতে শান্তভাব। সাধক দীর্ঘ তপস্যার পর যখন সর্ব্বত্র সেই ভগবানের সত্তা অনুভব করেন, তখন তাঁহার পরম শান্তি লাভ হয়। দেহাত্মবুদ্ধির অবসান ও ভেদবুদ্ধির ক্ষয় হওয়ায় জাগতিক-বিষয়-ভোগের বাসনারূপ বায়ুর চিরনিবৃত্তি হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়বৃত্তির দুর্দ্দমনীয় তরঙ্গও থাকে না। প্রবল বায়ু হেতু নদীতে যখন ভয়ানক তরঙ্গ উঠে তখন নদী অতিশয় চঞ্চল হয়, এ তাহার অশান্ত অবস্থা; আবার যখন বায়ুর নিবৃত্তি হয়, তরঙ্গ থামিয়া যায়, তখন নদী এক শান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করে,——সে সময় কি এক মনোহর দৃশ্য দেখা যায়! সেই প্রকার যখন সাধক সর্ব্বভূতে ভগবানের সত্তা প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার আর আপন-পর থাকে না, শত্রু-মিত্র থাকে না, জয়-পরাজয় থাকেনা, সুখদুঃখ থাকে না, কারণ সর্ব্বত্রই সেই এক সচ্চিদানন্দ-সত্তা তাঁহার চক্ষুতে ভাসিতে থাকে, তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিতে থাকে

কাজেই তখন তিনি এক অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে ভাসিতে থাকেন; কিন্তু সে আনন্দে কোন উদ্বেল তরঙ্গ নাই, প্রশান্ত অবস্থা, যেন স্থির নিস্তব্ধ সমুদ্র! ইহাই শান্তভাব, এই অবস্থায় যে রস পাওয়া যায় তাহাই শান্তরস। ভগবান্‌কে লাভ করিলে ভক্তের প্রথম এই অবস্থা হয়।

কিন্তু এ অবস্থায় ভক্ত দেখেন, সর্ব্বত্র একই সত্তা অনুভব করা সত্ত্বেও তাঁহার একটা পৃথক্ সত্তা রহিয়াছে, তাহা না হইলে এ রস আস্বাদন করে কে, এ অনুভূতি হয় কাহার? তিনি তখন দেখেন যে, সেই অনন্ত সত্তা তাঁহাকে যেন ভিতর ও বাহির দুই দিক হইতে চালাইয়া লইতেছে, তিনি যেন সেই অনন্ত-সত্তার শক্তির হস্তে একটি খেলার পুতুলের মত নাচিতেছেন। তিনি তখন বলিয়া উঠেন, "দাসোহহং," আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রভু। তখন তিনি বলেন, "আমি যন্ত্র আর তুমি যন্ত্রী: হে হৃষীকেশ, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যে ভাবে চালাইবে, আমি সেই ভাবে চলিব" (১)। এই হইতেছে দাস্যভাব, এই ভাবে স্থিত ভক্ত দাস্যরসে পুলকিত হয়েন, জীবনের সর্ব্ববিধ কার্য্যে ভগবানের হাত দেখিয়া কৃতার্থ হয়েন। ইহাই ভক্তের দ্বিতীয় অবস্থা।

ভগবানের খেলা চলিতেছে। ক্রমে ভক্তের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়াতে, তিনি আপনার সেই পৃথক্ সত্তাকে ভগবানের সত্তার সহিত সমভাবাপন্ন দেখিতে পান; তখন তিনি ভগবান্‌কে আর প্রভুভাবে না দেখিয়া বন্ধুভাবে দেখিতে থাকেন। ভগবান্ তখন তাঁহার সখা; তিনি যেখানেই যান, ভগবান্ যেন দেহধারী সখার

(১) "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। জগতের নর-নারী, বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, প্রভৃতি সকলের মধ্যেই তখন সেই বন্ধু-ভাবের সাক্ষাৎ হয়। সকলেই বন্ধু, সকলেই যেন তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য, তাঁহার সুখ-বৃদ্ধির নিমিত্ত, ব্যস্ত। তিনি আর কাহাকেও নিজের চেয়ে বড় দেখেন না, কিম্বা ছোটও দেখেন না, সকলেই তাঁহার সমান। এই ভাবে সাধক সখ্যরসের আস্বাদন করেন। ইহাই ভক্তের তৃতীয় অবস্থা।

লীলাময়ের লীলা চলিতেছে, ভক্তের ভাবও বদলাইয়া যাইতেছে। তিনি আর একটু অগ্রসর হইলেন; তখন তিনি আপনাকে ভগবানের চেয়ে বড় দেখিতেছেন,——তখন ভগবানে তাঁহার অতিশয় মমতা জন্মিয়াছে; পিতা মাতা যেমন সন্তানের লালন-পালন করেন, সেই প্রকার তিনিও তখন স্নেহে বিভোর হইয়া ভগবান্‌কে যেন লালন-পালন করিতে চাহেন। তাঁহার হৃদয় তখন স্নেহ-রসে ভিজিয়া গিয়াছে, তাই তিনি একেবারে কোমল হইয়া গিয়াছেন। তিনি যাহার দিকে চাহেন, যাহাকে দেখেন, সেই যেন তাঁহার সন্তান; তাহার দিকেই তাঁহার প্রাণের ভালবাসা ধাবিত হয়, তাহার কিসে সুখ ও মঙ্গল হয় সেই চিন্তায়, সেই চেষ্টায়, তিনি বিভোর হইয়া পড়েন। ইহাই চতুর্থ অবস্থা, এবং এই অবস্থায় সাধক বাৎসল্য-রসের আস্বাদ লাভ করেন।

ভগবানের খেলা গাঢ় হইতে গাঢ়তর ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। এইবার পঞ্চম অবস্থা উপস্থিত, এইবারে কান্ত-ভাবের ভজন। ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে এইবার দাম্পত্য-প্রণয় স্থাপিত হইয়াছে,—— ভগবান্ স্বামী, ভক্ত স্ত্রী; ভগবান্ পুরুষোত্তম, ভক্ত পরা প্রকৃতি (১)।

---

(১) ইহা বাস্তবিক দ্বৈত-ভাব নহে, ভজনানন্দ-সম্ভোগের জন্য দ্বৈতের আভাস মাত্র। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন।

ভক্ত ও ভগবানে যেন কোন পার্থক্য নাই, অথচ একটা পৃথক্ সত্তাও যেন বোধ আছে ; উভয়ে যেন উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, এক জনের অভাবে যেন অন্যের চলে না। সতী নারী যেমন পতিগত-প্রাণা, পতির সুখ ও পতির মঙ্গলই যেমন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র ধ্যানের বস্তু, ভক্তেরও তখন তেমনি অবস্থা হয় ; এবং পতিব্রতা সতী যেমন আবশ্যকমত কখনও দাসী হইয়া, কখনও সখী হইয়া, কখনও মাতা হইয়া, কখনও বা পত্নী হইয়া, পতির সেবা করেন, সেইরূপ ভগবানের সহিত খেলার এই অবস্থায় সাধক কখনও বা কাহাকে প্রভু ভাবিয়া ভৃত্যভাবে তাঁহার সেবা করেন, কখনও বা কাহারও সহিত সখার ন্যায় আচরণ করেন, কখনও বা কাহাকে সন্তান-জ্ঞানে প্রতিপালন করেন. কখনও বা কাহাকেও স্বামীর আসনে বসাইয়া পত্নীর ভাব লইয়া তাঁহাকে সেবা করেন। এ সব ভাবেরই খেলা, লৌকিক স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় দেহ-সম্বন্ধ ইহাতে নাই, কারণ

ন হি শক্তিঃ কচিৎ কচিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা।
শক্তিশক্তিমতশ্চাপি ন বিভেদঃ কদাচন ॥ পঞ্চদশী।

ভক্ত তখন দেহাভিমানী নহেন, সুতরাং দৈহিক-ভাবে তাঁহাকে স্ত্রী বলা চলে না। জীবভাবের দিক্ দিয়া দেখিলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে তাঁহাকে প্রকৃতি বলা যায়।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৭।৪-৫।

দেহাত্মবুদ্ধি পূর্ব্বেই দূর হইয়াছে (১)। এই অবস্থায় তাঁহার একই হৃদয়ে নানা ভাবের জোয়ার খেলিতে থাকে। এই সম্বন্ধ বড়ই মধুর, সুতরাং এই অবস্থায় যে রসের আস্বাদন হয় তাহা "মধুর রস" বলিয়া খ্যাত। ভগবানের সহিত ভক্ত মিশিয়াও মিশিতেছেন না, এক হইয়াও দুই রহিয়াছেন। এ এক অপূর্ব্ব খেলা; এ খেলায় যে রসের আস্বাদন হয়, তাহা যিনি এই অবস্থার নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন তিনিই কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারেন।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,—ভগবান্‌কে সম্ভোগ করার এই পাঁচটী অবস্থা। সংসারের মূলীভূত কারণ বাসনার বিনাশ হইলে চিত্ত প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে, ভেদজ্ঞান দূর হইয়া যায়, তখন এক ভগবানের সত্তাই সর্ব্বত্র আপনা আপনি প্রকাশিত হয়। ইহাই ভগবৎসাক্ষাৎকার। এই সময়ে ভক্তের হৃদয় অতি প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে, সাধকের নিজের আর কোনও পৃথক্ সত্তা থাকে কি না এরূপ বোধও যেন থাকে না। এই অবস্থায়, কাজেই, কোন খেলা চলে না। ইহার পরই ভক্ত ও ভগবানে খেলা আরম্ভ হয়। দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত আর খেলা কাহার সহিত হইবে? দেখা হইয়া কিছুদিন একত্র বাস হইলে, তবে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাই দাস্য,

---

(১) পরম ভাবে ডুবিয়া গেলে সাধকের কি অবস্থা হয় তাহা, বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে, একবিংশ অনুচ্ছেদে, এইরূপ বর্ণিত আছে, "যেমন কেহ প্রিয়তমা স্ত্রী দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে কি বাহ্য কি আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না, সেইরূপ জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে কি বাহ্য কি আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না।" এখানে ব্রহ্মই যেন প্রিয়তমা রমণী। ইহা ভক্তের ধারণা বা দর্শনের অবস্থা মাত্র।

সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী হইতেছে ভগবান্‌কে লইয়া ভক্তের খেলার বা ভজনের অবস্থা। ভগবান্ সংসারে যে খেলা খেলিতেছেন, তাহা যিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারিবে ?

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, সংসারে প্রবেশ করিবার নিয়ম ছিল। তাহা করিলে ভগবানের খেলা দেখা যায়, তাঁহার সঙ্গী হইয়া তাঁহার সহিত খেলা যায়, তখন সংসার আনন্দ-কানন হয়। আর, এই ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া সংসারে প্রবেশ করিলে কি যে জ্বালা ভোগ করিতে হয়, তাহা ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ মানবের অবিদিত নাই। এই জন্যই আগে সাধনা করিয়া শান্ত-রসের আস্বাদ লওয়া চাই, তাহার পর সংসারে প্রবেশ করিলে ভগবানের পরিচর্য্যা করিয়া, ভগবানের সহিত নানা সম্বন্ধ স্থাপনের সুখ সম্ভোগ করিয়া, মানুষ কৃতার্থ হইতে পারে। অনুমানে সম্বন্ধ স্থাপন করায় প্রকৃত রসের আস্বাদন পাওয়া অসম্ভব। আমরা বেদে দেখিতে পাই, "একই দেবতা সর্ব্ব পদার্থে গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা-স্বরূপ, কর্ম্মফল-দাতা ও সর্ব্বভূতের আশ্রয়, তিনি যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, চৈতন্যময়, অদ্বিতীয় ও নির্গুণ বস্তু। তিনি জ্ঞান-শক্তি-যুক্ত, তিনি নিষ্ক্রিয় পদার্থসমূহের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি-স্বরূপ এবং মায়া দ্বারা একই আত্মাকে বহুবিধ আকারে প্রকাশিত করেন। সেই আত্মাকে যাঁহারা দর্শন করেন তাঁহারাই শান্তি পান, অপরের শান্তি লাভ হইতে পারে না (১)।" সেই দেবতার সন্ধান পাইয়া যিনি সংসারে

(১) "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

প্রবেশ করেন, তিনি দেখেন, তাঁহার পিতা মাতা ও অপর গুরুজন, তাঁহার ভাই ভগ্নী ও বন্ধুগণ, তাঁহার পুত্র কন্যা ও স্নেহের পাত্রগণ, তাঁহার প্রণয়-পাত্রী পত্নী, এই সকল রূপ ধরিয়া একই নিরঞ্জন আত্মা বিরাজ করিতেছেন; ব্যবহারিক জগতের ভাবে, প্রাণের প্রীতি সহকারে ও অকপটে তাঁহাদের সহিত যথাযোগ্য আচরণ করিয়া, তিনি তাঁহাদের অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত সেই ভগবানেরই সেবা বা পূজা করিতেছেন। পিতা মাতা ও অপর মাননীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহার দাস্য-ভাব, ভ্রাতা ভগ্নী ও বন্ধুগণের সহিত ব্যবহারে তাঁহার সখ্য-ভাব, পুত্র-কন্যাদির সহিত ব্যবহারে তাঁহার বাৎসল্য-ভাব, এবং পত্নীর সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহার মধুর-ভাব (১) বা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। গৃহস্থ সাধুর পক্ষে ইহাই পঞ্চরসের আস্বাদন। মানব, বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর, যদি সংসারে প্রবেশ করে তাহা হইলে, সংসারের সকল কাজ করিয়াও, এইরূপে ভজনানন্দে কালাতিপাত করিতে পারে। অহো, যদি অধিকাংশ সংসারী ব্যক্তিরই এইরূপ জ্ঞান হইত, তাহা হইলে সংসারে কি শান্তি ও সুখের ধারা প্রবাহিত হইত! মানব "আমি, আমার" এই জ্ঞান লইয়া ও প্রতিদানের পূর্ণ আশা সহ পিতা মাতা পুত্র কন্যা প্রভৃতির সেবায় নিযুক্ত হয়, তাই তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। তত্ত্ব-জ্ঞানী গৃহস্থ ক্ষুদ্র কেন্দ্রে যে সাধনা আরম্ভ করেন তাহাই ক্রমে সমস্ত

একো মনীষী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং সন্তং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মানং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥
ব্রহ্মোপনিষৎ।২৯-৩০।

(১) স্বামীর প্রতি অনুরক্তা স্ত্রীর ভাবকে যেমন মধুর ভাব বলা হয়, সেইরূপ স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত স্বামীর ভাবকেও মধুর ভাব বলা যায়।

জীবে, সমস্ত জগতে, ছড়াইয়া পড়ে, এবং সেই অবস্থার কথাই ইতি-পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিয়াই, কেহ কেহ ভগবানের স্থূল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের কোন একটী ভাব লইয়া ভজনা করিয়া থাকেন, ইহাকে অনুমানে ভজন বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বা প্রতিমায় আরোপিত দেবতার সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন, কিন্তু সেই পরম দেবের সত্তা যে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বভূতেই অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা চাহিতেছেন সে বিষয়ে উদাসীন থাকেন, যেন তাঁহার উপাস্য দেবতা ঐ প্রতিমার বাহিরে আর কোথায়ও নাই, এরূপ ভক্তের ভজন যে একদেশী মাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, যাঁহারা সর্ব্বব্যাপী অচিন্ত্য ও অব্যক্ত কূটস্থের সাধনা করেন, তাঁহাদিগকেও সর্ব্বভূতের হিতে রত হইতে হয় (১)।

বৈষ্ণব-মতে মধুর রসের সাধনে, শাক্তদিগের মৈথুন-তত্ত্বের ন্যায়, শৃঙ্গার-রসের সাধনের কথা আছে। এ বিষয়ে বৈষ্ণব-গ্রন্থ বিবর্ত্ত-বিলাসের পঞ্চম বিলাসে অতি সরল ভাষায় সবিশেষ বর্ণনা দেওয়া আছে, সুতরাং তাহার ভাব না দিয়া, সেই পংক্তিগুলিই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

---

(১) যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১২।৩-৪।

বাণেতে প্রবর্ত্ত গুণে সাধক করণ।
অষ্ট কাল অষ্ট প্রহর মধুর ভজন॥

*　　*　　*

বাণ আর গুণ ভাই পুরুষ প্রকৃতি।
ভাবেতে শৃঙ্গার তা'তে হবে নিতি নিতি॥

*　　*　　*

যোনিতে লিঙ্গেতে শৃঙ্গার করে ভাই সবে।
করুক যথেষ্ট কেনে তা'তে কিবা হবে?
পশু পক্ষী জীবাদিতে করয়ে শৃঙ্গার।
প্রাপ্তি হইবে হেন করণে তাহার?
আত্মায় আত্মায় যেবা করয়ে রমণে।
রসিকের শিরোমণি জানি হেন জনে॥
আর সে শৃঙ্গার আর ভাবেতে শৃঙ্গার।
ভাবেতে শৃঙ্গার আছে বহু মত তা'র॥
এ সব কহিতে মোর প্রাণ ফেটে যায়।
অতএব সে সাধন কহা নাহি যায়॥
মধুরেক বটে তা'র শৃঙ্গার করণ।
পথে চলে ঘাটে মাঠে করয়ে সাধন॥
শৃঙ্গার সাধন বিনে কিছু নাহি করে।
মানুষ আশ্রয় হ'য়ে সদত বিহরে॥
ব্রজের স্বভাবে তা'র নিরবধি মন।
নির্ম্মল সে অনুরাগে রহে হেন জন॥
বিশ্রাম নাহিক তা'র এক তিল মাত্র।
নিত্য ধাম যাইবার তেঁহ হন পাত্র॥

তা'র বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে নাহি বুঝে।
স্পষ্ট করি লেখে তাহা চাঁদ কবিরাজে॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য লীলার ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে আছে :—)

সেই নবাঙ্কুর প্রেম যা'র চিত্তে হয়।
তা'র বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥

উদ্ধৃত অংশে যে ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, উত্তর গীতার প্রথম অধ্যায়ে "হংস" এই আত্মমন্ত্রের সর্ব্ব সময়ে সাধনা দ্বারা সেইরূপ ক্রিয়ারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে (১)।

বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে এক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে এক প্রকার পঞ্চ রসের সাধনা প্রচলিত আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চ রসের সাধনা তাঁহারা করেন না। তাঁহাদের সেই পঞ্চ রসের সাধন শিষ্ট জনগণের রুচি-বিরুদ্ধ বলিয়া, তাহার নাম ব্যাখ্যা প্রভৃতি কিছুই এ স্থানে দেওয়া গেল না। বৈষ্ণব-গ্রন্থ বিবর্ত্ত-বিলাসে ও স্বরূপ দামোদরের কড়চায়ও ঐ জাতীয় সাধনার বহু নিন্দা আছে। নিতান্ত অল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতক

---

(১) আত্মমন্ত্রস্য হংসস্য পরস্পরসমন্বয়াৎ।
যোগেন গতকামানাং ভাবনা ব্রহ্ম উচ্যতে॥
শরীরিণামজস্যাস্তং হংসত্বং পরিদর্শনম্।
হংসো হংসাক্ষরঞ্চৈতং কূটস্থং যত্তদক্ষরম্।
যদ্বিদ্বানক্ষরং প্রাপ্য জহ্যান্মরণজন্মনী॥
কাকীমুখককারান্তো হুকারশ্চেতনাকৃতিঃ।
অকারস্য চ লুপ্তস্য কোঽয়মর্থঃ প্রতিপদ্যতে॥
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ সদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরম্।
সর্ব্বকালপ্রয়োগেণ সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ॥ উত্তরগীতা।১।৫-৮।

লোক, প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব না জানায়, ধর্ম্মাচরণ বোধে ঐ সাধনা করিয়া থাকেন। উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

পঞ্চ মকার।

শাক্ত-সম্প্রদায়ের পাঁচটী সাধনোপকরণের নামেরই আদ্য অক্ষর "ম", এইজন্য "পঞ্চ মকার" বলিতে সাধনার পাঁচটী উপকরণ বুঝায়। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটীকে পঞ্চ মকার বলে। এই শব্দগুলি উচ্চারণ করা মাত্র যাহা যাহা বুঝায়, সাধারণ লোকে ঐ শব্দগুলির সেই অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকে। কতক লোকের মত এই যে, তন্ত্রে যখন এই সকলের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন উহা অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে, নচেৎ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা যাইতে পারে না; আবার কেহ কেহ এইগুলিকে অতিশয় ঘৃণা করেন, এবং উহা ধর্ম্ম-পথের একান্ত বিরোধী ও অনিষ্টকর এই মত প্রকাশ করেন। যাহাই হউক, এই পঞ্চ মকার সহ যে সাধনা তাহা প্রবৃত্তিমার্গের সাধনা। এই প্রকার সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, সাধক প্রবৃত্তিমার্গের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সাত্ত্বিক বা দিব্য পঞ্চ-মকার-রূপ নিবৃত্তিমার্গের সাধনায় পৌঁছিবে।

তন্ত্র-শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সাধকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—পশুভাবের সাধক, বীরভাবের সাধক ও দিব্যভাবের সাধক। তমোগুণী সাধকের পশ্বাচার, রজোগুণী সাধকের বীরাচার ও সত্ত্বগুণী সাধকের দিব্যাচার। পঞ্চ মকারও তিন প্রকারের আছে:—তামসিক বা পশ্বাচারের পঞ্চ মকার, রাজসিক বা বীরাচারের পঞ্চ মকার ও সাত্ত্বিক বা দিব্যাচারের পঞ্চ মকার।

তামসিক পঞ্চ মকার বা পশ্বাচারের পঞ্চ মকারে মদ্য মাংসাদির পরিবর্ত্তে (১) মধু, ফল, মূল, শাক ইত্যাদি দিতে হয়। ব্রাহ্মণগণের পক্ষে দুগ্ধ, ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ঘৃত, বৈশ্যগণের পক্ষে মধু ও শূদ্রগণের পক্ষে ধান্যাদি-জাত মদ্যই, মদ্য (২)। লবণ, আদা, পিষ্টক, তিল, গম, মাষকলাই ও রশুনই মাংস (৩)। উত্তমরূপে দগ্ধ শ্বেতবর্ণ বেগুন, লাল মূলা, রক্তবর্ণ পাকা আমড়া, বাতাবি লেবু, কাগজি লেবু, ভিজে মসূর কলাই, পানিফল, কন্‌কা শাক ও লালবর্ণ তিলই মৎস্য (৪)। ধান্য চাউল গম ইত্যাদি ভাজা হইলে, তাহা তামসিক ও রাজসিক উভয়বিধ মুদ্রারই কার্য্য করে (৫)। হস্তদ্বয় দ্বারা কূর্ম্ম-মুদ্রা

---

(১) পশুভাবেন দেবীনাং যজনার্থং ফলাপ্তয়ে।
অনুকল্পমিতি প্রোক্তং দ্রব্যপ্রতিনিধৌ দদেৎ॥
ভৈরবযামলতন্ত্রম্।

(২) গোক্ষীরং ব্রাহ্মণো দদ্যাৎ দ্রব্যমাজ্যঞ্চ বাহুজঃ।
বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং দ্রব্যং শূদ্রঃ পৈষ্টাদিকং পুনঃ॥
কুলচূড়ামণিতন্ত্রম্।

(৩) লবণাদ্রকপিণ্যাকতিলগোধূমমাষকম্।
লশুনঞ্চ মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ। সময়াচারতন্ত্রম্।

(৪) সুদগ্ধং শ্বেতবৃন্তাকং রক্তমূলকমেব চ।
রক্তমাম্রেতকং ফলং বাতাপি নিম্বুকং ফলম্॥
স্বিন্নং মসূরং শৃঙ্গাটং রক্তশাকং তিলারুণম্।
মীনানুকল্পং দেবেশি পশূনামর্চ্চনে শিবে॥ কৈলাশতন্ত্রম্।

(৫) ভর্জ্জধান্যাদিকং যদ্যচ্চর্ব্বণীয়ং প্রচক্ষ্যতে।
সা মুদ্রা কথিতা দেবি সর্ব্বেষাং নগনন্দিনি॥
যোগিনীতন্ত্রম্।

করিয়া তাহা দ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিলেই মৈথুনের কার্য্য হইল (১)।

রাজসিক পঞ্চমকার বা বীরভাবের পঞ্চমকারে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটী শব্দ দ্বারা লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহাই ব্যবহৃত হয়। কোন্ কোন্ পশুর মাংস, কি কি মৎস্য, কিরূপ মদ্য ইত্যাদি, কোন্ কোন্ তিথিতে এবং কিরূপ সময়ে ব্যবহার করিতে হয়, ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহারের ক্রম পরিমাণ ও যথাযোগ্য সাবধানতা, এবং তৎসঙ্গে আদ্যাশক্তির বিভিন্ন মূর্ত্তির পূজা ও মন্ত্র-জপ প্রভৃতির ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। তাহা লঙ্ঘন করিলে নরক হয় অর্থাৎ পতন হয়, আর ঠিক ঠিক ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে শাস্ত্রের আদেশ মত সাবধানে কার্য্য করিলে, ধীরে ধীরে হৃদয়ের মলিনতা ও ভোগের বাসনা দূরীভূত হওয়ায়, চিত্তে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এরূপ হইলে, সাধক তখন সাত্ত্বিক পঞ্চমকারের দ্বারা সাধন করেন; এই প্রকার পঞ্চমকারে তখন তাঁহার রুচি ও প্রয়োজন থাকে না।

সাত্ত্বিক পঞ্চ মকার বা দিব্য ভাবের পঞ্চ মকারে, ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্রার পদ্ম হইতে যে অমৃত-ধারা ক্ষরণ হয়, তাহাই মদ্য (২)। "মা" শব্দে জিহ্বা বুঝায়, তাহার অংশ বাক্য; এই জিহ্বার অংশ অর্থাৎ বাক্য ভক্ষণ করার (বাক্য সংযম করার) নাম মাংস ভক্ষণ (৩)।

---

(১) করকচ্ছপিকাং কৃত্বা দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
কথিতা দেবদেবেশি পূজা মৈথুনসম্ভবা॥ ভৈরবসংহিতা।

(২) সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥ আগমসার-তন্ত্রম্।

(৩) মা শব্দাদ্ রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥ ঐ।

ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী গঙ্গা ও যমুনা নামে খ্যাত, তাহাতে যে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম মৎস্য ; সেই শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করা অর্থাৎ কুম্ভক করার নাম মৎস্য ভক্ষণ (১)। সহস্রার-মহাপদ্মে কর্ণিকা-মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র আছে, তাহাতে অতি উজ্জ্বল, সুশীতল এবং পারদের ন্যায় নির্ম্মল যে আত্মা আছেন, তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়ার নাম মুদ্রা সাধন (২)। মণিপুরে "র" আছে এবং বিন্দুরূপ মহাযোনিতে "ম" আছে, অকাররূপ হংস দ্বারা অর্থাৎ শ্বাস দ্বারা যে সময় ঐ উভয়ের একতা সাধিত হয়, সে সময়ে সাধকের পরমানন্দ লাভ হয় ও সুদুর্ল্ভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ইহাই মৈথুন-তত্ত্ব (৩)।

---

(১) গঙ্গাযমুনায়োর্ম্মধ্যে দ্বৌ মৎস্যৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥ আগমসারতন্ত্রম্

(২) সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥ ঐ।

(৩) মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্র্হ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্।
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসকুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
মকারশ্চ বিন্দুরূপমহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
অকারহংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাত্ত্বিক পঞ্চ মকার বা দিব্যাচারের পঞ্চ মকার উত্তম যোগ-সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং ইহাই পরমপদ পাইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু, যিনি সাত্ত্বিক গুণের আধিক্য লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি এই যোগ সাধন করিতে কখনও সক্ষম হন না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাদেব দেবী ভগবতীকে বলিয়াছেন, "কলিতে জীব শিশ্নোদর-পরায়ণ। বীরাচারের পঞ্চ মকারের মধ্যে মদ্য ও মৈথুন সাধন তাহারা করিতে পারিবে না; ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া অতিরিক্ত মদ্যপানে আসক্ত হইয়া পড়িবে, এবং নারীকে শক্তিরূপে জানিতে না পারায় কামাতুর হইয়া স্ত্রী-সঙ্গম করিবে। এজন্য দেবীর পূজায় মদ্যের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ চিনি ও মধু নিবেদন করিবে, এবং মৈথুনের পরিবর্ত্তে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে" (২)। স্থানান্তরে তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, ভোজন ও মৈথুন মানবের স্বভাবতঃই প্রিয়; অতএব, মানবের

মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ম্।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্॥

আগমসার-তন্ত্রম্।

(২) গৃহকার্য্যৈকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ
আদ্যতত্ত্বপ্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ম্॥
দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্।
অলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ॥
স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতসঃ।
তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ॥

হিতসাধনের নিমিত্ত, তাহার (ভোজন-মৈথুনের) সংক্ষেপ করিয়া, শৈবধর্ম্মে তাহার সীমা নিরূপিত হইয়াছে (১)। তবে পঞ্চমকার-সম্বন্ধীয় যে বীরাচার বা কুলাচারের সাধন তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর যোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে আচরণ করিতে যাওয়া বিনাশের হেতু ও হঠকারিতা মাত্র। তন্ত্রে উক্ত আছে যে, এই সাধন তীক্ষ্ণ খড়্গ-ধারার উপর দিয়া গমন, ঘোর হিংস্র ব্যাঘ্রের কণ্ঠাবলম্বন এবং বিষধর সর্প ধারণ অপেক্ষাও দুঃসাধ্য ও ভয়াবহ (২)। সুতরাং এই পথে গমন করিবার অধিকারী কে আছেন ?

সত্যের অনুরোধে এখানে কয়েকটী কথা বলা একান্ত আবশ্যক। যাহাদের অন্তঃকরণ দুর্ব্বল, তাহারা সহজেই ইন্দ্রিয়-সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া যায়। মদ্য-পান ও মাংস-ভক্ষণ, পরস্ত্রী-গমন বা বিধান-বহির্ভূত-ভাবে নিজ স্ত্রীর সংসর্গ, অতিশয় পাপজনক বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহার ফল বিবিধ ভয়ঙ্কর নরকভোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ভয়ে অনেকে সংযত হয়। তাহারা ভয়ের ধর্ম্ম যাজন করিলেও তাহাদিগকে ভাগ্যবান্ বলিতে হইবে, যে হেতু ইহলোকে তাহারা স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করে, এবং পাপকর্ম্মে তাহাদের ভয় হইতে ক্রমে

অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি।
ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ।৮।১৭১-১৭৪।

(১) নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈথুনম্।
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্।

ঐ ।৯।২৮৪।

(২) "কৃপাণধারাগমনাদ্ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গধারণাচ্চৈব দুঃসাধ্যং কুলসাধনম্॥"

বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হওয়ায়, তাহারা সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া, এবং ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের সহায়তা হইবে বলিয়া, ধর্ম্মের নামে কলুষিত পথে গমন করে, তাহারা নিতান্তই দুর্ভাগ্য। অনেকে বলেন ভোগের দ্বারা কামনার শান্তি হয়। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে ভোগের দ্বারা ভোগ-বাসনার শান্তি হয় না, বরং ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নির বৃদ্ধির ন্যায় ভোগের দ্বারা ভোগ-বাসনার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে (১)। ধর্ম্মের নামে অবাধ পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার বল ও তেজ হারাইয়া, অবশেষে অক্ষমতা-বশতঃ পাপ কর্ম্মে বিরত হওয়া অথচ মনে মনে ভোগ-বাসনা পোষণ করা, ইহাকে ভোগে শান্তি বলা যায় না, ইহাতে কোন ক্রমেই মঙ্গল হয় না। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, "সম্যক্ প্রকারে মাংস (কোন প্রকার জীবের মাংস, মৎস্য পক্ষী বা পশু প্রভৃতির মাংস) পরিবর্জ্জন করিলে যাদৃশ ফল লাভ হয়, পবিত্র ফলমূল ভোজনে অথবা নীবারাদি যাহা মুনিগণ ভক্ষণ করেন তাহা আহার করায় তাদৃশ ফল হয় না। 'ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি পরলোকে আমাকে সে ভক্ষণ করিবে' —পণ্ডিতগণ 'মাংস' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। 'মাং' অর্থাৎ আমাকে 'সঃ' অর্থাৎ সে ভক্ষণ করিবে। মৈথুন প্রভৃতিতে জীবের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, যাহারা ইহা ত্যাগ করিতে একান্তই অক্ষম, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধান মতে সংযতভাবে মাংস-ভক্ষণে, মদ্যপানে এবং স্ত্রী-সঙ্গমে দোষ নাই, কিন্তু এ সব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেই ভাল হয়। নিবৃত্তিই মহা-ফল অর্থাৎ মোক্ষ দান

---

(১) ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ মনুসংহিতা।

করে (১)। অতএব, ধর্ম্মের নামে কেহ কেহ অসংযত হইয়া যে বীভৎস আচরণ করে, তাহা একান্তই দোষাবহ ও লজ্জার বিষয়। তাহাতে ধর্ম্ম ত হয়ই না, পরন্তু দুর্ব্বলচিত্ত অজ্ঞ লোকসকল তাহার অনুকরণ করায়, সমাজে পাপের স্রোত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য অতি সংযতভাবে বিষয় ভোগ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তি অভ্যাস ও আত্মতত্ত্বের অলোচনা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে সাধকের নিজের ও সমাজের কল্যাণ হইবে।

পঞ্চতত্ত্ব।

পূর্ব্বে যে পঞ্চ মকারের কথা বলা হইয়াছে, শাক্ত তন্ত্রে তাহাই পঞ্চতত্ত্ব নামে উক্ত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই যথেষ্ট বলা হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

নির্ব্বাণতন্ত্রে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, ও ধ্যানতত্ত্ব, বৈষ্ণবদিগের এই পঞ্চ তত্ত্বের উল্লেখ আছে (২)।

---

(১) ফলমূলাশনৈ র্মেধ্যৈ র্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনাৎ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জ্জনাৎ॥
মাং স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ মনুসংহিতা।৫।৫৪-৫৬।

(২) শৃণু তত্ত্বং বরারোহে বৈষ্ণবস্য ত্রিলোচনে।
গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং বর্ণতত্ত্বং সুরেশ্বরি।
দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে॥
নির্ব্বাণতন্ত্রম্। দ্বাদশঃ পটলঃ।

দেহস্থ ব্রহ্মতেজ তৈলযুক্ত বর্ত্তিকার অর্থাৎ পলিতার ন্যায়, গুরুদেব মন্ত্রদান করিলে সেই বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হয়, ইহাই গুরুতত্ত্ব (১)। দেবতার শরীর বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং বীজের আত্মা যে দেবরূপী সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, ইহাই মন্ত্রতত্ত্ব (২)। ঈশ্বরের যে বীর্য্য তাহা অক্ষরাত্মক, অতএব জীবের দেহ অক্ষরময়; মন্ত্রবর্ণে সকল বর্ণ লয় প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহা শিবের সর্ব্বস্ব স্বরূপ, ইহাই বর্ণতত্ত্ব (৩)। আমি স্বয়ং দেবতা, আমি অন্য কিছু নহি, আমি নির্ম্মল দেবরূপী, এইরূপ জানিয়া সাধক তৃণ গুল্ম লতা ইত্যাদিতে দেবতাকে ধ্যান করিবে, ইহাই দেবতত্ত্ব (৪)। আর, ধ্যানের দ্বারাই সমস্ত লাভ হয়, ধ্যানের দ্বারা বিষ্ণুস্বরূপ হওয়া যায়, ধ্যানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়, ধ্যান ব্যতীত কখনই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহাই ধ্যানতত্ত্ব (৫)।

---

(১) সতৈলং বর্ত্তিকাযুক্তং দেহস্থং ব্রহ্মতেজসম্।
গুরুণা মন্ত্রদানেন তৎসূত্রং দীপিতং ভবেৎ॥
নির্ব্বাণতন্ত্রম্। দ্বাদশ পটলঃ।

(২) দেবতায়াঃ শরীরং হি বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।
অতএব হি তস্যাত্মা দেবরূপো ন সংশয়ঃ॥ ঐ

(৩) ঈশ্বরস্য তু যদ্বীর্য্যং তদেব অক্ষরাত্মকম্।
তেন বর্ণাত্মকং দেহং জন্তোরেব ন সংশয়ঃ॥
মন্ত্রবর্ণে চ তে বর্ণা লীয়ন্তে পরমেশ্বরি।
বর্ণতত্ত্বমিদং দেবি মম সর্ব্বস্ববদ্ভবেৎ॥ ঐ

(৪) স্বয়ং দেবো ন চান্যোঽস্মি নির্ম্মলো দেবরূপকঃ।
সর্ব্বত্র দেবতাং ধ্যায়েৎ তৃণগুল্মলতাদিষু॥ ঐ

(৫) ধ্যানেন লভতে সর্ব্বং ধ্যানেন বিষ্ণুরূপকঃ।
ধ্যানেন সিদ্ধিমাপ্নোতি বিনা ধ্যানং ন সিদ্ধতি॥ ঐ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে কলিপাবন অবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য পঞ্চতত্ত্বাত্মক। তিনি ভক্তরূপ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য), ভক্তস্বরূপ (শ্রীনিত্যানন্দ), ভক্তাবতার (শ্রীঅদ্বৈত), ভক্তাখ্য (শ্রীবাসাদি) এবং ভক্তশক্তিক (শ্রীগদাধরাদি), এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক ছিলেন (১)।

ক্ষিতিতত্ত্ব (মূলাধারে), জলতত্ত্ব (স্বাধিষ্ঠানে), তেজস্তত্ত্ব (মণিপুরে), বায়ুতত্ত্ব (অনাহতে) এবং আকাশতত্ত্ব (বিশুদ্ধাখ্যে)—এই পঞ্চতত্ত্বের উল্লেখ যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক যখন কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে এক এক চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে লইয়া যাইতে থাকেন, তখন কুলকুণ্ডলিনী জলতত্ত্বে আসিলে গন্ধ-লোপ হয়, তেজস্তত্ত্বে আসিলে রস-লোপ হয়, বায়ুতত্ত্বে আসিলে রূপ-লোপ হয়, আকাশতত্ত্বে আসিলে স্পর্শ-লোপ হয় এবং দ্বিদলে আসিলে শব্দ-লোপ হয়। কুলকুণ্ডলিনী এক এক চক্র ছাড়িলে এক একটী বিষয় হইতে মন বিযুক্ত হইয়া পড়ে, এবং দ্বিদলে আসিলে রূপ-রসাদি পাঁচটী বিষয় হইতেই মন সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া পরমে লীন হইবার উপযুক্ত হয়। পরে ধ্যানযোগে সাধকের চিত্ত সহস্রারে পরম শিবে লীন হইয়া যায়। বেদান্তের মতেও ক্রমে পঞ্চতত্ত্বের লয় করিয়া লয়যোগ সাধনের ব্যবস্থা আছে। বাস্তবিকপক্ষে সাধনার ইহাই অন্তরঙ্গ পঞ্চতত্ত্ব।

নির্ম্মল আত্মা তত্ত্বাতীত বস্তু (২)। এই তত্ত্বসমূহের অতীত অবস্থায় যাইতে না পারিলে, পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ হয় না। যোগবলে সেই তত্ত্বাতীত অবস্থায় উপস্থিত হইলে, পরমাত্মার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে

---

(১) পঞ্চ তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। আদিলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

(২) 'তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্'।

এবং পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ হয়। সমাধির পর অনুলোমক্রমে স্থূল জগতে নামিয়া আসিলে, সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মসত্তায় ভাসমান দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড

—:*:—

প্রথম অধ্যায়।

—:*:—

কামিনী, কাঞ্চন ও ত্যাগ।

প্রথম খণ্ডে স্বরূপ-জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ-সাধন সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সাধনাঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে, আপাততঃ বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, এরূপ কয়েকটী বিষয়ের সমন্বয় তৃতীয় খণ্ডে করা হইবে। সর্ব্বত্র সমদর্শন লাভ হইলে পরা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যথা নহে।

কামিনী ও কাঞ্চন, স্ত্রীলোক ও ধনসম্পদ্, এই দুইটী ত্যাগের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কারণ এই দুইটীর প্রতি ভোগাসক্তি জন্মিলে মানুষ শীঘ্র শীঘ্রই অধঃপতিত হয়। শাস্ত্রকারগণ নিবৃত্তিমার্গের সাধকের পক্ষে এই দুইটীকে নরকের দ্বার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (১)। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখীন, এবং ইহাদের যাহাতে আপাততঃ তৃপ্তি হয় তাহার দিকে ইহাদের গতিও স্বাভাবিক। জল যেমন আপনা হইতেই নিম্ন দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃই কামিনী ও কাঞ্চনের দিকে ধাবিত হয়, ইহার জন্য কাহাকেও উপদেশ দিবার প্রয়োজন হয় না। জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, মানুষ পরস্পরের মধ্যে চিরদিনই ইহার জন্য কাটাকাটি মারামারি করিয়া আসিতেছে। পুরুষজাতি প্রবল, কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষজাতিরই

---

(১) 'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।'

'দ্বারং কিমেকং নরকস্য ? নারী।'

প্রাধান্য, সুতরাং পুরুষের দিক্ দিয়াই সকল কথা বলা হইয়াছে। স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল, স্ত্রীজাতি চিরদিনই পুরুষের অধীনে রহিয়াছে; তাহারা নিজের ঢাক নিজে বাজাইতে পারে নাই বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধেও যে পুরুষ ও কাঞ্চন অধঃপতনের হেতু, এ কথা কেহ বলে না, বা কেহ শাস্ত্রগ্রন্থে লেখে নাই। বাস্তবিকপক্ষে স্ত্রীজাতিও পুরুষ ও কাঞ্চনের নিমিত্ত কম লালায়িত নহে এবং তাহারাও ঐ সকলের জন্য পরোক্ষভাবে কম বিভ্রাটের সৃষ্টি করে নাই। পুরুষজাতি যেমন কামিনী ও কাঞ্চনের জন্য পতিত হইয়াছে এবং হইতেছে, স্ত্রীজাতিও সেইপ্রকার পুরুষ ও কাঞ্চনের জন্য পতিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

মানুষ চায় সুখ, সে শান্তির কথা বুঝে না। সুখ আর দুঃখ আলো আর আঁধারের মত। অন্ধকার যেমন আলোর চির-সহচর—আলোর পার্শ্বে অন্ধকার থাকিবেই থাকিবে, দুঃখ তেমনি সুখের চিরসহচর—সুখের পার্শ্বে দুঃখ থাকিবেই থাকিবে। তোমরা শুধু সুখ চাও, দুঃখ লইবে কে? তোমরা যদি শুধু দিনই চাও, রাত্রি যাইবে কোথায়? তোমরা সুখ চাহিতেছ, সুখ আসিতেছে; তাহার সময় অতীত হইলে, তাহার নিত্যসঙ্গী যে দুঃখ, সে আসিয়া তোমাদের গৃহমধ্যে উপস্থিত হইতেছে, এবং তাহার মেয়াদকাল পর্য্যন্ত যাহা দেওয়া দরকার তাহা তোমাদিগকে দিতেছে,—তোমাদিগকে পচাইয়া গলাইয়া, তোমাদের চোখের জলে নদী ভরিয়া, তবে তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে। দুঃখকে তোমরা চাও না, তাই দুঃখের স্পর্শে তোমরা অত কাতর হইয়া পড়। তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, দুঃখকে যদি এড়াইতে চাও তবে সুখকেও ছাড়িতে হইবে, দুঃখকে ছাড়িয়া শুধু সুখকে পাইবে না। সুখকে ছাড়িতে হইবে শুনিলে তোমরা মরমে মরিয়া যাও। তোমরা এটা বোঝ না যে, তোমরা প্রকৃত সুখ চাও না, চিরদিন থাকে এমন সুখ চাও না, তোমরা চাও ইন্দ্রিয়-সুখ। ইন্দ্রিয় দীর্ঘ সময় একভাবে

থাকে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়-সুখ যে স্থায়ী নহে তাহা তোমরা বুঝিয়াও বোঝ না, তোমাদের বুদ্ধি এতই দুর্ব্বল। শান্তি বা চিরস্থায়ী সুখ চিরস্থায়ী বস্তু হইতেই পাওয়া যায়, তাই যাহারা চিরস্থায়ী সুখ চায় তাহারা চিরসুখের আধার চিরস্থায়ী বস্তুর অন্বেষণ করে, আর সেই চিরস্থায়ী বস্তুকে লাভ করিয়া আনন্দের সাগরে ডুবিয়া যায়, দুঃখের ছায়া কখনও তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য সাধক ইন্দ্রিয়সুখ পায়ে দলিয়া সেই অনন্ত সুখের অন্বেষণ করে, সেই জন্যই সাধকের মতি-গতি অন্যপ্রকার।

পতঙ্গ আগুনের শিখা দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হয়, তাহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়, তাহাকে কেহ বাধা দিলে সে মানে না, কাচের কোন আবরণ থাকিলে তাহার কোন ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া সে আগুনের মধ্যে গিয়া পড়িবেই পড়িবে। রূপ-জাত সুখের লালসায় আগুনে সে পড়িল বটে, কিন্তু সুখ পাইল কৈ? সে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তাহার জীবনের খেলা চিরদিনের তরে ফুরাইল। পুরুষ, তুমি নারীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছ, তুমি তাহাকে লাভ করিবার জন্য পাগল হইয়াছ; কোন বাধা-বিঘ্ন থাকিলে, ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে হউক তাহাকে আপনার হস্তগত করিলে,—কিন্তু তাহাকে ভোগ করিতে বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে তোমার জীবনী-শক্তি দ্রুতবেগে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, তাহা কি তুমি দেখিতেছ? কয়েক মাস, কয়েক বৎসরের মধ্যে, তোমার সৌন্দর্য্য বল স্বাস্থ্য সব শেষ হইয়া আসিল; উৎকট ব্যাধি তোমাকে আক্রমণ করিল, জরা তোমাকে গ্রাস করিল; মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রতিপলে ভোগ করিয়া অবশেষে অতি সত্বরই তোমাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে,—এই ত তোমার ইন্দ্রিয়-সুখের পরিণাম! কামিনি, পুরুষের সৌন্দর্য্যে মজিয়া তোমারও কি এই দশা হইতেছে না?

এখন একবার ধন-সম্পদের কথা চিন্তা করা যাউক। বাসের জন্য কারুকার্য্যে সাজান চকমিলান বাড়ী চাই, নানা রঙের সুগন্ধী-ফুলের গন্ধে আমোদিত বাগান চাই, সেই বাগানে বসিয়া পুষ্পের ঘ্রাণ ও সৌন্দর্য্য ভোগ করার জন্য কুঞ্জমণ্ডপ চাই, প্রজাদিগের নিকট সম্মান লাভ করিবার জন্য ভূসম্পত্তি চাই, জিহ্বার সাধ মিটাইবার নিমিত্ত বিবিধ শস্য ও ফল-মূল উৎপাদন করিবার ক্ষেত্র চাই, দেহ সুসজ্জিত করিবার জন্য নানাবিধ বসন-ভূষণ চাই, পরিচর্য্যা করিবার জন্য দাস-দাসী চাই, ভ্রমণের সুখ ভোগ করিবার জন্য গাড়ী ঘোড়া চাই,—সুতরাং বিলাসিতার উপাদান এই সকল লাভ ও রক্ষা করিতে হইলে যথেষ্ট কাঞ্চন বা অর্থের প্রয়োজন। পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। ন্যায়পথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিলে, তাহা এত অধিক হয় না, যাহাতে ঐ জাতীয় সকল প্রকার বিষয়-ভোগের সাধ মিটান যায়। তাই মানুষ নিজের স্বাস্থ্য, নিজের ধর্ম্মকর্ম্ম, সব বলি দিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্য খাটে, আর পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, পরকে ফাঁকি দিয়া, তাহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। এইরূপ করিতে গিয়া দেহের ও মনের স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, সুতরাং সুখ-ভোগ আদৌ হয় না; কেবল সুখের আশা পোষণ করা, আর দিবানিশি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া জ্বালা ভোগ করাই সার হয়।

ব্যাপার যখন এইরূপ, পুরুষের পক্ষে কামিনী ও কাঞ্চন এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ ও কাঞ্চন যখন এইরূপ সর্ব্বনাশের কারণ, তখন এ সকল সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই উচিত। হাঁ, প্রকৃত সুখ লাভ করিতে হইলে—শান্তি পাইতে হইলে—এ সব ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ত্যাগশাস্ত্রে এ দুটী উপলক্ষণা মাত্র, কিন্তু সকল দুঃখ ও সকল বন্ধনের মূল যে দেহাত্ম-বুদ্ধি—এই দেহই আমি এ প্রকার জ্ঞান—তাহাও

ছাড়িতে হইবে। দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট হইলে সকল বিষয়ে আসক্তি আপনি দূর হয়। সাধারণ লোকে অতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে না বলিয়া, অধঃপতনের স্থূলতম কারণ দুইটাই ত্যাগ করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। যিনি স্থূল সংসারের সুখ সর্ব্বতোভাবে দুঃখ-মিশ্রিত বলিয়া উহাকে দুঃখমধ্যেই পরিগণিত করিয়াছেন, এবং উহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অমৃতত্ব লাভের জন্য অন্তর্মুখীন হইয়াছেন, তাঁহাকে এ দুইটি ত্যাগ করিতে বলা পুনরুক্তি মাত্র, কেন না সমস্ত অসার বিষয়েই তাঁহার বিরক্তি জন্মিয়াছে ও তিনি তাহা হইতে মন সরাইয়া লইয়াছেন। আর যিনি সাধনার চরম সীমায় পৌঁছিয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দেখিতেছেন, ব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ বস্তু কিছুই দেখিতেছেন না, তাঁহার পক্ষে ত্যাজ্যই বা কি আর গ্রাহ্যই বা কি? তাঁহার ইন্দ্রিয়জাত সুখদুঃখ দুইই দূর হইয়াছে, তিনি নিত্যানন্দে আছেন।

'ত্যাগ' বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝা দরকার। কোন একটা জিনিস কোনও প্রকারে ব্যবহার না করিলে এবং তাহার সহিত কোনও সংশ্রব না রাখিলে, তাহা ত্যাগ করা হয়। যদি কখনও ঐ জিনিসের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়, উহার অভাবে ক্লেশ বোধ হয়, উহা ভোগ করিবার জন্য ইচ্ছার উদ্রেক হয়, তবে উহা ত্যাগ করা হয় নাই জানিতে হইবে। সুতরাং যাবৎ উহার প্রতি আসক্তি দূর না হইতেছে, তাবৎ উহা শুধু বাহিরে ত্যাগ করিলে কোন লাভ নাই; আর যদি আসক্তি নষ্ট হয়, তবে বাহিরে উহা ব্যবহার করা বা না করায় বিশেষ কিছু আসে যায় না (১)। যে জিনিসের প্রতি আসক্তি নষ্ট হইয়াছে সেই জিনিস ত্যাগ করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

---

(১) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

স্ত্রীলোক দেখিলে পুরুষের, অথবা পুরুষলোক দেখিলে স্ত্রীলোকের যদি কাম-রিপুর উদ্দীপনা হয়, যদি তাহাকে ভোগ করিবার জন্য বাসনা হয়, আর যদি সেই বাসনার দমন করিয়া কোন উৎকৃষ্ট বিষয়ের দিকে মন চালিত না করা যায়, তাহা হইলেই বিনাশের সূত্রপাত হয়। যাহা আহার করা যায় তাহার সার ভাগ হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে বহু-পরিমাণ ভুক্ত দ্রব্য হইতে অতি অল্প-পরিমাণেই শুক্র উৎপন্ন হয়। এই শুক্রের উপরই জীবনী শক্তি প্রধানরূপে নির্ভর করে, সুতরাং শুক্র ক্ষয় করিলে মানুষের দেহ ও মন যে দুর্ব্বল এবং জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িবে, মৃত্যু যে নিকটবর্ত্তী হইবে, ইহা অতি নিশ্চিত। হতভাগ্য মানব-মানবী, ক্ষণিক স্পর্শ-সুখের লালসায় অযথা শুক্রপাত করিয়া, দিন-দিনই শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ব বিষয়ে দীনহীন, মলিন ও অধঃপতিত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক মূর্খতার বিষয়, অধিক পরিতাপের বিষয়, কি হইতে পারে? এই স্থানে অধঃপতনের সদর দরজা খোলা আছে, অতএব যাঁহারা নিজের হিত কামনা করেন তাঁহাদের সদা সাবধানে, এ স্থান হইতে দূরে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করা উচিত। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের সংশ্রব এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব। কেবল এই বিপদ-সঙ্কুল পথ হইতে সকলকে রক্ষা করিবার জন্যই মহাপুরুষগণ তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন (১)।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।৩।৮-৭।

(১) ত্রৈলোক্যজননী ধাত্রী সা ভগী নরকো ধ্রুবম্।
তস্যাং জাতো রতস্তত্র হা হা সংসারসংস্থিতিঃ॥

যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগের চরম উপাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার সেই অবস্থা এক দিনে আসে নাই। সুদূর পল্লীর ক্ষুদ্র পাঠশালায় অতি সামান্যরূপে শিক্ষিত গুরু মহাশয়, যাঁহাকে অশিক্ষিত বলায় কোন দোষ হয় না, তাঁহারই চরণ-তলে বসিয়া, তাঁহারই লিখিত অক্ষরগুলির উপর হাত ঘুরাইয়া, বর্ত্তমানের এই প্রবীণ পণ্ডিতকে প্রথম বর্ণমালা লিখিতে শিখিতে হইয়াছিল। কত ভ্রান্ত ধারণা ও কত দুশ্চরিত্র বালকের সঙ্গদোষের মধ্য দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে, অবশেষে তাঁহাকে জ্ঞানের এই উন্মুক্ত প্রান্তরে, যে স্থানে কত অমূল্য নিধি ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেই স্থানে আসিতে হইয়াছে। যে সকল নিম্ন স্তরের ভিতর দিয়া তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে, তাহার অনেক স্থানেই অনেক বিপদ্ আছে বলিয়া, সাবধানে বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক সেই স্তরগুলির মধ্য দিয়া না আসিয়া, তিনি যদি সেই স্তরগুলিই বর্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে আজ কি তিনি এই সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিতেন? পরমাত্মরূপ পরম ধন লাভ করা বা নিজ স্বরূপে অবস্থিত হওয়া রূপ চরম ধর্ম্ম লাভ করা এক দিনে হয় না। যিনি আজ তত্ত্বজ্ঞানের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখ ভোগ করিতেছেন, সেই পুরুষ কি মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়াছিলেন না, জন্ম গ্রহণ করার পর মায়ের স্তন্য পান করিয়া, মায়ের ও ভগ্নীদের যত্নে লালিত পালিত হইয়া, প্রতিবেশিনী বালিকাগণের সঙ্গে খেলাধূলা করিয়া শিশুকাল ও বাল্যকাল অতিবাহিত করেন নাই? তাহার পর যদি তিনি বিবাহ না করিয়া থাকেন, কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও

জানামি নরকং নারীং ধ্রুবং জানামি বন্ধনম্।
যস্যাং জাতো রতস্তত্র পুনস্তত্রৈব ধাবতি॥

অবধূতগীতা।৩।১৫-১৬।

কামাতুরভাবে আসক্ত না হইয়া থাকেন, এবং সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পর আহারাদি লাভের জন্য কখনও কোন স্ত্রীলোকের নিকট না যাইয়া থাকেন বা স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও কি তিনি পরোক্ষভাবে স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারিয়াছেন? স্ত্রীলোকের সাহায্যে পুরুষ দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদিই ব্যবহার করিয়াছেন; স্ত্রীলোকের সাহায্যে যে সকল পুরুষ প্রতিপালিত হইতেছে তাহাদেরই সঙ্গ নানা কারণে তাঁহাকে করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং তিনি স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন কৈ? তাঁহাকেও ত দেখিতেছি প্রথমতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং পরে পরোক্ষভাবে স্ত্রীলোকের সংশ্রবে থাকিয়াই ধর্ম্মমন্দিরের সোপানসমূহ অতিক্রম করিতে হইয়াছে। আবার সাধিকা বা সিদ্ধিপ্রাপ্তা নারীর সম্বন্ধে পুরুষ-ত্যাগ-ব্যাপারে, পিতৃবীর্য্য হইতে জন্মলাভ ইত্যাদি অবস্থা বিচার করিয়া দেখান যায় যে, তিনিও কোন প্রকারে পুরুষের সম্পর্ক নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদের জীবনের প্রাধান্য কোথায়? প্রাধান্য এই স্থানে,——সাধারণ মানব বা মানবী আসক্ত হইয়া স্ত্রী বা পুরুষকে বিবিধ ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের সহায়রূপে গ্রহণ করে, ইঁহারা তাহা করেন নাই; ইঁহারা সাবধানে সেই ভাব ত্যাগ করিয়া, স্ত্রী বা পুরুষের নিকট হইতে পরমার্থ-জ্ঞান লাভের যতটা সহায়তা হইতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারা, পূর্ব্ব জন্মের তপস্যাগুণে, বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আসিতে পারিয়াছেন, এবং ভগবানে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া জগতের হিতকর কার্য্যে ব্রতী আছেন, বা মোক্ষপদ লাভের জন্য কঠোর তপস্যায়ই পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বাদ দিয়া জনসাধারণের কথাই আলোচনা করিতে হইবে। যে মুষ্টিমেয় সাধক তত্ত্বজ্ঞানে বলীয়ান্ তাঁহাদিগকে সাধারণ নিয়মের মধ্যে

আনা যায় না, তাঁহারা অসাধারণ মানুষ। কোটি কোটি মানব-মানবী, যাঁহারা দিবারাত্র হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহাদের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহারই জন্য হিতকর নিয়মাবলীর আবিষ্কার, হিতকর বিষয়ের আলোচনা।

জগতের যে কোন জিনিসই হউক না কেন, তাহারই ভাল-মন্দ দুই প্রকারের গুণ আছে। এক দিন অন্ন গ্রহণ না করিলে জীবন বাঁচে না; সেই অন্ন বেশী মাত্রায় ভোজন কর অসুখ হইবে, পচা অবস্থায় গ্রহণ কর পীড়া হইবে, পীড়িত-শরীরে ভক্ষণ কর ব্যাধি বাড়িবে, জীবন শেষ হইবে। জল পান না করিলে প্রাণ বাঁচে না, কিন্তু দূষিত জল পান কর ব্যাধি হইবে; বিশুদ্ধ জলও অপরিমিত পান করিলে শরীর অসুস্থ হইবে। গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে ক্লেশ হয়, আবার বর্ষার সময় জলের আধিক্যে ক্লেশের সীমা থাকে না,——বন্যায় কত গ্রাম ও নগর ভাসাইয়া লইয়া যায়, হাজার হাজার লোক গৃহশূন্য হয়, কোটি কোটি জীব প্রাণ ত্যাগ করে। সময়ে অগ্নিতে গৃহ গ্রাম ও নগর ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, কত জীব দগ্ধ হইতেছে, কত মানুষও মারা যাইতেছে, কিন্তু আগুন না হইলে আমাদের চলে কি? বিষ ভক্ষণে জীবন যায়, আবার কঠিন পীড়ায় শোধিত বিষ সেবনে প্রাণ রক্ষা হয়। এইরূপে যাবতীয় জিনিসেরই দোষ ও গুণ দুইই আছে। তাই বলিয়া সে সমুদায় ত আমরা ত্যাগ করিতে পারি না, সাবধানতার সহিত সে সকল জিনিসই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। অসাবধান হইলেই বিপদ ঘটে, সুতরাং সদা সাবধানে দেশ ও কাল বিবেচনায় দ্রব্যসকলের ব্যবহার করা উচিত।

মানব, তোমার মা আছেন, ভগ্নী আছে, কন্যা আছে। মা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী পূজনীয়া, কনিষ্ঠা ভগ্নী ও কন্যা স্নেহের সামগ্রী; এঁদের নিকট হইতে ত তোমার কোন বিপদ্ নাই। তোমার স্ত্রী আছেন,

তাঁহা হইতেই বা তোমার ভয় কি? তিনি কি তোমার কেবল কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই আসিয়াছেন? কখনই নহে। তিনি তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, তোমার সুখে সুখী ও তোমার দুঃখে দুঃখী হইতে আসিয়াছেন। তোমার সাংসারিক কাজের সহায়তা করার জন্যই তিনি আসিয়াছেন। তুমি বাহিরের কাজ লইয়া ব্যস্ত, তিনি তোমার গৃহের কাজ লইয়া ব্যস্ত। তিনি তোমার সহধর্ম্মিণী, তিনি তোমার ধর্ম্ম-কার্য্যে সাহায্যকারিণী। তিনি সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ নহেন। যৌবনে যথাশাস্ত্র ঋতুকালে তাঁহার সহবাস করিয়া, বংশ-রক্ষার্থে এবং নিজেদের বার্দ্ধক্যে প্রতিপালক বা প্রতিপালিকা পাইবার জন্য, দুই চারিটী সন্তান উৎপাদন কর; পরিণত বয়স হইতে কামগন্ধহীন প্রেম সহকারে তাঁহার সহিত বাস কর; শরীর ও মন সুস্থ থাকিবে, সমস্ত জীবন আনন্দে কাটিয়া যাইবে। নিজের স্ত্রী ভিন্ন জগতের যাবতীয় নারীকে, তাঁহাদের বয়স-বিচারে, মাতা ভগ্নী বা কন্যা বলিয়া জান, তাঁহাদিগের সহিত সেইরূপ ভাবে চল,—আর যদি আরও উপরে উঠিতে পার, তাঁহাদিগকে জগজ্জননীর অংশরূপিণী জানিয়া তাঁহাদের সহিত সন্তানের ন্যায় ব্যবহার কর। চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি পশু নহ, তুমি পশু অপেক্ষা অনেক উপরের স্তরের জীব। কিন্তু, হায়! কি দুঃখের বিষয়! তুমি পশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ কর না! পশুরাও যে সন্তান উৎপাদনের আবশ্যকতা ব্যতীত স্ত্রী-সঙ্গম করে না।

মা সকল, তোমরাও একবার চিন্তা করিয়া দেখ। জগদম্বা তোমাদের ভিতর দিয়াই জগতের সন্তানগণকে পালন করিতেছেন। তোমরা যে মা,—মাতৃভাব ভুলিও না, মায়ের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা মনে রাখিও, নিজের স্বামী ব্যতীত পুরুষমাত্রকেই তোমাদের পুত্র বলিয়া জানিও, স্ত্রীমাত্রকেই তোমাদের কন্যা বলিয়া জানিও। যদি এত উচ্চ

স্তরে উঠিতে না পারিয়া থাক, তবে বয়স-বিচারে পুরুষগণের মধ্যে কাহাকেও পিতা, কাহাকেও ভ্রাতা, কাহাকেও বা নিজ পুত্র বলিয়া জানিবা এবং তাঁহাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবা। তোমরাই ত নর-নারীর জীবন-প্রভাতে একমাত্র রক্ষয়িত্রী, একমাত্র পালয়িত্রী, একমাত্র শিক্ষয়িত্রী। তোমাদের হস্তে সমগ্র মানব-জাতির ভার। তোমরা শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে নিপুণা হইয়া সন্তানগণকে উপযুক্ত গুণে ভূষিত করিয়া তোল, ইহাই যে তোমাদের কাজ। মা সকল, তোমরা হৃদয়ে উপযুক্ত বল সঞ্চয় কর, তোমরা অবলা নও, তোমরা শক্তিরূপিণী, তোমাদের শক্তিতেই মানুষ শক্তিমান্, তোমাদের স্তনের অমৃত-রসই মানব-মানবীর শিরায় শিরায় বহমান। তোমরা দীনা-হীনা হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। তোমরা যে মা, তোমরা যে শক্তি, তোমরা যে জগদম্বার অংশরূপিণী (১), তাহা সকলকে দেখাও; তোমরা শক্তিরূপিণী, তোমরা পুত্র কন্যা ভাই ভগ্নী সকলকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে বলীয়ান্ কর, তোমাদের 'শক্তি' নাম সার্থক কর।

এক্ষণে একবার কাঞ্চনের কথা বিচার করা যাউক। কাঞ্চনও ত ব্যবহারের দোষেই বিনাশের অস্ত্ররূপে পরিণত হয়। অর্থ বিনা কোন্ কাজ চলে? সন্ন্যাসিন্, তুমি যে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়াছ, ভিক্ষালব্ধ অন্নে ক্ষুধা দূর করিতেছ, পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেছ, তাহা কি অর্থ ব্যতীত লাভ হয়? যে তোমাকে দিয়াছে, সে অর্থ বিনা ঐ সকল কোথায় পাইয়াছে? তুমি যে রাজপথ বা গ্রাম্য পথ দিয়া চল তাহাই বা বিনা অর্থে কেমন করিয়া হইয়াছে? (যাঁহারা সুদূর

(১) বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। শ্রীশ্রীচণ্ডী।১১।৬।

বিজন বনে বা পর্ব্বত-গুহায় নিয়ত পরমাত্মার গভীর ধ্যানে মগ্ন, উলঙ্গ ও ফলমূলাহারী, সেই দেবোত্তম ত্যাগিগণ লেখককে ক্ষমা করিবেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হয় নাই)। আর যাঁহারা মানবগণের আত্মার উন্নতিকল্পে শিক্ষা দীক্ষা ও বিবিধ জন-হিতকর কার্য্যের ভার লইয়াছেন, ভগবানের প্রিয় পরিকর সেই সকল সন্ন্যাসীদের ত অর্থের প্রয়োজন যথেষ্টই আছে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরই যখন পরোক্ষভাবে অর্থের আবশ্যকতা আছে, তখন আর গৃহস্থের কোন্ কথা? জগতে অর্থের একান্তই প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তাহা হস্তগত হইলে তাহার যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত। যেমন নিকৃষ্ট কামবৃত্তির দাস হইলে মানুষ পশুরও অধম হয়, সেইরূপ 'বিলাসিতার সাগরে শরীর ভাসাইবার জন্য আমার জন্ম হইয়াছে' এরূপ যে মানুষ ভাবে সেও পশুর অধম। পশু নিজের পেট ও নিজের আরাম ছাড়া আর কিছু বোঝে না, কিন্তু তাই বলিয়া সে অনাবশ্যক জিনিসের জন্য পরের অনিষ্ট-চিন্তায় ব্যস্ত নহে। আর ঘোর-বিলাসী মানুষগুলি কি না করিতেছে? তাহারা কল্পিত আরামের সৃষ্টি করিয়া, দীন-দুঃখীর চোখের জলে পুকুর ভরিয়া তাহাতে কামিনী লইয়া জল-বিহারে মত্ত! ভগবান্ এ জন্য অর্থ সৃষ্টি করেন নাই; তোমার নিজের শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু আরামের প্রয়োজন তাহাই তোমাকে ভোগ করিতে বলিয়াছেন, আর সেই আরামের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহাই তুমি নিজের জন্য ব্যয় করিবে, ইহার অধিক যদি তুমি তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর তবে তুমি অপব্যয় করিতেছ জানিবা। তুমি ভগবানের এক জন কর্ম্মচারী মাত্র। সব অর্থ তাঁহার; তোমার শরীর-রক্ষার্থে এবং পোষ্যদিগের প্রতিপালনের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা বাদে বাঁকী অর্থ ভগবানের কার্য্যে ব্যয় করিবা। তোমার প্রতিবেশী ভাই-ভগ্নীগণ অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবিয়া

আছে তাহাদের শিক্ষার জন্য, সহস্র সহস্র অনাথ ও অনাথা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিবার নিমিত্ত, শত শত কার্য্য-শক্তিহীন অন্ধ খঞ্জ ও স্থবির অন্নাভাবে জীবন ত্যাগ করিতেছে এবং বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না তাহাদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দান করিবার জন্য, কত কত দীনহীন রোগী বিনা চিকিৎসায় কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহাদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থার নিমিত্ত, তোমাকে বাঁকী অর্থ ব্যয় করিতে বলিয়াছেন, আর তুমি কি করিতেছ? অখাদ্য ভক্ষণে, মাদক দ্রব্য সেবনে, অনাবশ্যক বসন-ভূষণে এবং বিলাস-ভবনে সমস্ত অর্থ উড়াইয়া দিয়া, তুমি পীড়িত ও পথের ফকির হইতে যাইতেছ। ইহা কি তোমার মনুষ্য-নামের যোগ্য কাজ হইতেছে? ভগবানের প্রজাগণের সুখ-শান্তির জন্য অর্থের প্রয়োজন। সৎপথে থাকিয়া, সদ্ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, ভগবানের প্রজাদের জন্য তাহা ব্যয় কর। তাহা হইলে অর্থ অনর্থের হেতু হইবে না। নিষ্কামভাবে ঐ সকল কাজ করিতে করিতে, কালে তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে ও তুমি পরা শান্তি লাভ করিবে।

মানব, মানবি, তোমরা বলীয়ান্ হও। তোমরা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সন্তান-সন্ততি। তোমরা একবার বিচার করিয়া দেখ দেখি, ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিয়া, তোমাদের বিবেক মত ইহকাল ও পরকালের সুখকর কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করাই তোমাদের উচিত, না তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া ক্ষণিক সুখের জন্য ইহজীবন ও পর-জীবনের সমস্ত সুখশান্তি হারানই উচিত। নিকৃষ্ট কামবৃত্তি ও অনাবশ্যক বিলাসের বাসনা ত্যাগ কর, সদ্বৃত্তি সমূহের বিকাশ-সাধনের জন্য প্রাণপণে যত্ন কর, বিমল আনন্দ পাইবে, অনুতাপানলে পুড়িতে হইবে না।

যাঁহারা গৃহে আছেন তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে, আর যাঁহারা মহত্তর

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা গৌণভাবে, নারী ও অর্থের সংশ্রবে আছেন। তাহা হউক, উভয়কেই আত্মরক্ষায় তৎপর থাকিতে হইবে। গৃহস্থকে অষ্টপ্রহর ঐ সকল লইয়া থাকিতে হইলেও, তাঁহাকে ঐ সকলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। যদি তিনি অনাসক্তভাবে, ঈশ্বরের সংসার এই জ্ঞানে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে, সমস্ত কাজ করিয়া যান, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, সংসারের জ্বালা তাঁহাকে খুব কমই স্পর্শ করিতেছে এবং তিনি বেশ শান্তি অনুভব করিতেছেন। বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসীকে অধঃপতন হইতে আত্মরক্ষার জন্য সদা সচেতন থাকিতে হইবে। মুহূর্ত্তেক কালের অসাবধানতায় হয় ত বহু তপস্যা দ্বারা লব্ধ উচ্চ ভূমিকা হইতে তিনি অনেক নীচে পড়িয়া যাইতে পারেন, এমন কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াও পড়িতে পারেন। সুতরাং, তিনি যে আসক্তি একবার ত্যাগ করিয়াছেন তাহা পুনরায় যেন তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও স্থান প্রাপ্ত না হয়, এই উদ্দেশ্যে ঐ সকল হইতে তাঁহাকে যথাসাধ্য দূরে থাকিতে হইবে। শাস্ত্রে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা এই অর্থেই বলা হইয়াছে; আর আসক্তি সহজে যায় না, অথবা গেলেও কখন কখন পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়, এই কারণে ঐ সকলের প্রতি যাহাতে লোভ না জন্মে তাহা করিবার অভিপ্রায়ে ঐ গুলিকে অতি জঘন্য পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। নচেৎ, ভগবানের সৃষ্টিমধ্যে কামিনী-কাঞ্চনেরও একটা স্থান আছে, একটা সার্থকতা আছে। পরমেশ্বর ঐ গুলিকে মানুষের শুধু বন্ধন বা পতনের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। সমস্ত নর-নারীই তাঁহার সন্তান-সন্ততি, তাহাদের হিতই সেই মঙ্গলময় পিতার লক্ষ্য, ইহা জানিয়া এবং ত্যাগের প্রকৃত রহস্য বুঝিয়া, সাবধানে যথা-যোগ্যরূপে ব্যবহার করিলে, কামিনী-কাঞ্চন মানবের অনিষ্ট না করিয়া ইষ্টই সাধন করিবে।

ধর্ম্মের আপাতবিরোধী এই অন্তরায়গুলির সমন্বয় এইরূপে করিতে হইবে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ধর্ম্মজগতের ভিত্তি স্বরূপ ছয়টী হিন্দুদর্শনের মধ্যে মূলতঃ যে কোন বিরোধ নাই, তাহাই দেখাইতে আমরা চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:০:—

ষড়্‌দর্শনের সমন্বয়।

প্রাচীনতম যুগের মহামনা ঋষিগণ গভীর গবেষণা ও দীর্ঘ-দিন-ব্যাপী একাগ্র সাধনার ফলে যে চরম সত্যের অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা সরলভাবে উপনিষদ্‌সমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। জটিল যুক্তি-তর্কের অবতারণা তাঁহারা বড় করেন নাই; সেই চরম সত্য কি এবং কেমন করিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে হয়, তাহাই তাঁহারা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। এই মধুর সত্য তাঁহাদের মধুর ভাষায় কবিতা-তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে ছুটিয়াছে। কখনও তাঁহারা নিজের পৃথক্ সত্তার সমক্ষে সেই অনন্ত সত্তার সাক্ষাৎ করিয়া ভক্তি-রসে ভাসিয়া গিয়াছেন, কখনও বা সেই মহান্ সত্তায় আত্মসত্তা ডুবিয়া যাওয়ায় বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে গাহিয়াছেন, "আমিই সেই," "আমিই ব্রহ্ম," কখনও ভবিষ্যদ্ বংশাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, সকলেই অমৃতত্বের অধিকারী, এবং সত্য, তপস্যা, জ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা, গভীর ধ্যান প্রভৃতিই এই মধুময় ভাব লাভের পন্থা। তাঁহারা কোন স্বার্থের জন্য অনুভূত সত্যের কোন অপলাপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঋষিগণ, উত্তরাধিকার-সূত্রে যে পরম ধন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অটল ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত, বিজ্ঞানময় আসন রচনা করিয়াছিলেন—ইহাই দর্শনশাস্ত্র বা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান। ব্যাপার যখন এইরূপ, তখন দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে বিবাদ বা অসামঞ্জস্য থাকা কখনই সম্ভব নহে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম-দৃষ্টিতে মতদ্বৈধ দেখা যায় বলিয়া, বহু লোকে ইহা লইয়া বাদ-

বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন দর্শন রচিত হইয়াছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে, নচেৎ সকলেরই অভিপ্রায় ব্রহ্মতত্ত্ব-স্থাপন, এবং ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সাধককে সাহায্য করা।

হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ ছয়খানি দর্শন পরপর এই ভাবে সজ্জিত করা যায়,—বৈশেষিক ও ন্যায়, সাংখ্য ও পাতঞ্জল এবং পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত। স্থূলদৃষ্টি সাধকের নিকট জগৎ যেরূপ অনুভূত হয়, সেই হিসাবে জগতের উপাদান-বিশ্লেষণ, জড়াতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব-প্রমাণ এবং এই আত্মায় স্থিতি লাভ করিতে পারিলে জীব দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, ইহাই বৈশেষিক দর্শনে দেখান হইয়াছে। ইহাতে সূক্ষ্ম বিচার অতি অল্পই আছে। প্রাথমিক অল্পজ্ঞ সাধকের পক্ষে যতটুকু আবশ্যক তাহাই ইহাতে দেখান হইয়াছে। ন্যায় দর্শন বৈশেষিক দর্শন হইতে আর একটু উচ্চস্তরে উঠিয়া মনোরাজ্যের বিষয় লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, এবং কি উপায়ে সাধকের লক্ষ্য বিপক্ষের প্ররোচনায় ভ্রষ্ট না হয় ও নিজের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকে তাহার উপায় স্বরূপ বিচার-প্রণালী ইহাতে দেখান্ হইয়াছে। ঈশ্বরই জগতের কারণ, ইহা প্রমাণ করিয়া, ন্যায়শাস্ত্রকার সমাধিযোগে মোক্ষলাভে উপদেশ দিয়াছেন। সাংখ্যের বিচার আরও সূক্ষ্ম স্তরে উঠিয়াছে। আত্মা নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ, কিন্তু বাসনা বশতঃ তিনি প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়েন, এই বৈদিক মত অবলম্বনে কি প্রকার বিচারবান্ হইলে আত্মা এই আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহাই এই দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্যকার আত্মার অমরত্ব ও অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াও আত্মার বহুত্ব মানিয়া লইয়াছেন। ইনি বেদান্তদর্শনের উচ্চ ভূমিকার কথা বলেন নাই. আত্মা কিসে বিকারশূন্য হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারেন সেই

পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শন আত্মা অনাত্মা বা জগতের সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, কি কি উপায়ে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় সেই সাধনার বিষয় ব্যাখ্যাতেই নিযুক্ত। যোগই এই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। ঈশ্বর-আরাধনা দ্বারাও মুক্তি হয়, এ কথা উল্লেখ করিয়া, অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা যে নিগুর্ণ ব্রহ্মে পৌছান যায় তাহাই প্রধানরূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসাকার যেন এই মোক্ষের পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গকাম কর্ম্মের প্রশংসায়ই ব্যস্ত এরূপ দেখা যায়, তবে তিনি বলিয়াছেন যে, বৈদিক যজ্ঞাদির দ্বারা জীব অনন্ত-সুখ-পূর্ণ স্বর্গের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। ইহজগতের আসক্তি হইতে মুক্তি লাভ যে জীবের লক্ষ্য, তাহা তিনিও অস্বীকার করেন নাই। উত্তর মীমাংসাই শেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন। ইহাতে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, এবং কি উপায়ে সাধক সেই আদর্শে পৌছিয়া চির শান্তি লাভ করিতে পারেন তাহাও দেখান হইয়াছে। ইহার উদার মতের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সাধনার মতই স্থান পাইয়াছে। অধিকারভেদ দৃষ্টে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার উপকারিতা ও আবশ্যকতা ইহাতে অস্বীকৃত হয় নাই, এবং আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী বলিয়া অনুমিত হয় এরূপ সমুদায় শ্রুতিমতগুলির সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।

দুঃখ বোধ না হইলে দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কেহ চেষ্টা করে না, বন্ধনের জ্বালা বোধ না হইলে কেহ বন্ধনের জাল কাটিবার ইচ্ছা করে না। জগতের যে দিকে চাও দেখিবে, জীবমাত্রেই কি যেন এক যাতনা বোধ করিতেছে, আর সেই যাতনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নিয়তই চেষ্টা করিতেছে। যাহার যেমন সামর্থ্য, যাহার যেমন বুদ্ধি, সে সেই অনুসারে চেষ্টা করিতেছে, প্রতিকূল অবস্থার সহিত এই যে যুদ্ধ, ইহার বিরাম নাই। এই জ্বালায় যাহার মর্ম্মস্থল জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে, সে চায় এ দুঃখের চির-নিবৃত্তি, সে চায় এ যুদ্ধ

হইতে চির-বিশ্রাম। বৈশেষিক প্রভৃতি ছয়খানি দর্শনেরই সেই এক উদ্দেশ্য—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, যুদ্ধের চির বিরাম বা মোক্ষ। এ বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই, তবে পূর্ব্ব মীমাংসায় এই চির বিশ্রামের বিষয়টী কিছু গৌণভাবে অবলম্বিত হইয়াছে। এক্ষণে এক একটী দর্শন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধরিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

১। বৈশেষিক দর্শনের মতে ধর্ম্মবিশেষ হইতে জাত তত্ত্বজ্ঞানলাভ ব্যতীত মুক্তি-লাভ হয় না (১), এবং (ক) দ্রব্য, (খ) গুণ, (গ) কর্ম্ম,

---

(১) ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্। বৈশেষিক-দর্শনম্।১।১।৩।

(ক) ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয়টী 'দ্রব্য'। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটী ভূত পরমাণুরূপে নিত্য, আর পরমাণুর সমষ্টি হইতে উৎপন্ন শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে অনিত্য। পরমাণুসকল নিত্য, উহাদের বিবিধ সংযোগে সকল স্থূলবস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন নিত্য পদার্থ। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়, বিভু অথচ অনেক। মন আত্মা এবং সুখ-দুঃখাদি অনুভবের করণ। দ্রব্য গুণের আশ্রয়; গুণ-বিহীন হইয়া কোন দ্রব্য থাকিতে পারেনা।

(খ) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ ইত্যাদি ২৫টী 'গুণ'।

(গ) উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পাঁচ প্রকার 'কর্ম্ম'।

(ঘ) সামান্য, (ঙ) বিশেষ ও (চ) সমবায়, এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান হইতে সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

জগতে জানিবার বিষয় অনেক থাকিলেও, উহাদিগকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা, দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থ এবং ইহাদের সামান্য বিশেষ ও সমবায় রূপে বিদ্যমানতা। এই ছয় বিষয়ের সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তবে শান্তিলাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ যে মোক্ষ তাহা লাভ হয়। কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞান ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জন্মে না। জগতের তত্ত্ব জীবের স্বরূপ ও পরব্রহ্ম বিষয়ে ধারণা ধ্যান ও সমাধি দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভই বৈদিক মতে ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই বৈশেষিক দর্শনে "ধর্ম্মবিশেষ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, উক্ত ছয় প্রকার পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য ও স্বরূপ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে জীব অজ্ঞান-জাত মোহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়। বৈশেষিকদর্শনকার প্রথম দুই অধ্যায়ে জগতের তত্ত্ব, তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের স্বরূপ ও পঞ্চম অধ্যায়ে মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

(ঘ) 'সামান্য' শব্দে জাতি বুঝায়। পরা ও অপরা এই দুই প্রকারের জাতি। বহুব্যাপক বৃত্তি থাকিলে পরা জাতি হয়, এবং অল্পব্যাপক বৃত্তি থাকিলে অপরা জাতি হয়। প্রাণীত্ব পরা জাতি আর তাহার অন্তর্গত মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি অপরা জাতি।

(ঙ) যে অসাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা নিরবয়ব পদার্থের পরস্পরের পার্থক্য সিদ্ধ হয় তাহাই 'বিশেষ'।

(চ) 'সমবায়' শব্দে নিত্য সম্বন্ধ বুঝায়। সূত্রের সঙ্গে বস্ত্রের যে সম্বন্ধ তাহাই সমবায়।

২। ন্যায় দর্শনের মতে পদার্থ ষোল প্রকার, যথা,—(ক) প্রমাণ, (খ) প্রমেয় (গ) সংশয় (ঘ) প্রয়োজন, (ঙ) দৃষ্টান্ত, (চ) সিদ্ধান্ত,

(ক) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতি, অনুমান, উপমান অর্থাৎ কোন জ্ঞাত বস্তুর সহিত তুলনা এবং শব্দ (=আপ্ত-বাক্য) অর্থাৎ যাঁহাদের বাক্য অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই তাঁহাদের বাক্য—এই চারিটীই কোন জ্ঞাতব্য-বস্তুবিষয়ে প্রমাণ।

(খ) প্রমাণের বিষয়কে প্রমেয় বলে। ন্যায়ের মতে প্রমেয় ১২টী, যথা :—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ (ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এবং ইহাদের গুণ যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ), বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (কর্ম্মশীলতা), দোষ (রাগ, দ্বেষ ও মোহ), প্রেত্যভাব (পুনর্জন্ম), ফল (কর্ম্মফল), দুঃখ এবং অপবর্গ (মুক্তি)।

(গ) যে স্থলে একটি বিষয়ের সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান জন্মে নাই, কেবল তাহার ধর্ম্মের সাধারণ জ্ঞান জন্মিয়াছে, সে স্থলে সেই বস্তুর স্বরূপ-বিষয়ে যে তর্কিত জ্ঞান, অর্থাৎ এইটীই ইহার স্বরূপ না ইহার স্বরূপ অন্য প্রকার মনের এই দ্বিধা অবস্থা, তাহার নাম সংশয়।

(ঘ) যে বিষয়ের জন্য লোকের প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যাহা লাভ বা ত্যাগ করিবার জন্য লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রয়োজন।

(ঙ) সাধারণ লোক ও যাঁহারা তর্ক দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা, এই উভয় শ্রেণীর লোকেরই যাহাঁতে বুদ্ধি-সাম্য হয়, অর্থাৎ ইহারা উভয়েই যাহা সমানরূপে বুঝিতে পারেন, তাহাই দৃষ্টান্ত।

(চ) অবিরোধী শাস্ত্র-বাক্যকে, অথবা পরীক্ষা দ্বারা কোন বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করাকে, সিদ্ধান্ত বলে।

(ছ) অবয়ব, (জ) তর্ক, (ঝ) নির্ণয়, (ঞ) বাদ, (ট) জল্প, (ঠ) বিতণ্ডা, (ড) হেত্বাভাস, (ঢ) ছল, (ণ) জাতি ও (ত) নিগ্রহ-স্থান। ইহাদের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে নিঃশ্রেয়স্ বা মুক্তি

(ছ) প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন—ন্যায়ের এই পঞ্চবিধ অংশকে অবয়ব বলে (ইংরাজী দর্শনে ইহাকে Syllogism বলে)।

(জ) কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার জন্য তাহার কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে উহ অর্থাৎ মীমাংসা তাহার নাম তর্ক।

(ঝ) পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উদ্ভাবন করিয়া, অর্থাৎ এক প্রকার তর্ক উপস্থিত করিয়া তাহাতে দোষ দেখান, পুনরায় পরবর্ত্তী পক্ষের দোষ দেখান, এইরূপ ক্রমান্বয়ে বিচার পূর্ব্বক এক পক্ষের অবধারণকে নির্ণয় বলে।

(ঞ) দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে ন্যায়ের পঞ্চাবয়বযুক্ত বিচার দ্বারা অপর পক্ষের পরিহার পূর্ব্বক এক পক্ষের স্থাপনকে বাদ বলে। (ইহাতে জয় পরাজয়ের আশা নাই, প্রায়শঃ গুরুশিষ্যের মধ্যে যে তত্ত্ব-বিষয়ক বিচার হয় তাহাকে বাদ কহে)।

(ট) যেখানে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান দ্বারা পরস্পরকে পরাভূত করিয়া নিজ মত স্থাপন করা হয় তাহাই জল্প। (ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিষয় পরে বলা যাইতেছে।)

(ঠ) যেখানে নিজ মত স্থাপন না করিয়া কেবল অপর পক্ষের মতে দোষ দেখান হয় তাহাই বিতণ্ডা।

(ড) যাহা প্রকৃত হেতু বলিয়া আপাততঃ অনুমান হয়, কিন্তু ঠিক সিদ্ধান্ত স্থাপনের নিমিত্ত যাহা উপযুক্ত হেতু নহে, তাহাই হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতু।

লাভ হয় *। তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র হেতু। প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎসম্বন্ধে এবং প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞান পরোক্ষভাবে মুক্তির হেতু হয়। এখন এই প্রমেয় ও প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই অপবর্গ লাভ হয়, তবে সংশয় প্রভৃতি অপর চতুর্দ্দশবিধ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রমেয় ও প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যার্থ আবশ্যক হয়। এই ষোড়শ-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞানের নাশ হয়, মিথ্যাজ্ঞানের নাশে দোষ, দোষের নাশে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির নাশে জন্ম ও জন্মের নাশে দুঃখ নিবারিত হয় (১)। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য।

(ঢ) অপর পক্ষ যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া, তাহার সিদ্ধান্তের উপর যে দোষারোপ করা, তাহার নাম ছল।

(ণ) হেতুর প্রকৃত ব্যাপ্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, দৃষ্টান্তের সহিত হেতুর কেবল অবান্তর সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাহাতে যে দোষারোপ করা যায় তাহার নাম জাতি।

(ত) এক পক্ষ যে কথা বলিয়াছে অপর পক্ষ তাহার প্রতি অযথা আপত্তি তুলিয়াছে ইহা প্রমাণিত হইলে, অথবা অপর পক্ষ সে কথা বুঝিতেই পারে নাই ইহা প্রমাণিত হইলে, অপর পক্ষের পরাজয় হয়। এই প্রথায় যে বিচার হয় তাহার নাম নিগ্রহস্থান্।

* প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদজল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। ন্যায়দর্শনম্।১।১।১।

(১) দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ন্যায়দর্শনম্।১।১।২।

জন্ম গ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সুতরাং জন্ম নিবারণ না করিতে পারিলে দুঃখের একান্ত বিনাশ হইবে না। প্রবৃত্তি হেতুই জীব কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মফল ভোগের জন্যই জীবের জন্ম হয়, রাগ (অনুরাগ, আসক্তি), বিদ্বেষ ও মোহ (ভ্রান্তি) এই ত্রিবিধ দোষ হইতেই জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এবং মিথ্যাজ্ঞানই এই ত্রিবিধ দোষের হেতু। সুতরাং কারণ-পরম্পরায় দেখা যাইতেছে মিথ্যাজ্ঞানই দুঃখের মূল হেতু। এই মূল হেতুর উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেই, ইহার পরবর্ত্তী কারণগুলি বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায়, দুঃখের চির-অবসান হয়।

ন্যায়ের প্রকৃত দর্শনাংশ ইহার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় আহ্নিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে; আত্মা দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু ও তিনিই ভোক্তা এবং জ্ঞাতা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই জীবের কর্ম্মফল-দাতা; রূপ-রসাদি ভোগ্য বিষয়সকল অনাত্ম পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হেতু ঐ সকলে আসক্তি দ্বেষ প্রভৃতি জন্মে, এবং ভ্রম বশতঃই দেহে আত্মবুদ্ধি হয়,—এই সকল জীব যখন বুঝিতে পারে তখন সে মোক্ষ-লাভে যত্ন করে; মোক্ষলাভ জীবের পক্ষে সম্ভব, জ্ঞানী পুরুষের নিকট যোগবিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিয়া সমাধি অভ্যাস করিতে হয়, সমাধি দ্বারা মোক্ষের হেতুভূত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়; এই সব বিষয় সুন্দররূপে ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাঁহারা মোক্ষকামী তাঁহাদের এই সব বিষয়ই জানা প্রয়োজন, এবং ইহাই এ দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধক প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে নিজের নিশ্চিত তত্ত্বগুলিকে যাহাতে রক্ষা করিতে পারেন তাহার জন্যই জল্প, বিতণ্ডা, ছল, জাতি প্রভৃতি বিচার-কৌশলগুলি ইহাতে লিখিত হইয়াছে,

বস্তুতঃ কোন বিষয় লইয়া প্রতিপক্ষের সহিত বৃথা বিচারে সময়ক্ষেপ উহার উদ্দেশ্য নহে।

* ৩। পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনে শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ বিচার করিয়া শব্দ নিত্য পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে, এবং বিশেষ বিচার দ্বারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিবিধ বচনের সামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে। এই দর্শনের মতে বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। স্বর্গই নিত্য সুখের আকর। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে এবং চরম সুখ ভোগ করিতে হইলে, স্বর্গ লাভ করা মানবের একান্ত আবশ্যক। বেদোক্ত যজ্ঞই স্বর্গলাভের উপায়। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হইলেও ঐ সকল দেবতা গৌণ, যজ্ঞই মুখ্য, কারণ দেবতার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই (১), দেবতাসকল মন্ত্রাত্মক, মন্ত্রই দেবতার রূপ। মন্ত্রসকল বেদে যে ভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে, কোন ফললাভ হইবে না। যজ্ঞসকল যথাযথরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, সাধক স্থূলদেহান্তে জরামৃত্যুরহিত হইয়া সর্ব্বসুখের আকর স্বর্গ লাভ করিবেন। যজ্ঞফল দানের জন্য পৃথক্ ঈশ্বরের আবশ্যকতা এই দর্শনে উল্লিখিত হয় নাই। মীমাংসাদর্শনকার কর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহার মতে কর্ম্মই ফলদানে সমর্থ। কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য তিনি

---

* তুলনার সুবিধার জন্য পূর্ব্বমীমাংসার আলোচনা, উত্তরমীমাংসার অব্যবহিত পূর্ব্বে না করিয়া, এইস্থানে করা হইল।

(১) দেবতা বা প্রযোজয়েৎ অতিথিবদ্ ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ।

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনম্ ।৯।১।৬

অপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাৎ যজ্ঞকর্ম্মপ্রধানং স্যাৎ গুণত্বে দেবতাশ্রুতিঃ।

ঐ ।৯।১।৯

বেদের জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১)। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি করিলে সেই আত্মা দেহান্তে স্বর্গে অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করে, স্থতরাং প্রত্যেকেরই যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত, ইহাই প্রতিপাদন করা এই দর্শনের মতে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য।

(সংসার দুঃখময় এবং সাধনার দ্বারা নিত্যস্থখ লাভ হয়, ইহা দেখানই এ দর্শনেরও উদ্দেশ্য। নিম্নস্তরের সাধক বিষয়-স্থখের অধিক কিছু ভাবিতে পারে না, সেইজন্য দুঃখসংস্পর্শহীন বিষয়স্থখরূপ স্বর্গ-স্থখই তাহার নিকট চরম আদর্শ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই শ্রেণীর সাধকের বিচারশক্তি নিতান্তই কম, বাসনা-ত্যাগ ব্যতীত পরা শান্তি লাভ হয় না ইহা বুঝিবার শক্তি তাহাদের নাই, স্থতরাং চিত্তশুদ্ধিকর বেদোক্ত কর্ম্মই তাহাদের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া এবং সাধনার দ্বারা জ্ঞানের পরিপাক লাভ করিয়া পরাশান্তিরূপ মুক্তি লাভ করা (২), ইহা ঋষি অর্থাৎ জ্ঞানী হইয়াও পূর্ব্বমীমাংসার রচয়িতা জৈমিনী জানিতেন না বা বুঝিতেন না এরূপ বিবেচনা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এরূপ অনুমান হয় যে, তাঁহার সময় লোকে কর্ম্ম-

---

(১) আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্।

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনম্ ।১।২।১

(২) ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥
উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু॥
ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ॥

বিমুখ ও অলস হইয়া পড়িয়াছিল এবং অলসতার সমর্থন জন্য তত্ত্বজ্ঞানের কথা মুখে আবৃত্তি করিয়া বিপক্ষকে নিরস্ত করিত। ব্যবহারিক জগৎ অসার হউক, অনিত্য হউক, এখানে যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ দুঃখ-ক্লেশ আসিয়া দেখা দেয়, ইহা কে না জানে? যাঁহাদের প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হয় নাই, যাঁহারা বিষয়ের মধ্যে রহিয়াছেন, বিষয়-ভোগের লালসাও যাঁহাদের যায় নাই, তাঁহাদের মুখে কর্ম্ম-ত্যাগের কথা অলসতারই নামান্তর মাত্র। বিশেষতঃ জৈমিনীর সময়ে হয় ত অধিকাংশ লোকই নিষ্কাম কর্ম্মের মধুময় ফলের কথা বুঝিতে সক্ষম ছিল না। তাই, স্বর্গে অনন্ত সুখ ভোগ করা যায়, সেখানে দুঃখের লেশ মাত্র নাই, এই লোভ দেখাইয়া মানুষকে পবিত্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। আর কর্ম্মে যাহাতে লোকের আগ্রহ জন্মে এবং প্রবৃত্তি হয়, তাহার জন্যই এ দর্শনে বেদের জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্ম-বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সম্বন্ধে নিরর্থক অর্থাৎ ফলপ্রদ নহে বলিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, সকাম কর্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ সুখ-দুঃখাদি নানাবিধ ফল-ভোগের পর দুঃখরাশির মূল কারণ যে বাসনা তাহার উপর মানুষের অশ্রদ্ধা আসে, এবং সেই সময়েই সে জ্ঞান-চর্চ্চার প্রকৃত অধিকারী হয়।)

৪। সাংখ্যদর্শনের মতে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও

এবং ব্যবসিতং কচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥
কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তা স্বং লোকং ন বিন্দতি তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১১।২১।২৩-২৭।

আধ্যাত্মিক (১) এই ত্রিবিধ দুঃখ নিঃশেষরূপে দূর হওয়ার নামই পরম পুরুষার্থ বা মুক্তি (২)। জগতের সুখ অতি অল্প এবং দুঃখ-মিশ্রিত, সুতরাং তাহাও দুঃখ বলিয়া ধরা যায় (৩)। সংসারের দুঃখ লৌকিক উপায়ে নিবৃত্ত হইলেও আবার দুঃখ আসে। বৈদিক যজ্ঞাদি দ্বারা যে দুঃখ নিবারণ তাহাও অস্থায়ী, কারণ স্বর্গ-ভোগান্তে আবার জীবলোকে আসিতে হয়। সুতরাং দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায় জ্ঞান (৪)—প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তুতে বিতৃষ্ণার নাম পর বৈরাগ্য। পর বৈরাগ্য লাভ হইলে প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে, এবং এই জ্ঞান জন্মিলে, পাক শেষ হইলে পাচকের যেমন কোন কাজ থাকে না, সেইরূপ পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির কোন ক্রিয়া থাকে না (৫)। নৃত্য শেষ

---

(১) ভূত অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতাদি হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায় তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ; দৈব অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, ভীষণ বর্ষা, অসহনীয় উত্তাপ, প্রবল ঝঞ্ঝা ইত্যাদি দৈব ঘটনা হইতে যে দুঃখ তাহাই আধিদৈবিক দুঃখ; আর আত্মা বা শরীর অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ অর্থাৎ পীড়া প্রভৃতি হইতে শরীরের যে কষ্ট এবং কাম, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি হইতে জাত মনের যে কষ্ট তাহাই আধ্যাত্মিক দুঃখ।

(২) অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্।

(৩) কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি। তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ। ঐ ।৬।৭-৮।

(৪) জ্ঞানান্মুক্তিঃ। ঐ ।৩।২৩।

(৫) বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে।

ঐ ।৩।৬২।

হইলে নর্ত্তকী যেমন নিরস্ত হয়, সেইরূপ পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের জন্য প্রবৃত্তা প্রকৃতি পুরুষের অপবর্গের পর নিরস্ত হয়েন (১)। প্রকৃতিতে যে পরিণামিত্ব এবং দুঃখিত্ব দোষ আছে তাহা পুরুষ বুঝিতে পারিলে প্রকৃতি আর তাহার নিকটবর্ত্তী হন না, লজ্জায় কুলবধূর ন্যায় দূরে পলায়ন করেন (২)। এই অবস্থায় প্রকৃতির সকল কাজ থামিয়া যায়, সুতরাং সর্ব্ববিধ দুঃখের চিরনিবৃত্তি হয়। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

সাংখ্যকারের মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতি হইতে (অর্থাৎ প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে) মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রা ও উভয়বিধ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) এবং পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পঞ্চমহাভূত—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, আর পুরুষ বা আত্মা এক তত্ত্ব (৩)। প্রকৃতির পৃথক্ কেহ নিয়োজক নাই, ইনি আপনা আপনি পরিণত হয়েন। ইনি অচেতন বলিয়া নিজে কিছু ভোগ করেন না, কেবল পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য, উষ্ট্র যেমন কুঙ্কুম বহন করে, দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয়, এক ঋতুর পর আর এক ঋতু যেমন আপনি আইসে, ভৃত্যেরা স্বভাবতঃই যেমন সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, সেইরূপ ইনিও স্বতঃই

---

(১) নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্ ।৩।৬৮।

(২) দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ। ঐ ।৩।৬৯।

(৩) সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। ঐ ।১।৬১।

জগৎ সৃষ্টি করেন (১)। জগৎ রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় একেবারে মিথ্যা নহে (২)। বেদ নিত্য নহে, কারণ শ্রুতিতে ইহার উৎপত্তির উল্লেখ আছে (৩), তবে ইহা অপৌরুষেয়। শব্দও নিত্য নহে, কারণ ইহার উৎপত্তি দেখা যায় (৪)। আত্মা এক নহে বহু, কারণ প্রকৃতি কোন পুরুষকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং কোন পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন (৫)। স্বতন্ত্র নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই। যে সাধকের মহদাদি তত্ত্বে বিরাগ জন্মিয়াছে অথচ সম্পূর্ণ বিবেকজ্ঞান জন্মে নাই, এরূপ ব্যক্তি মুক্ত না হইয়া চরমে প্রকৃতিতে লীন হয়েন এবং পরকল্পে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর হয়েন, এরূপ ঈশ্বরের কথা সাংখ্যকার স্বীকার করেন (৬)। মুক্তিলাভের সাধন যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, আসন, ধারণা ও ধ্যান তাহার কথা এই দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সমাধি সুষুপ্তি ও মুক্তিকালে অর্থাৎ বিদেহ-কৈবল্যকালে সাধক ব্রহ্মরূপ

---

(১) প্রধানসৃষ্টিঃ পদার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ। অচৈতন্যত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতম্ প্রধানস্য। কর্ম্মবদ্দৃষ্টে কালাদেঃ। স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ ভৃত্যবৎ। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্।৩।৫৭-৬০।

(২) জগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্যত্বাদ্ বাধকাভাবাচ্চ। ঐ।৬।৫২।

(৩) ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ। ঐ।৫।৪৫।

(৪) ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ। ঐ

(৫) নাদ্বৈতমাত্মনো লিঙ্গাত্তদ্ভেদপ্রতীতেঃ ঐ।৫।৬১।

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ। ঐ।৬।৪৫।

(৬) ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানম্। অকার্য্যত্বে তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাৎ। স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা। ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্।৩।৫৩-৫৬।

হয়েন (১), কিন্তু সমাধি ও সুষুপ্তিকালে সবীজ ব্রহ্মরূপে এবং বিদেহ-কৈবল্যে নির্ব্বীজ ব্রহ্মরূপে স্থিতি হয়, অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্তিতে সংসার-বীজ নিহিত থাকায় পুনরুত্থান হয়, কিন্তু বিদেহ-কৈবল্যে তাহা না থাকায় পুনঃ সংসার হয় না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বমীমাংসাকার শব্দ ও বেদ নিত্য বলেন, আর সাংখ্যকার উহাদিগকে অনিত্য বলেন। অতি নিম্নস্তরের সকাম সাধক, যিনি স্বর্গসুখের উপরে আর কিছু ধারণা করিতে পারেন না, পূর্ব্বমীমাংসাকার তাঁহারই জন্য দর্শন লিখিয়াছেন, আর সাংখ্যকার সমুদায় সৃষ্ট বস্তুতে বিরাগ লাভ করিতে পারেন এরূপ সাধকের জন্য লিখিতেছেন, তিনি উচ্চতর সত্যের কথা লিখিতেছেন, সুতরাং যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু যে অনিত্য ইহা বলা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

বৈশেষিকদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জগতের উপাদান পরমাণু, কিন্তু সাংখ্যের মতে প্রকৃতিই বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগতের উপাদান-রূপে পরিণত হয়েন। এ স্থলেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, স্থূলবুদ্ধি সাধক স্থূল জগতের উপাদান যে স্থূলেরই অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশ ইহার অধিক ধারণা করিতে পারে না, সেই জন্যই পরমাণু স্থূল জগতের আদি উপাদান বলিয়া বৈশেষিকদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সাংখ্যদর্শন যে শ্রেণীর সাধকের জন্য লিখিত হইয়াছে তাঁহারা স্থূল ভূতের পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণায় সমর্থ, এই হেতু সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থারও কারণীভূত প্রকৃতিই জগতের আদি কারণ বলিয়া তাঁহাদের নিকট উল্লিখিত হইয়াছে।

আত্মার সগুণভাবে বহুত্ব স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। সেই আত্মারই মুক্তি

---

(১) সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্।৫।১১৬।
দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তদ্ধতিঃ। ।৫।১১৭।

হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ বহু জীবাত্মা গুণাতীত হইলে অর্থাৎ সকল প্রকারের উপাধি ত্যাগ করিলেও যে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ থাকিবে, ইহা কোন যুক্তিতেই দাঁড়ায় না; কারণ পৃথক্ পৃথক্ থাকা স্বীকার করিলেই তাহারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং উপাধিযুক্ত, হইয়া পড়ে। তবে আর তাহারা নিরুপাধি বা নির্গুণ হইল কি প্রকারে? কপিলের ন্যায় অত বড় দার্শনিক কি এইটী বুঝিতেন না? উপরন্তু তিনি নির্গুণ আত্মারও বহুত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ দুইটী বিভাব। তিনি নিজ অবিচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে নির্গুণ থাকিয়াও মায়ার সহযোগে নিজের একাংশে সগুণ ভাব প্রাপ্ত হয়েন, এই সমষ্টি সগুণ ভাবে থাকিয়াও ব্যষ্টি সগুণ ভাবে জীব-রূপে প্রকাশ পান, এবং সেই জীবেরই কেহ কেহ সাধনা-বলে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয়েন বা ব্রহ্মে লীন হয়েন,—এই সমস্ত উচ্চতম তত্ত্ব যে স্তরের লোকের বোধগম্য হয় না, তাঁহাদের জন্য সাংখ্যদর্শন রচিত হইয়াছিল। সাংখ্যকার সমষ্টি সগুণ ঈশ্বর না মানিলেও, কৈবল্য-মুক্তিতে জীব ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয় বলায় (১), প্রকারান্তরে ঐ সকল সত্য স্বীকার করিয়াছেন।

৫। পাতঞ্জল-দর্শনের চারিটী পাদ বা অধ্যায়,—সমাধিপাদ, সাধন পাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধের দ্বারা যোগের প্রকৃত স্বরূপ যে সমাধি তাহা লাভ হয়, ইহাই প্রথম পাদে বিবৃত হইয়াছে। সমাধি লাভের উপায় স্বরূপ তপস্যা (বা অষ্টাঙ্গ যোগ), স্বাধ্যায় (বা ঈশ্বরবাচক শব্দসমূহের কোনটীর জপ, অধ্যাত্মবিদ্যার

---

(১) সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্।৫।১১৬।

দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তদ্ধতিঃ। ঐ ।৫।১১৭।

চর্চ্চা ও বেদাভ্যাস), এবং ঈশ্বর-প্রণিধান (বা নিষ্কামভাবে ঈশ্বরে ভক্তি) এই ক্রিয়া-যোগসকলের বিষয় দ্বিতীয় পাদে লিখিত হইয়াছে। দেহের স্থানবিশেষে অথবা দিব্য মূর্ত্তিবিশেষে একান্ত মনঃসংযোগ দ্বারা ঐ ক্রিয়াযোগ বা সাধনার গৌণ ফল স্বরূপ যে বিবিধ বিভূতি (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতা) লাভ হয়, তাহার বিষয় তৃতীয় পাদে উক্ত হইয়াছে। সাধনার প্রকৃত বা মুখ্য ফল কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ, তাহার বিষয় চতুর্থ পাদে বর্ণিত হইয়াছে। এই দর্শনে তত্ত্ববিচার কিছুই করা হয় নাই, কেবল সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত ঈশ্বর নামক একটী অধিক তত্ত্ব যোগ করা হইয়াছে, এজন্য ইহাকে সেশ্বর সাংখ্যও বলে। সাংখ্যদর্শনে যে প্রকার প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ জ্ঞান লাভের জন্য যোগ অবলম্বন করা আবশ্যক, সেই যোগের কথাই ইহাতে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। বৈশেষিক, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনে যোগের কথা অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এ দর্শনে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল যোগের কথাই আলোচিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহা যোগদর্শন নামে কথিত হয়। ঈশ্বর স্বীকার করা ব্যতীত ইহা যখন সাংখ্যের সহিত একমত, তখন সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই ইহার সম্বন্ধেও বক্তব্য।

৬। বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিবার পূর্ব্বে ইহার নামের সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক ও ইহার মত লইয়া যে বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছে তাহাও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক।

বেদের দুইটী কাণ্ড বা অংশ,—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্ম-কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় যজ্ঞাদি ও তাহার ফল, আর জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব। জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত উপনিষদ্‌-সমূহেই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত, কারণ উহা বেদের অন্ত

অর্থাৎ শেষ অংশ; অথবা উহা দ্বারা বেদের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সুতরাং তখন বেদ অন্ত হয় অর্থাৎ বেদের আর প্রয়োজন থাকে না। উপনিষদ্‌সমূহের মতভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য এই দর্শন রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম বেদান্তদর্শন বা উত্তরমীমাংসা।

এই দর্শনে শ্রুতির সমস্ত বিরোধ মীমাংসিত হইয়াছে, এবং বেদের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দর্শন, ইহাই আধ্যাত্মিক চিন্তা-শক্তির চরম পরিণতি। অন্যান্য দর্শন সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই দর্শনের প্রতিপাদিত বিষয় তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, বেদরূপ সমুদ্র-মন্থনে এরূপ অমৃত আর উঠে নাই। তাই সকল সম্প্রদায়ই এই অমৃতের আস্বাদ লাভের জন্য লালায়িত। কিন্তু মানুষের রুচি ও বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, কাজেই তাহাদের অনুভূতি এবং ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সেই জন্য বেদান্ত-দর্শন এক এক সম্প্রদায়ের দ্বারা এক এক ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এই দর্শনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সত্যের নির্ণয় করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের তত্ত্ব উপনিষদ্‌সকলের সমন্বয় দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রদায়সকল নিজ নিজ ভাবের অনুকূল শ্রুতি-বচনসকল উল্লেখ করিয়া বেদান্ত-দর্শনের সূত্রগুলিকে নিজ নিজ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপে অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদিগণ সকলেই বেদান্ত-দর্শনকে আপন আপন মতের পোষক করিয়া লইয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের মত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

অদ্বৈতবাদের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ। জীব, ঈশ্বর ও জগতের ব্যবহারিক সত্তা বই কোন সত্তাই নাই, এ সকল মায়ার খেলা মাত্র। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন; জীব ঈশ্বর ও জগৎ এ সকল স্বরূপতঃ ব্রহ্মই;

যাহা কিছু ভেদ-দর্শন হয়, তাহা মায়াবশতঃ ভ্রান্তি জন্যই হইয়া থাকে, পারমার্থিক জ্ঞানের উদয়ে এই ভ্রান্তি দূর হইলে একমাত্র ব্রহ্মই প্রকাশ পান,—যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্পভ্রম হইলে যখন সেই ভ্রম দূর হয় তখন আর সর্প-বোধ থাকে না, রজ্জুই দেখা যায়। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এবং শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি হইতেছে, ইহাকে বিবর্ত্ত-বাদ বলে (১)। পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হইলে জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয়, ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যায়। ইহাই জীবের মুক্তি। শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষট্‌সম্পত্তি যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও বেদান্তবাক্য-বিচারই পারমার্থিক-জ্ঞান-লাভ ও মুক্তির সাধন।

বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের মতে ব্রহ্ম সগুণ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় গুণের আকর। কোন প্রকার দোষ অর্থাৎ মন্দ গুণ তাঁহাতে নাই, এই অর্থে তিনি নির্গুণ। জীব ঈশ্বর ও জগৎ তিনটী পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, ইহার মধ্যে দৃশ্যমান জগৎ জড় পদার্থ, আর জীব ও ঈশ্বর অজড় বা চিৎ পদার্থ। জীব ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য এবং ঈশ্বর এই দুইয়ের অন্তর্যামী ও নিয়ামক। এই তিন পৃথক্ পদার্থ থাকিলেও দ্বৈত সিদ্ধ হয় না, কারণ ঈশ্বর জীব ও জগতের অন্তর্যামী বলিয়া জীব ও জগৎ বা পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহার শরীর মাত্র। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্মের দুইটী ভাব—কারণ ও কার্য্য। প্রলয়ে যখন জীব ও জগৎ নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে লীন হয় তখন ব্রহ্মের কারণ অবস্থা, এবং সেই নামরূপবিহীন পুরুষ-প্রকৃতি বা জীব-জগৎ তখন ব্রহ্মের শরীর। আবার সৃষ্টিকালে যখন পুরুষ নাম-রূপের বিভাগ গ্রহণ করিয়া স্থূলভাব ধারণ করেন তখন ব্রহ্মের কার্য্য অবস্থা, এবং এই

---

(১) যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে তাহাই দেখার নাম বিবর্ত্ত।

স্থূলভাব-প্রাপ্ত পুরুষ-প্রকৃতিই তখন ব্রহ্মের শরীর। জীব নিত্য, সুতরাং জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। ব্রহ্মের ন্যায় গুণসম্পন্ন হওয়া ও ব্রহ্মধামে গমনই জীবের মুক্তি। এই মতে, ভগবান্ লীলাবশতঃ পঞ্চ রূপে অবস্থান করিতেছেন--অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম এবং অন্তর্যামী। সিদ্ধি-লাভের জন্য সাধকের সাধনারও পাঁচটী স্তর আছে। সাধক প্রথম অর্চ্চা অর্থাৎ ভগবানের স্থূল মূর্ত্তি প্রভৃতির পূজা করেন। ইহা দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলে, বিভব অর্থাৎ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারের পূজায় তাঁহার অধিকার হয়। অবতারের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিলে সাধক বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই চতুর্ব্ব্যূহের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ব্যূহ-উপাসনার পর তিনি সূক্ষ্ম (অর্থাৎ পাপহীনতা, রজঃ-শূন্যতা, মৃত্যু-রাহিত্য, শোক-হীনত্ব, অক্ষরত্ব এবং কামনা ও সঙ্কল্পের সত্যতা এই পূর্ণ ছয়গুণযুক্ত) পরব্রহ্মের উপাসনায় অধিকারী হয়েন, এবং সর্ব্বশেষে অন্তর্যামী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও সকল জীবের নিয়ামক আত্মার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হয়েন (১)।

দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য উপরোক্ত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের সকল কথাই মানিয়া লইয়াছেন, তবে তাঁহার মতে সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ সম্পন্ন বাসুদেবই বেদান্তের ব্রহ্ম। ইনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং জীবের নিয়ামক নারায়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভগবান্ বাসুদেবের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে যখন ভক্তের অহং জ্ঞান দূর হয়, তখন বাসুদেবের চিদ্ঘনমূর্ত্তি ভক্তের ভিতরে-বাহিরে প্রকটিত হয় এবং তিনি জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম

(১) অর্চ্চোপাসনয়াক্ষিপ্তে কল্মষেঽধি ততো ভবেৎ।
বিভবোপাসনে পশ্চাদ্ব্যূহোপাস্তৌ ততঃ পরম্।
সূক্ষ্মে তদনু শক্তঃ স্যাদন্তর্যামিণমীক্ষিতুম্॥

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহম্।

করিয়া বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করেন। ইহাই ভক্তের মুক্তি। দ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য বলেন অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণই মুমুক্ষু জীবের উপাস্য। তাঁহার মতে অন্যপ্রকার ভক্তি অপেক্ষা রাগমার্গ ও মধুরভাবে ভজনই শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর জীব-জগৎ তাঁহার প্রকৃতি, সুতরাং প্রকৃতিভাবে তাঁহার ভজনা করিতে হয়। তাঁহার কৃপায় গোপী-ভাব প্রাপ্ত হইয়া, নিত্যানন্দপূর্ণ রাসে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজন করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। মূর্ত্তিমতী প্রেমরূপিণী রাধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রকৃতি এবং তাঁহার অঙ্গচ্ছটাই বেদান্তের ব্রহ্ম।

উপরোক্ত কোন মতেরই পক্ষপাতী না হইয়া, বেদান্ত-দর্শনের বাক্য-গুলি সরলভাবে গ্রহণ করিলে, আমরা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হই :—

বেদে নানা স্থানে ইন্দ্র, প্রাণ, আকাশ, জ্যোতি, বৈশ্বানর প্রভৃতিকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মের আরোপ মাত্র, ইহাতে তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মত্ব বুঝায় না, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য (১)। ব্রহ্ম কোন রূপাদি-বিশিষ্ট নহেন (২)। তাঁহার দুইটী অবস্থা, সগুণ ও নির্গুণ। তাঁহার নির্গুণ ভাব অব্যক্ত (৩)। আবার শ্রুতি ও স্মৃতিতে দেখা যায় যে, সংরাধন-সময়ে অর্থাৎ ভক্তি ধ্যান প্রণিধান ইত্যাদির অনুষ্ঠান-সময়ে তিনি যোগীর ধ্যানগম্য হয়েন (৪), সুতরাং তিনি সগুণ। সর্প বিস্তৃত হইয়াই থাকুক আর কুণ্ডলিত হইয়াই থাকুক, উভয় অবস্থায়ই উহা সর্প

---

(১) অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ। বেদান্তসূত্রম্ ।৩।২।৩৭।
(২) অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ। ঐ ।১।২।২১।
(৩) তদব্যক্তমাহ হি। ঐ ।৩।২।২৩।
(৪) অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। ঐ ।৩।২ ২৪।

ভিন্ন আর কিছু নহে (১), সেইরূপ সগুণ আর নির্গুণ দুইটী অবস্থা মাত্র, কিন্তু উভয় অবস্থায় এক ব্রহ্মই আছেন; আর এই অবস্থা তাঁহার যুগপৎ থাকা সম্ভব, কারণ তাঁহার শক্তি অতি বিচিত্র (২)। বৈশেষিক ও সাংখ্যদর্শনের এবং শক্তিবাদী ও শূন্যবাদীদের মত ঠিক নহে; জড় পরমাণু, জড়া প্রকৃতি, শক্তি বা শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সগুণ ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মই ঈশ্বর জীব ও জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন (৩)। জগৎ সত্য; উহা একেবারে বাজিকরের ভেল্কির ন্যায় মিথ্যা নহে (৪)। জীব ব্রহ্মেরই অংশ (৫); সুতরাং জীবের স্বরূপে ও ব্রহ্মে পরিমাণে ভেদ, প্রকারে ভেদ নাই, উভয়েই সচ্চিদানন্দ (৬)। তবে জীব আত্মজ্ঞানের অভাব-বশতঃ দুঃখ পাইতেছে (৭)। এই আত্মজ্ঞানহীন জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ ও

---

(১) উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ। বেদান্তসূত্রম্ ।৩।২।২৭।

(২) আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ হি। ঐ ।২।১।২৮।

(৩) কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ। সমাকর্ষাৎ। বেদান্তদর্শনম্ ।১।৪।১৪-১৫।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। অভিধ্যোপদেশাচ্চ। সাক্ষাচ্চোভয়নাম্নাৎ। আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ। যোনিশ্চ হি গীয়তে। বেদান্তদর্শনম্ ।১।৪।২৩-২৭।

(৪) অনুস্মৃতেশ্চ। নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ। বেদান্তদর্শনম্ ।২।২।২৫-২৬। নাভাব উপলব্ধেঃ। ঐ ।২।২।২৮।

(৫) অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে। বেদান্তদর্শনম্ ।২।৩।৪৩।

(৬) ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ। ঐ ।২।১।১৩।

(৭) বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি। ঐ ।২।১।৩৪।

সাদৃশ্য উভয়ই আছে। জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, বিম্ব সূর্য্য আর তাহার প্রতিবিম্ব ভিন্ন না হইলেও, জল যখন কম্পিত হয় জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যও তখন কম্পিত হয়, কিন্তু বিম্বরূপী সূর্য্য কম্পিত হয়েন না। সেইরূপ জীব স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিজ কর্ম্ম-বশে দুঃখিত হইতেছে, কিন্তু বিম্বরূপী পরমেশ্বরকে সেই দুঃখ স্পর্শ করিতেছে না(১)। ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইলে জীবের নিশ্চয়ই মুক্তি হয় (২), কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান না হইলে ব্রহ্মৈকত্বরূপ মুক্তি লাভ হয় না (৩)। বিদ্যা উৎপন্না হইলে মুক্তি দান বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা রাখেনা বটে, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান বিনা বিদ্যা বা জ্ঞান জন্মে না (৪)। আশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, শম-দমাদি সাধন জ্ঞান লাভের সহায়তা করে (৫), কিন্তু শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই আত্মজ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ সাধন। মুক্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ সাধন করিতে হয় (৬)। শ্রুতিতে ব্রহ্ম-লাভের জন্য নানা প্রকার উপাসনা

---

(১) আভাস এব চ। বেদান্তদর্শনম্ ।২।৩।৫০।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ। অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্। বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্। ঐ ।৩।২।১৮-২০।

(২) পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ। ঐ ।৩।৪।১।

(৩) যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্। ঐ ।৩।৩।৩২।

(৪) অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা। ঐ ।৩।৪।২৫।

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববৎ। ঐ ।৩।৪।২৬।

(৫) বিহিতত্বাদাশ্রমকর্ম্মাপি। সহকারিত্বেন চ। ঐ ।৩।৪।৩২-৩৩।

শমদমাদ্যুপেতস্তু স্যাৎ তথাপি তু তদ্‌বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। ঐ ।৩।৪।২৭।

(৬) আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। লিঙ্গাচ্চ। ঐ ।৪।১।১-২।

আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্। ঐ ।৪।১।১২।

বিহিত হইয়াছে, সেই সকল উপাসনাকে অহংগ্রহ প্রতীক ও অঙ্গাশ্রিত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহার মধ্যে অহংগ্রহ-উপাসনা অর্থাৎ ব্রহ্মকে নিজের আত্মা-রূপে জানিয়া যে উপাসনা তাহাই শ্রেষ্ঠতম (১)। সাধনার সিদ্ধির জন্য ধ্যান, উপযুক্ত আসন এবং স্থানেরও প্রয়োজন আছে (২)। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না (৩)। এরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি হৃদয়স্থ দেবতার অনুগ্রহে, দেহে এক শতের অধিক যে একটী নাড়ী আছে অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ী, তাহা দ্বারা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়েন (৪)। এক্ষণে, যাঁহারা কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন তাঁহারা মুক্ত হইয়া অর্চ্চি, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সম্বৎসর প্রভৃতি আতিবাহিক পুরুষ কর্ত্তৃক ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে নীত হইবার পর ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মার বা হিরণ্য-গর্ভের লোকে) গমন করেন, এবং মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে

---

(১) নানাশব্দাদিভেদাৎ।　　　বেদান্তদর্শনম্ ।৩।৩।৫৮।
আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।
ন প্রতীকে ন হি সঃ। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।
আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ।　　ঐ　　।৪।১।৩-৬।

(২) আসীনঃ সম্ভবাৎ। ধ্যানাচ্চ। অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।　　ঐ　।৪।১।৭-৯, ১১।

(৩) তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।
অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ।　ঐ　।৪।১।১৩, ১৫।

(৪) গত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহিতঃ শতাধিকতয়া।
ঐ　।৪।২।১৭।

লীন হয়েন (১)। যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীরও থাকেনা, তাঁহারা পরব্রহ্মেই লীন হইয়া যান (২)। তবে যাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীর ব্রহ্মলোকে থাকে, আর যাঁহারা পরব্রহ্মে লীন হয়েন তাঁহাদের আনন্দ ভোগের একটু তারতম্য আছে। উভয়েই জগৎ-সৃষ্টি আদি ব্যাপার ছাড়া ঈশ্বরের আর সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যই ভোগ করেন; কিন্তু যাঁহাদের সূক্ষ্ম শরীর থাকে তাঁহারা জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় ভোগ করেন, আর যাঁহাদের শরীর থাকেই না তাঁহারা স্বপ্ন অবস্থার ন্যায় ভোগ করেন। আর এই সকল সুখ সৌরমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ (৩)। এই যে দুই প্রকার মুক্ত

---

(১) অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ। আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ। উভয়-ব্যমোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ। কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ। কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ। বেদান্তদর্শনম্ ।৪।৩।১, ৪, ৫, ৭, ১০।

(২) বিশেষঞ্চ দর্শয়তি। ঐ ।৪।৩।১৬।

তানি পরে তথাহ্যাহ। অবিভাগো বচনাৎ। ঐ ।৪।২।১৫-১৬।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ। ঐ ।৪।৪।৪।

(৩) ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ। চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্ম-কাদিতি ঔড়ুলোমিঃ। ঐ ।৪।৪।৫-৬।

এবমুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ। সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ। অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ। অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্। ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ। দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপদ্যতে। ভাবে জাগ্রদ্বৎ। প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি। স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি। জগদ্-ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতাচ্চ। প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্ন আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ। বেদান্তদর্শনম্। ।৪।৪।৭-১৮।

ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ। ঐ ।৪।৪।২১।

জীবের কথা হইল, ইঁহাদের কাহাকেও আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না (১), তবে কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসক ক্রমে চরম মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়েন। মুক্তিই সাধনার চরম ফল, ইহাই অমৃতত্ব-লাভ, ইহাই পরম পুরুষার্থ।

এইরূপে ছয়টী দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈশেষিক ও স্থায় দর্শন দেহাত্মবাদী সাধকদিগের হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উন্মেষ করিবার জন্য লিখিত; যাঁহাদের চিন্তাশক্তি তেমন প্রবল নহে, জগতের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুখ ছাড়া যাঁহারা বড় কিছু ধারণা বা অভিলাষ করিতে পারেন না, তাঁহাদের যাহাতে উচ্চ স্তরের সাধনায় আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুখ অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠতর সুখ আছে—যাহা অক্ষয় ও উৎকৃষ্টতম—তাহা লাভের জন্য যাহাতে চেষ্টা আসে, সেই উদ্দেশ্যেই ঐ দুই দর্শন লিখিত, সুতরাং উহাতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-তত্ত্ব-বিষয়ের আলোচনা তেমন কিছু নাই, জগৎ আপাততঃ যেমন দৃষ্ট হয় তাহারই ব্যাখ্যা উহাতে দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন, কেবল সকাম সাধকদিগের যাহাতে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মফলের অস্থায়িত্ব ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া বিবেক বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, তাহারই জন্য লিখিত। পুরুষ ও প্রকৃতির, চেতন ও জড়ের, অধিক উচ্চতর তত্ত্ব ভাবিবার সামর্থ্য যে সকল সাধকের নাই, তাহাদের জড়বাদে বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য সাংখ্যদর্শন লিখিত। আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু বিকার প্রাপ্ত পদার্থ আছে, তাহার কিছু লাভেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, স্ব-স্বরূপ-লাভই শান্তিলাভের একমাত্র পথ, ইহা দেখানই এ দর্শনের উদ্দেশ্য। এইরূপে অস্থায়ী

(১) অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। বেদান্তদর্শনম্।৪।৪।২২।

জগতে যাঁহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের সাধনার পন্থা বিস্তৃতরূপে দেখানই পাতঞ্জল দর্শনের উদ্দেশ্য, কারণ বৈশেষিক ন্যায় ও সাংখ্য দর্শনে উহা বিস্তারিতরূপে আলোচিত হয় নাই। বেদান্তদর্শন বিবেক বৈরাগ্য ষট্‌সম্পত্তি (অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান) এবং মুমুক্ষুতা এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য লিখিত। এই নিমিত্তই বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে "অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এরূপ উক্ত হইয়াছে (১)। যাহাতে শ্রুতির বিভিন্ন প্রকার বচন ও উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দ্বারা সাধকের চিত্তে কোন প্রকার চাঞ্চল্য না আসে, তাহার জন্যই ঐ সকলের সমন্বয় দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তসমূহ অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অধিকারী-ভেদ জিনিসটী মনে রাখিয়া ঐ সকল দর্শন পাঠ করিলে, উহাদের মধ্যে বিশেষ অসামঞ্জস্য কিছুই পরিলক্ষিত হইবে না, কারণ জীব জগতে দুঃখ ভোগ করিতেছে, এই দুঃখের হাত হইতে যাহাতে সে পরিত্রাণ পায় তাহাই এই ছয়টী দর্শনেরই উদ্দেশ্য, কেবল ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য লিখিত বলিয়া যুক্তি-তর্কগুলি বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে, নচেৎ উদ্দেশ্য সকলেরই এক—মোক্ষ বা পরা শান্তি লাভ। আর এক কথা, অনেকের ধারণা মোক্ষলাভই দর্শনগুলির উদ্দেশ্য, উহা মাত্র দুঃখের অভাব, উহাতে পরম আনন্দের কোন কথা নাই। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দুঃখে ডুবিয়া আছে সেই ব্যক্তিই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি চায়। সংসারে যে সকল অবিবেকী পুরুষ বিষয়-সুখে মগ্ন আছে, তাহারা অন্তর-রাজ্যের কোন ধার ধারে

---

(১) অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। বেদান্তদর্শনম্।১।১।১।

তাৎপর্য্য এই যে, সাধন-চতুষ্টয় লাভের পরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে, তৎপূর্ব্বে নহে।

না। কাজেই যাহাদের দুঃখ বেশী, যাহাদের দুঃখ-মিশ্রিত-সংসার-সুখে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহারাই মুক্তি চায়, দুঃখের নিবৃত্তি চায়,—তাহাদের যে ইন্দ্রিয়লব্ধ সুখের কথা ভাবিবারই সময় নাই। দুঃখে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিলে যদি তখন দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে শান্তি লাভ হয়, এ শান্তি সুখের চেয়ে কম কিসে? রোগের যাতনা দূর হইলে যে কত আনন্দ হয় তাহা রোগীই জানে, অন্যে কি বুঝিবে? ইহা যে প্রাণে পরম আরাম দান করে (১)! তাহার পর কথা হইতেছে, জগতের সুখরাশি যাঁহার আনন্দ-কিরণের এক কণা, সেই আনন্দ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হইলে যে দুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয় তাহা সুখ নহে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ব্রহ্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে আনন্দ লাভ হয় না, এরূপ ধারণা বিড়ম্বনা মাত্র, কেন না ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ। জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে আনন্দময় হইয়া যায়, ইহা অপেক্ষা আর পরম পুরুষার্থ কি হইতে পারে?

---

(১) অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা। যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ। কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি। তদপি দুঃখ-শবলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্যন্তে বিবেচকাঃ। সুখলাভাভাবাদপুরুষার্থ-ত্বমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ। নিগুর্ণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ। পরধর্ম্মত্বেঽপি-তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রম্ ।৬।৫-১১।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:*:—

পুরাণ-সমন্বয়।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত হয় (১), অর্থাৎ ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ, আর যাহারা

---

(১) ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।১।৪।২০।

স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ।৭।১।১।

বেদের মধ্যেও ইতিহাস এবং পুরাণ ছিল। আমরা বর্ত্তমানে যেমন বুঝি যে, যে পুস্তকে কোন দেশের সামাজিক অবস্থা, বিদ্যা শিল্প প্রভৃতির বিবরণ, রাজবংশ সমূহের বৃত্তান্ত, রাজাদিগের কীর্ত্তিকলাপ, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদির কথা, কোন জাতির (nation এর) উত্থান পতন প্রভৃতি ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে তাহাই ইতিহাস, বেদের অন্তর্গত ইতিহাস সে জাতীয় জিনিস নহে। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের (২।৪।১০) ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "ইতিহাস ইত্যুর্ব্বশী-পুরুরবসোঃ সংবাদাদিরুর্ব্বশীহাপ্সরা ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব পুরাণমসদ্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদিঃ" অর্থাৎ উর্ব্বশী ও পুরুরবার কথোপকথনাদিরূপ ব্রাহ্মণভাগের নাম ইতিহাস এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অসৎ ছিল ইত্যাদি সৃষ্টি-বিবরণের নাম পুরাণ। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ঐতরেয়-ব্রাহ্মণোপক্রমে লিখিয়াছেন, "দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃ

অনধিকারী তাহাদিগকে এই সকলের অর্থ বুঝাইবার জন্য যে পুরাণ ও ইতিহাস রচিত হইয়াছে (২), তাহাও অপর এক বেদ নামে কথিত হয়।

প্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্” অর্থাৎ দেবাসুরের যুদ্ধ-বর্ণনা ইত্যাদির নাম ইতিহাস, আর অগ্রে এই জগৎ অসৎ-স্বরূপ ছিল, অন্য কিছুই ছিল না ইত্যাদি জগতের আদি অবস্থা হইতে সৃষ্টি-বর্ণনের নাম পুরাণ। দুই ভাষ্যকারের মত একত্র করিলে এই হয় যে, জগতের আদি হইতে সৃষ্টি-বর্ণনাই বেদোক্ত পুরাণ এবং দেবাসুরের যুদ্ধ-বর্ণনা ও উর্ব্বশী-পুরুরবার কথোপকথনাদির ন্যায় বৃত্তান্তসকল ইতিহাস। কিন্তু বিষ্ণুভাগবতের মতে ও দেবীভাগবতের মতে যে পুরাণ-লক্ষণ এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইবে, তাহা স্মৃত্যুক্ত পুরাণ। (সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণ-মিতি স্মৃত্যুক্তং পুরাণম্। পুরাপি নবং বর্ণপদানুপূর্ব্বীবিভ্রংশেঽপি প্রতিকল্পং তদর্থানাং সর্গাদীনাং সমাননামরূপত্বাৎ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দিতি শ্রুতেঃ।” মহাভারতের আদি পর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়, সপ্তদশ শ্লোকের নীলকণ্ঠকৃত টীকা।) মহাভারতকে ইতিহাস বলিলেও উহা একাধারে কাব্য পুরাণ ও ইতিহাস এবং উহাতে তীর্থ দেশ নদী পর্ব্বত প্রভৃতির বিবরণ, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বহু জিনিস আছে (মহাভারতের আদি পর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়, ৬১ হইতে ৭০ শ্লোক দেখুন); আবার স্মৃত্যুক্ত পুরাণও বেদে যাহাকে পুরাণ বলা হইয়াছে শুধু তাহাই নহে, উহার মধ্যেও ইতিহাস জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

(২) ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদিঃ স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত ॥শ্রীমদ্ভাগবতম।১।৪।২৯।
উবাচ স মহাতেজা ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতম্ ॥

'বিদ্' ধাতু হইতে 'বেদ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং যে গ্রন্থ পাঠে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতে পারে, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ভগবান্‌কে জানা যায়, তাহাকে বেদ (১) বলা যায়। মহাভারত ইতিহাসের মধ্যে গণ্য এবং বিষ্ণুভাগবত, দেবীভাগবত, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইত্যাদি হইতেছে পুরাণ। স্ত্রী শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুদিগের অর্থাৎ নিন্দিত দ্বিজদিগের যাহাতে বেদনিহিত বিমল জ্ঞান লাভ হয়, তাহার জন্য বৈদিক তত্ত্ব বিবৃত করিয়া, সরল ভাষায়, বিবিধ আখ্যায়িকার সহিত, মহাভারত নামক আখ্যান বা ইতিহাস মহর্ষি বেদব্যাস রচনা করিয়াছিলেন (২)। বিষ্ণুভাগবতের প্রথম স্কন্ধে, তৃতীয় অধ্যায়ে, উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ বেদব্যাস সমস্ত বেদ ইতিহাস প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিয়া, মানবদিগের চরম কল্যাণের জন্য, বেদসম্মত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, এবং নিজ পুত্র

ব্রহ্মন্ বেদরহস্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্থাপিতং ময়া।
সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়া॥

মহাভারতম্। ।১।১।৬১-৬২।

(১) "বিদ্"ধাতুর অর্থ "জানা," সুতরাং "বেদ" শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে, জ্ঞান বা বিদ্যামাত্রকেই "বেদ" বলা যায়। দৃষ্টান্ত, যথা,—ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতির্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি। মুণ্ডকোপনিষদের মতে ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতি বেদসকল অপরা বিদ্যা, আর উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা।

(২) স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।১।৪।২৫।

শুকদেবকে উহা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন (৩)। ঐ পুরাণের দ্বিতীয় স্কন্ধে, দশম অধ্যায়ে, আছে:—এই ভাগবতে সর্গ (ক), বিসর্গ (খ), স্থান (গ), পোষণ (ঘ), উতি (ঙ); মন্বন্তর (চ), ঈশানুকথা (ছ),

---

(৩) ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ।
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্॥
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।৩।৪০-৪২।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।১।৩।

(ক) পরমেশ্বর হইতে ভূত, ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব ইত্যাদির বিরাট্‌রূপে এবং স্বরূপে যে উৎপত্তি তাহাকে সর্গ বলে।

(খ) গুণবৈষম্য হেতু ব্রহ্মার যে সৃষ্টি তাহার নাম বিসর্গ।

(গ) ভগবানের সৃষ্টিসমূহ আপন আপন মর্য্যাদা রক্ষা দ্বারা যে উৎকর্ষ লাভ করে তাহার নাম স্থান।

(ঘ) আপন ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নাম পোষণ।

(ঙ) কর্ম্ম-বাসনা সকলের নাম উতি।

(চ) সাধুদিগের ধর্ম্মের নাম মন্বন্তর।

(ছ) ভগবানের অবতারগণের চরিত্র এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী

নিরোধ (জ), মুক্তি (ঝ) ও আশ্রয় এই দশটী বিষয় দেওয়া হইয়াছে। (ইহাকে পুরাণে দশ লক্ষণ বলে।) তন্মধ্যে দশম পদার্থটীর অর্থাৎ আশ্রয়ের তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত মহাত্মা ব্যক্তিরা কোথায়ও শ্রুতির সাক্ষাৎ অর্থের দ্বারা, কোথায়ও বা শ্রুতির তাৎপর্য্য দ্বারা, অন্য নয়টীর স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন (১)। যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় হয় এবং যিনি পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহার নাম আশ্রয়। তিনিই আধ্যাত্মিক পুরুষ। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনিই আধিদৈবিক পুরুষ হয়েন। এই দুই পুরুষ ছাড়া আধিভৌতিক দেহ আধিভৌতিক পুরুষ নামে কথিত হয়। এই তিনটীর একটীর অভাব হইলে আমরা অপরটী দেখিতে পাই না, কিন্তু যিনি সাক্ষিরূপে ঐ তিন পুরুষকেই দর্শন করেন সেই আত্মা "আশ্রয়" নামে কথিত হয়েন। তাঁহার আর কোন আশ্রয় নাই (২)।

পুরুষদিগের পবিত্র কথার নাম ঈশানুকথা। ইহাতে বিবিধ উপাখ্যান থাকে।

(জ) হরি যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে স্বীয় শক্তির সহিত জীবের যে লয় হইয়া থাকে তাহার নাম নিরোধ, অর্থাৎ ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় ভাব অবলম্বন করিলে জীবের যে লয় হয় তাহার নাম নিরোধ।

(ঝ) আত্মা অন্য রূপ পরিত্যাগ করিয়া যে নিজস্বরূপে অবস্থান করেন তাহার নাম মুক্তি।

(১) দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।২।১০।২।

(২) আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥

দেবীভাগবতের মতে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ, যথা, সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। নির্গুণ ব্যাপক এবং তুরীয় ভগবতীর সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক শক্তিরূপিণী মহালক্ষ্মী সরস্বতী এবং মহাকালী সৃষ্টিকার্য্যের জন্য দেহ স্বীকার করেন, তাঁহাদের দেহ-স্বীকারই সর্গ নামে উক্ত হয়। জগতের সৃজন পালন ও সংহারের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের সমুৎপত্তিই বিসর্গ, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের এবং হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির বংশ-বিবরণই বংশ বলিয়া কথিত হয়। স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুদিগের বিষয় বর্ণন এবং তাঁহাদিগের কাল-পরিমাণ বর্ণনই মন্বন্তর, আর তাঁহাদের বংশবিবরণই বংশানুচরিত নামে অভিহিত হয় (১)। বিষ্ণুভাগবতের সর্গ ও বিসর্গ অনেকাংশে উপনিষদুক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের মত। দেবীভাগবত দেবীকে অর্থাৎ শক্তিকে

যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ॥
একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।
ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।২.১০।৭-৯।

(১) সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥
নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকা বিকৃতা শিবা।
যোগগম্যাখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ॥
তাসাং তিসৃণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গিকারলক্ষণঃ।
সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

ব্রহ্মরূপে স্থাপনা করিয়া লিখিত হইয়াছে বলিয়া, ইহার সর্গ ও বিসর্গ যেন একটু ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অথচ এই পুরাণের সপ্তম স্কন্ধের দ্বাত্রিংশ অধ্যায় এবং নবম স্কন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া উহার রূপক ভাঙ্গিলে দেখা যায় যে, এই পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষ্ণু-ভাগবতের সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে পৃথক্ নহে, আর পৃথক্ হইতেও পারে না, কারণ দেবীভাগবতও বেদসম্মত পুরাণ (১)। বিষ্ণুভাগবতে 'সাধুদিগের ধর্ম্মকেই' মন্বন্তর বলা হইয়াছে (২), কিন্তু দেবীভাগবতে তাহা বলা হয় নাই। তথাপি দেবীভাগবত মন্বন্তর অর্থে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, বিষ্ণুভাগবতে সে সমস্ত বিষয়েরই বর্ণনা আছে। দেবীভাগবতে "বংশ" ও "বংশানুকথা" দ্বারা যে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে বিষ্ণুভাগবতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, যদিও ঐ দুইটী লক্ষণের উল্লেখ

হরিদ্রুহিণরুদ্রাণাং সমুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতা।
পালনোৎপত্তিনাশার্থং প্রতিসর্গঃ স্মৃতো হি সঃ॥
সোমসূর্য্যোদ্ভবানাঞ্চ রাজ্ঞাং বংশপ্রকীর্ত্তনম্।
হিরণ্যকশিপ্বাদীনাং বংশাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
স্বায়ম্ভুবমুখানাঞ্চ মনূনাং পরিবর্ণনম্॥
কালসংখ্যা তথা তেষাং তত্তন্মন্বন্তরাণি চ॥
তেষাং বংশানুকথনং বংশানুচরিতং স্মৃতম্।
পঞ্চলক্ষণযুক্তানি ভবন্তি মুনিসত্তমাঃ॥

দেবীভাগবতম্।১।২।১৮-২৫।

(২) মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্মঃ। শ্রীমদ্ভাগবতম্।২।১০।৪।

(১) তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্।
কথিতং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্॥

দেবীভাগবতম্।১।১।১৬।

তাহাতে করা হয় নাই। আবার বিষ্ণুভাগবতে স্থান, পোষণ, উতি, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই যে সাতটী লক্ষণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, দেবীভাগবতে পুরাণ-লক্ষণের মধ্যে সেগুলি না ধরিলেও, ঐ সকল লক্ষণের বিষয়গুলি সকলই উহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, বিষ্ণুভাগবতে পুরাণের লক্ষণগুলি অধিক বিশ্লেষণের সহিত গৃহীত হইয়াছে, আর দেবীভাগবতে উহা সংক্ষিপ্ত।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুরাণ-সমূহ অনাদি এবং সাক্ষিস্বরূপ পরম পুরুষের কথা বুঝাইবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব যাহাতে পরিস্ফুট হয়, তাহার নিমিত্ত অপরাপর বিবিধ বিষয় ঐ সকল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়া থাকে। সুতরাং, ঐ বর্ণিত বিষয়সকলের আধিক্য বা অল্পতা অথবা আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের নাম বা ঘটনাবলীর কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকিলে, তাহা লইয়া বিবাদ করিয়া কোন লাভ নাই। পুরাণ পাঠ করিতে হইলে, প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ইহাতে সেই "আশ্রয়-" বস্তু বিশেষরূপে প্রতিপন্ন ও ভজনীয়রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে কি না। পুরাণসমূহে যদি তাহা করা হইয়া থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলা যাইতে পারে না।

বিষ্ণুভাগবতে কোন্ তত্ত্বের বিকাশ করা হইয়াছে, তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিতে চেষ্টা করিব। জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট যাহাতে তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ জানিতে পারেন এরূপ উপদেশ প্রার্থনা করেন (১), তখন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে

---

(১) শ্রীব্রহ্মোবাচ—
ভগবান্ সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্॥

বলিয়াছিলেন, "মদ্বিষয়ক যে বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান তাহা অতি গুহ্য, তথাপি তাহার রহস্য ও সাধন আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার অনুগ্রহে আমার স্বরূপ, ভাব, গুণ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার যথার্থ জ্ঞান জন্মুক। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণাত্মক কিছুই ছিল না; সৃষ্টির পরও আমিই আছি, এই বিশ্ব-প্রপঞ্চও আমি এবং অবশেষে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি। সত্য না হইলেও, যে কোন বস্তুর সত্তা প্রতীয়মান হয়, অথচ আত্মবস্তুতে যাহার কোন সত্তাই দেখা যায় না, তাহা আত্মার মায়া বলিয়া জানিবে; যেমন, দ্বিচন্দ্র ও রাহু (দ্বিচন্দ্র দৃষ্টিবিভ্রম বশতঃ দেখা যায়, রাহুও ছায়া ব্যতীত কোন বস্তু নহে)। যেমন মহাভূত-সকল ভৌতিক পদার্থসমূহে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে (১), সেইরূপ আমিও তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত আছি, আবার নাও আছি। অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা বিচার করিলে, যিনি সদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকেন তিনিই আত্মা, যিনি আত্মার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার এই সকল কথাই জিজ্ঞাসা করা উচিত (২)।

তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্।
পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ॥শ্রীমদ্ভাগবতম্।২।৯।২৫-২৬।

(১) যেমন মৃত্তিকা। ঘট, কলস, ইষ্টক ইত্যাদিতে প্রবিষ্ট থাকিলেও, শুধু মৃত্তিকা যথেষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে।

(২) শ্রীভগবানুবাচ :—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

ব্রহ্মা হরির নিকট মাত্র চারিটী শ্লোকে (শ্রীমদ্ভাগবত ।২।৯।৩১-৩৪) উপরোক্ত যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা (১) কোন সময় নারদের নিকট বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়া (২), অবশেষে কহিয়াছিলেন, "তাত, সেই ভগবানের স্বরূপ তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। সৎ ও অসৎ অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ স্বরূপ সমস্ত বস্তুই সকলের কারণরূপী হরি ছাড়া আর কিছু নহে, ভগবান্ আমাকে এই ভাগবত বলিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বিভূতি সমূহের সংগ্রহস্বরূপ, তুমি ইহাকে বিস্তার করিয়া বর্ণনা কর। যাহাতে সকলের আত্মস্বরূপ ও সকলের আধারস্বরূপ সেই ভগবান্ হরিতে নরগণের ভক্তি জন্মে, তুমি বিচার পূর্ব্বক সেইরূপ ভাবে এই ভাগবত বর্ণন কর। এই ঈশ্বরের মায়া যিনি বর্ণনা

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়া যথাভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ।২।৯।৩০-৩৫।

(১) এতদেবাত্মভূ রাজন্ নারদায় বিপৃচ্ছতে।
বেদগর্ভোঽভ্যধাৎ সাক্ষাদ্ যদাহ হরিরাত্মনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ।১।৪।২৫।

(২) শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় দেখুন।

করেন, যিনি তাহাতে আনন্দিত হয়েন এবং যিনি শ্রদ্ধার সহিত নিত্য তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের আত্মা মায়া দ্বারা মোহিত হয় না (১)।

দেবর্ষি নারদ এক সময়ে ব্যাসদেবকে অপ্রসন্নচিত্ত দেখিয়া তাঁহাকে এই ভাগবত (অর্থাৎ ব্রহ্মার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন) বলেন, এবং প্রসন্নতা লাভের উপায় স্বরূপে, অখিল লোকের বন্ধন মোচনের নিমিত্ত, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাসুদেবের চরিত্র যোগবলে স্মরণ করিয়া বর্ণন করিতে বলেন (২); মহর্ষি ব্যাসও দেবর্ষির উপদেশ-অনুসারে ধ্যানযোগে পূর্ণ পুরুষকে অর্থাৎ ভগবান্‌কে দর্শন করিলেন, যে মায়ায় মোহিত হইয়া জীব নিজে স্বরূপে ত্রিগুণাতীত হইলেও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে, ভগবানের আশ্রিতা সেই মায়াকে দেখিতে

---

(১) সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ ॥
ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্ বিপুলীকুরু ॥
যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তি র্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধারে ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয় ॥
মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি ॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্। ।২।৭।৫০-৫৩।

২) অতো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্। ।১।৫।১৩।

পাইলেন এবং ভগবান্ অধোক্ষজের প্রতি সাক্ষাৎ ভক্তি, যাহা সকল অনর্থ নাশ করে, তাহাও দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর তিনি অজ্ঞানান্ধ মানবদিগের হিতের জন্য এই সাত্বত-সংহিতা বা ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন (১), অর্থাৎ মানুষ যাহাতে মায়া অতিক্রম করতঃ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইতে ও ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার উপায় প্রদর্শনের নিমিত্ত, ভাগবত-পুরাণ প্রণয়ন করিলেন (২)।

বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে পুরাণসমূহের মূল উদ্দেশ্য। শ্রুতি ও স্মৃতির উদ্দেশ্যও ইহাই। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য-লীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (৩), তাহার ভাবার্থ

---

(১) ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।৭।৪-৬।

(২) এস্থলে ইহাও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মূল চারিটী শ্লোক ('অহমেবাসমেবাগ্রে' ইত্যাদি যাহা ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন) বেদান্তেরই অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাহাই ক্রমে বিস্তৃত হইতে হইতে অবশেষে দ্বাদশ-স্কন্ধ-সমন্বিত এই বিশাল "ভাগবতে" পরিণত হইয়াছে।

(৩) তথাহি মুনিবাক্যম্—
শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।

এই :—মাতৃস্বরূপা শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবানের আরাধনা-বিধিরই উপদেশ দেন, মাতা শ্রুতি যেমন বলেন ভগ্নীস্বরূপা স্মৃতি-সকলও সেইরূপ বলেন, আর পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ, যাঁহাদিগকে ভ্রাতৃ-স্বরূপ বলা যায়, তাঁহারাও মাতা শ্রুতিরই অনুগমন করেন ; অতএব ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় লওয়া উচিত।

মহাভারতে ও অনেক পুরাণে, মূঢ় ব্যক্তিদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য, অনেক স্থলে কাম্য কর্ম্ম ধর্ম্মকার্য্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল কর্ম্মের ফলশ্রুতির সমর্থনের নিমিত্ত বহু আখ্যায়িকাও বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ স্বভাবতঃই সুখ-কামনা-মূলক কর্ম্মের প্রিয়, এই হেতু ঐ গুলিকে ধর্ম্মগ্রন্থে ধর্ম্মকার্য্যরূপে উল্লিখিত দেখিলে, তাহারা আর নিবৃত্তির পথে যাইতে চাহে না (১)। আবার সর্ব্বব্যাপী অনন্ত পরমেশ্বরের সুখময় স্বরূপ, যাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি সমুদায় কর্ম্মের নিবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প-সমাধি-যোগে জানিতে সক্ষম হয়েন, তাহা ত্রিগুণের অধীনতা হেতু কর্ম্মাসক্ত এবং দেহে আত্মবোধ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অতি কষ্টেও ধারণা করিতে পারে না।

পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥

(১) জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।১।৫।১৫।

অতএব, তাহাদিগকে ভগবানের লীলা-বিষয়ক কথাই বলা উচিত (১)। ইহা ব্যতীত অন্য কথা তাহাদিগকে বলিলে, তাহাদের বুদ্ধি, বর্ণিত নাম ও রূপ সমূহে বিব্রত হওয়ায়, বায়ুবলে ঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় কোন স্থানেই স্থির হইতে পারে না (২)। সুতরাং, যে সব পুরাণে ভগবানের স্বরূপের অনুগতভাবে তাঁহার লীলা বর্ণন পূর্ব্বক, সাধকের চিত্ত বিষয় হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্ত করিয়া, ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা ব্রত উপবাস প্রভৃতি যুক্ত বহু সকাম কর্ম্মের বর্ণনাপূর্ণ পুরাণসকল হইতে শ্রেষ্ঠ। উপনিষদে ভগবানের স্বরূপের কথা আছে, আর পুরাণে স্বরূপের কথা স্থানে স্থানে বলিয়া, অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার লীলা গুণ প্রভৃতির কথা ও বিবিধ আখ্যায়িকা বর্ণনা দ্বারা বিষয়-বদ্ধ দৃষ্টিকে স্বরূপের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

মানবের চরম জ্ঞেয় বা লক্ষ্য বস্তু যে পরমাত্মা, তাঁহার কথা এবং তাঁহা হইতে জগৎ-প্রপঞ্চের বিস্তার পুরাণগুলিতে কি ভাবে বর্ণিত

---

(১) বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো
রনন্তপারস্য নিবৃত্ততঃ সুখম্।
প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মন
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভোঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।৫।১৬।

(২) ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্ দৃশস্তৎ কৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি
র্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।৫।১৪।

হইয়াছে, তাহারই দৃষ্টান্ত-স্বরূপে শিব-পুরাণের কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে। শিবপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে চতুর্থ পুরাণ (১)। ইহা জ্ঞান-সংহিতা, বিদ্যেশ্বর-সংহিতা, কৈলাস-সংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, বায়বীয়-সংহিতা ও ধর্ম্ম-সংহিতা এই ছয় ভাগে বিভক্ত। জ্ঞান-সংহিতার দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ে, পরব্রহ্ম কিরূপে সগুণ হইয়াছেন, এবং কিরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কালী ইত্যাদি সগুণ-ব্রহ্মরূপে জীবের উপাস্য হইয়াছেন, তাহা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ ব্যাসশিষ্য সূতকে বলিলেন, "আমরা শিবতত্ত্ব অবগত নহি। নির্গুণ মহেশ্বর সগুণ হইলেন কেন? জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে, জগৎ যখন বিদ্যমান থাকে সে সময়ে এবং জগতের প্রলয় হইলে পর তিনি কোন্ ভাবে থাকেন? তিনি কিরূপে প্রসন্ন হন এবং প্রসন্ন হইয়াই বা লোককে কিরূপ ফল প্রদান করেন, তাহা আমাদিগকে সবিশেষ বল।" সূত, তাঁহার উত্তরে, নারদ ব্রহ্মার নিকট এই সকল বিষয়ে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন:—ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মন্, আমি বা প্রভু বিষ্ণু কেহই শিবের পরমাদ্ভুত তত্ত্ব অবগত নহি। সদসদাত্মক এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যখন ছিল না, তখন সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মময় তেজ

---

(১) এবং লক্ষণলক্ষ্যাণি পুরাণাণি পুরাবিদঃ।
মুনয়োঽষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্লকানি মহান্তি চ॥
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্॥
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১২।৭।২২-২৪।

বিদ্যমান ছিলেন ; তিনি স্থূল বা সূক্ষ্ম নহেন, শীতল বা উষ্ণ নহেন ; তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই ; তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত। যোগীরা অন্তরদৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বদা যাঁহার ধ্যান করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রদ সেই মহৎস্বরূপই কেবল অবস্থিত ছিলেন (১)। কিছুকাল পরে তাঁহার ইচ্ছা (অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা) জন্মিল, সেই ইচ্ছাকেই প্রকৃতি বা মূল কারণ বলে। সেই প্রকৃতি-দেবীর বদন সহস্র সহস্র পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়, তিনি অষ্টভুজা এবং বিচিত্র-বসনধারিণী। তিনি নানা অলঙ্কার-শোভিতা ও নানা প্রকার শক্তিযুক্ত। তাঁহার হস্তে বিবিধ অস্ত্র, তাঁহার তেজ অচিন্তনীয় এবং সকল প্রকার কারণ (হেতু) তাঁহার অনুগত। এই মায়াদেবী একাকিনী অর্থাৎ ইঁহার সমজাতীয় আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, তবে পুরুষের সংযোগে ইনিই বহু হয়েন। প্রকৃতি যাঁহা হইতে ব্যক্ত হইলেন, পুরুষও তাঁহা হইতেই প্রকাশ পাইলেন (২), এবং উভয়ে মিলিয়া বিচার করিতে লাগিলেন, 'আমাদের দুই জনের কি করা কর্ত্তব্য ?' দুই জনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,

---

(১) ইদং দৃশ্যং যদা নাসীৎ সদসদাত্মকঞ্চ যৎ।
তদা ব্রহ্মময়ং তেজো ব্যাপ্তিরূপঞ্চ সন্ততম্ ॥
ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মঞ্চ শীতং নোষ্ণঞ্চ পুত্রক।
আদ্যন্তরহিতং দিব্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্ ॥
যোগিনোঽন্তরদৃষ্ট্যা হি যদ্ ধ্যায়ন্তি নিরন্তরম্।
তদ্রূপং সকলং হ্যাসীজ্ জ্ঞানবিজ্ঞানদং মহৎ ॥
শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা। ।২।১৫-১৭।

(২) যতো বৈ প্রকৃতি দেবী ততো বৈ পুরুষস্তদা।
উভৌ তৌ মিলিতৌ তত্র বিচারে তৎপরৌ মুনে ॥
শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা। ।২।২২।

এমন সময় তাঁহাদের কর্ত্তব্যবোধ জন্মায় শুভকর আকাশবাণী হইল, 'এই সংশয় দূর করিবার জন্য তপস্যা করাই কর্ত্তব্য'। ইহা শুনিয়া তাঁহারা কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। কিছু কাল ধ্যানমগ্ন থাকার পর তাঁহারা ধ্যান হইতে বিরত হইলেন। যখন তাঁহারা জাগ্রত হইলেন তখন 'আমরা কত তপস্যা করিয়াছি' এই ভাবিয়া, এবং তাঁহাদের দেহ হইতে নানাপ্রকার জলধারা নির্গত হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। সকল বস্তুই সেই জল দ্বারা ব্যাপ্ত হইল এবং সেই জলরাশি ব্রহ্মের ন্যায় অনন্ত ও স্পর্শমাত্রে পাপনাশক হইল। তখন তাঁহারা দুইজন পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সেই জলে বহুকাল আনন্দে শয়ন করিয়া রহিলেন। এই জন্য সেই পুরুষের নাম নারায়ণ ও প্রকৃতির নাম নারায়ণী হইল। তখন প্রকৃতি ও পুরুষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। উভয়ে শয়ান আছেন, এই অবসরে সেই পুরুষের সহকারিতায়, কতকগুলি তত্ত্ব বা পদার্থ উৎপন্ন হইল। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। ইহা ত্রিগুণাত্মক। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূত হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। এই দ্বাবিংশতি তত্ত্ব এবং পুরুষ ও প্রকৃতি ইহার সঙ্গে ধরিয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়। পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যতীত এই দ্বাবিংশতি তত্ত্বই জড় বা অচেতন (১)। এই সমুদায় তত্ত্ব নিজ আয়ত্ত্ব করিয়া নারায়ণদেব ব্রহ্ম-স্বরূপ জলে শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিদেশে একটী সুন্দর পদ্ম প্রকাশ পাইল। সেই পদ্ম অনন্ত পত্র ও কর্ণিকার যুক্ত, কোটী সূর্য্যের ন্যায়

(১) জড়াত্মকঞ্চ তৎ সর্ব্বং প্রকৃতিং পুরুষং বিনা।
তাভ্যামেকীকৃতং তচ্চ চতুর্ব্বিংশতিসংজ্ঞিতম্॥
শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা।২।৩৩।

উজ্জ্বল, তত্ত্বসমূহযুক্ত, এবং তাহার বিস্তার ও উচ্চতা অসীম। সেই পদ্ম হইতে, তাহার পর, হিরণ্যগর্ভ আমি (অর্থাৎ ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইলাম। তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া ঐ পদ্ম ব্যতীত আর কিছুই আমি অবগত হইতে পারিলাম না। আমি কে, কাহার পুত্র, কাহা-দ্বারা নির্ম্মিত, কোথা হইতে আসিলাম, আমার কর্ত্তব্য কি, এ সকল কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, মনে করিলাম নিশ্চয়ই আমার নির্ম্মাতা এই পদ্মের মূলে আছেন। তাঁহার অন্বেষণে পদ্মনালে অবতরণ করিয়া নালে নালে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু এক শত বৎসর অতীত হইলেও যখন তাঁহার কোন সন্ধান পাইলাম না, তখন পুনরায় পদ্মকোষে যাইবার জন্য নালপথ ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু নারায়ণের মায়ায় মোহিত হইয়া পদ্মকোষ প্রাপ্ত হইলাম না, নাল-পথে ভ্রমণ করিতে করিতেই আমার একশত বৎসর কাটিয়া গেল। তখন কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারায় এবং অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায় ক্ষণকাল সেই স্থানে অবস্থান করিলাম। সেই সময় 'তপস্যা কর' এই পরম শুভপ্রদ দৈব-বাণী শ্রবণ করিলাম। আমি সেই বাণী শ্রবণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর কাল অতি যত্ন সহকারে তপস্যা করিলে, আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতি হইতে জাত (২), চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ও নানা ভূষণে ভূষিত পরম মনোহর ভগবান্ বিষ্ণু আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। যিনি শুক্লবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ এবং কাঞ্চনবর্ণ; যিনি নির্গুণ, কালস্বরূপ, সকলের আত্মস্বরূপ, সৎ এবং অসৎ

---

(২) মুকুটাদিভূষণৈর্যুক্তঃ কোটিকন্দর্পসন্নিভঃ।
প্রকৃত্যা জনিতঃ সোঽথ ময়া দৃষ্টঃ পুরো মুনে॥
শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা। ।২।৪৭।

স্বরূপ; সেই নারায়ণকে দর্শন করিয়া আমি একান্ত বিস্মিত হইলাম (১)। তাহার পর, তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া, আমি তাঁহাকে বারম্বার অবজ্ঞাসূচক বাক্যাদি বলিলেও, তিনি শান্তভাবে পুনঃ পুনঃ আমাকে বুঝাইলেন এবং অবশেষে বলিলেন যে, আমি (ব্রহ্মা) তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ও যাবতীয় বস্তুই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে আমি সক্রোধে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, 'তুমি কে? তোমারও কর্ত্তা অবশ্য কেহ আছেন।' এই বলিয়া তাঁহার সঙ্গে আমি ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে, আমাদের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য ও জ্ঞান দানের নিমিত্ত, আমাদের দুই জনের মধ্যভাগে এক অদ্ভুত জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। এই জ্যোতির্লিঙ্গ সহস্র সহস্র অগ্নি-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল, কালাগ্নি সদৃশ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি শূন্য; তাঁহার আদি মধ্য বা অন্ত নাই, তিনি অনুপম, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত (২) এবং বিশ্বের মূল কারণ। ইহাকে দেখিয়া ভগবান্ হরি আমাকে বলিলেন, 'এখন আর স্পর্দ্ধা করিতেছ কেন? তৃতীয় ব্যক্তি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন,

---

(১) তং দৃষ্ট্বা সুন্দরং রূপং বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
কালাত্মা কাঞ্চনাভশ্চ শুক্লকৃষ্ণশ্চ নির্গুণঃ॥
নারায়ণো মহাবাহুঃ সর্ব্বাত্মা সদসন্ময়ঃ।
তথাভূতমহং দৃষ্ট্বা হর্ষিতো হ্যভবং তদা॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা। ।২।৪৮-৪৯।

(২) বাক্য ও মনের অগোচর ব্রহ্মের এই প্রথম প্রকাশ; উজ্জ্বল অথচ কি যে তাহা বলিবার যো নাই; কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হওয়ায় কিছু সীমার মধ্যে যেন আসিয়া পড়িয়াছেন, কারণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই দুই জনের মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে, অথচ তাঁহার আদি মধ্য ও অন্ত জানা যাইতেছে না।

এখন আমাদের যুদ্ধ স্থগিত থাকুক, এস, ইনি কে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি। তুমি হংসরূপ ধারণ পূর্ব্বক উর্দ্ধদিকে গমন কর, আর আমি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিম্নদিকে গমন করি।' এই বলিয়া তিনি সেইরূপ করিলেন এবং আমিও দিব্য-পক্ষযুক্ত হংস হইয়া উর্দ্ধগামী হইলাম। সেই অবধি লোকে আমাকে 'হংস-হংস-বিরাট্' বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি "হংস হংস" বলিয়া জপ করিবে সে নিশ্চয়ই মৎ-স্বরূপ হইবে (১)।

বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবান্ নারায়ণ নিম্নদিকে ও আমি উর্দ্ধদিকে অনুসন্ধান করিয়াও যখন ঐ জ্যোতিঃ-স্বরূপের কোন তথ্য নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলাম না, তখন আমরা উভয়ে আবার একত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'এ কি! সেই অনির্দ্দেশ্য, নাম ও কর্ম্ম হীন এবং ধ্যানেরও অগোচর বস্তু লিঙ্গ না হইলেও লিঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছেন।' তদনন্তর, 'আমরা তোমার রূপ জানিতে অক্ষম, তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার' এই বলিয়া, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। এইরূপ প্রণাম করিতে করিতে একশত বৎসর অতীত হইলে, প্লুতস্বরযুক্ত 'ওম্' এই আনন্দময় শব্দ শ্রুত হইল। ইহা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, 'এই শব্দ যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইল সেই আপনাকে প্রণাম করি (২)।' তখন সেই লিঙ্গের দক্ষিণভাগে সনাতন আদ্য বর্ণ

---

(১) তদাপ্রভৃতি মামাহু হংস-হংস-বিরাড়িতি।
হংস হংসেতি যো ব্রুয়াৎ সোঽহং সোঽহং ভবিষ্যতি॥
শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা। ।২।৬৯।

(২) মায়য়া মোহিতঃ শম্ভোস্তস্থৌ সংবিগ্নমানসঃ।
প্রণিপত্য ময়া সার্দ্ধং সস্মার কিমিদন্ত্বিতি॥

অকার, উত্তরে উকার ও মধ্যে নাদসমন্বিত মকার দৃষ্ট হইল,—এইরূপে আমরা ওঙ্কার দর্শন করিলাম। অকার সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উকার অগ্নি সদৃশ, এবং মকার চন্দ্রমণ্ডলের তুল্য উজ্জ্বল। সেই ওঙ্কারের উপরিভাগে স্ফটিক সদৃশ, তুরীয়াতীত, নিষ্কল, নির্দ্বন্দ্ব, বাহ্য ও অভ্যন্তর রহিত, আদি মধ্য ও অন্ত বিহীন, আনন্দেরও কারণস্বরূপ, পরম ব্রহ্ম এবং একাক্ষর অর্থাৎ ওঙ্কারস্বরূপ ভগবান্ নীল-লোহিত বা মহাদেবকে দর্শন করিলাম। (প্রণবের অঙ্গস্বরূপ অকারে সৃষ্টিকর্ত্তা, উকারে পালন কর্ত্তা এবং মকারে নিত্য-অনুগ্রহকারী অর্থাৎ মহেশ্বর বুঝায়) (১)। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইলাম। এই সময়ে আর একটী আশ্চর্য্য সুন্দর মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইলাম। তাঁহার বর্ণ কর্পূরের মত গৌর, পঞ্চ মুখ, দশ বাহু। তিনি

অনির্দ্দেশ্যঞ্চ তদ্রূপমনাম কর্ম্মবর্জ্জিতম্।
অলিঙ্গং লিঙ্গতাং যাতং ধ্যানমার্গেঽপ্যগোচরম্॥
স্বস্থঃ চিত্তং তদা কৃত্বা নমস্কারপরায়ণৌ।
জানীয়াবো ন তে রূপং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে॥
এবমব্দশতং যাতং নমস্কারং প্রকুর্ব্বতোঃ।
তদা সমভবৎ তত্র সানন্দং শব্দলক্ষণম্॥
ওমিতীদং মুনিশ্রেষ্ঠ সুব্যক্তং প্লুতলক্ষণম্।
কিমিদন্ত্বিতি সঞ্চিন্ত্য ময়াতিষ্ঠন্মহাস্বনম্॥
যস্মাচ্ছব্দঃ সমুদ্ভূতস্তস্মৈ তুভ্যং নমোঽস্তু তে॥
শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা। ।৩।৫-১০।

(১) আদ্যং বর্ণমকারস্তু উকারশ্চোত্তরে ততঃ।
মকারং মধ্যতশ্চৈব নাদান্তং তস্য চোমিতি॥
সূর্য্যমণ্ডলবদ্দৃষ্ট্বা বর্ণমাদ্যন্তু দক্ষিণে।
উত্তরে পাবকপ্রখ্যমুকারমৃষিসত্তম॥

নানাবিধ কান্তি যুক্ত, নানা অলঙ্কারে শোভিত এবং মহাপুরুষের লক্ষণ সমন্বিত। আমরা তাঁহাকে স্বয়ং মহাদেব জানিয়া স্তব করিলে, তিনি তুষ্ট হইয়া শব্দময় রূপ ধারণ করতঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণসকল তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে প্রকাশ পাইল। সেই নির্গুণ অথচ গুণময় মহেশ্বরের এই শব্দময় রূপ (১) দেখিয়া, আমরা বিনীতভাবে তাঁহার কৃপাভিখারী হইলে, তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন যে, আমি (ব্রহ্মা) সৃষ্টিকর্ত্তা হইব, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা হইবেন এবং তাঁহার (মহাদেবের) এক অংশ জগতের ধ্বংসকারী হইবেন; আর নারায়ণের আশ্রিতা প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মাণী, লক্ষ্মী ও কালী নামক তিনটী শক্তি উদ্ভূত হইয়া যথাক্রমে আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন এবং

শীতাংশুমণ্ডলপ্রখ্যং মকারং তস্য মধ্যতঃ।
তস্যোপরি তদাপশ্যৎ স্ফটিকপ্রভবং পরম্॥
তুরীয়াতীতমমৃতং নিষ্কলং নিরুপপ্লবম্।
নির্দ্বন্দ্বং কেবলং তত্ত্বং বাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিতম্॥
আদিমধ্যান্তরহিতমানন্দস্যাপি কারণম্।
সত্যমানন্দমমৃতং পরং ব্রহ্ম পরায়ণম্॥
একাক্ষরস্তু যৎ প্রোক্তং ভগবান্ নীললোহিতঃ।
সর্গকর্ত্তা হ্যকারাখ্য উকারাখ্যস্তু পালকঃ॥
মকারাখ্যস্তু যো নিত্যমনুগ্রহকরো ভবঃ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা।৩।১১-১৬।

(১) পূর্ব্বোক্ত ঈষদ্ ব্যক্ত ভাব এখন শব্দময় হইল অর্থাৎ যেন শব্দদ্বারা প্রকাশ্য হইল। ক্রমশঃ স্থূলতর ও সসীম ভাবে তাঁহাকে দেখা হইতেছে।

আমাদের কার্য্যের সহায়তা করিবেন। তদনন্তর, ভগবান্ হরি, শিবগায়ত্রী ও শিবমন্ত্র জপ দ্বারা মহাদেবকে পুনরায় পরিতুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার (মহাদেবের) শ্বাসরূপ নিগম অর্থাৎ উপনিষৎ প্রাপ্ত হন, এবং সেই বেদ ও উপনিষৎ আমাকে দান করেন।

আমরা দুই জনে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণু) মহাদেবকে নানা প্রকার স্তবে তুষ্ট করিলে, তিনি আমাদিগকে বিবিধ বরদান করিয়া বলিয়াছিলেন :— আমি স্বভাবতঃ নিগুর্ণ হইয়াও, সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্যের জন্য, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হর এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্, আমার পরম রূপ এই প্রকার হইলেও, তোমার অঙ্গ হইতে রুদ্র নামে আর একটী দেব উৎপন্ন হইবেন, এবং তিনি আমার অংশ হইতে উদ্ভূত হওয়ায় সামর্থ্যে আমা অপেক্ষা কোনরূপে ন্যূন হইবেন না। তাঁহাতে ও আমাতে কোন ভেদ নাই, উভয়ের পূজাবিধিও একই প্রকার। যেমন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ জলাদির সহিত সংযুক্ত হইলেও তাহার কোনই বৈলক্ষণ্য হয় না, সেইরূপ গুণের সহিত সংযোগ হইলেও নিগুর্ণ আমার কোন বন্ধন নাই। আমাতে ও সেই রুদ্রে বিন্দুমাত্রও ভেদদর্শন করা উচিত নহে। জগতে আমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, তাহা বস্তুতঃ (অর্থাৎ নাম ও রূপ দ্বারা বিচার না করিয়া বস্তুগত ভাবে বিচার করিলে) একই। স্বর্ণ হইতে বিবিধ আকার ও নাম বিশিষ্ট অলঙ্কার নির্ম্মিত হইলেও ঐগুলি স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছু নহে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় কারণই কার্য্যরূপে অবস্থান করে। মৃত্তিকার দ্বারা নানাবিধ পাত্র প্রস্তুত হইলে, তাহাতে নাম ও রূপের বিভিন্নতা হয় সত্য, কিন্তু সেই পাত্রগুলি মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। একই সমুদ্রের ফেন তরঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা দেখা গেলেও, সেগুলি স্বরূপতঃ সমুদ্রের জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা এই তত্ত্ব

অবগত হইয়া কিছুমাত্র ভেদের কারণ দর্শন করিও না। বস্তুতঃ, যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে সবই আমার শিব-রূপ। আমি, আপনি (বিষ্ণু), ইনি (ব্রহ্মা) এবং রুদ্র (যিনি পরে জন্মিবেন), এই সকলের মধ্যে কোন ভেদ নাই, ভেদ থাকিলে বন্ধন হইত। তথাপি এই জগতে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ আমার শিবরূপ সনাতন এবং সকলের মূল বলিয়া কথিত হয়। ইহার বিশেষ জ্ঞান যাহাতে হয় তাহা বলিতেছি, শুন। তোমরা দুই জনে আমার ইচ্ছারূপিণী প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, কিন্তু রুদ্র সেরূপ নহেন। এ বিষয়ে আমার আজ্ঞাই প্রধান, আমি ব্রহ্মার ভ্রূকুটি হইতে তাঁহাকে উৎপাদন করি (১)। 'তিনি গুণবান্‌গণের মধ্যে তামসপ্রকৃতি অর্থাৎ তমোগুণ-প্রধান বলিয়া উক্ত হয়েন, এবং তমোগুণের সংশ্রব হেতু তাঁহাকে বৈকারিক অহঙ্কার বলা হয়। তিনি নামমাত্র তামস, বাস্তবিক তামস

(১) ত্রেধা ভিন্নো হ্যহং বিষ্ণো ব্রহ্মবিষ্ণুহরাখ্যয়া।
সর্গরক্ষালয়গুণৈ র্নিষ্কলোঽহং সদা হরে॥
মদ্রূপং পরমং ব্রহ্মন্নীদৃশং ভবদঙ্গতঃ।
প্রকটীভবিতা লোকে নাম্না রুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মদংশাৎ তস্য সামর্থ্যমূনং নৈব ভবিষ্যতি।
যোঽয়ং সোঽহং ন ভেদোঽস্তি পূজাবিধিবিধানতঃ॥
যথা চ জ্যোতিষঃ সঙ্গাজ্জলাদেঃ স্পর্শতা ন বৈ।
তথা মমাগুণস্যাপি সংযোগাদ্বন্ধনং ন হি॥
শিবরূপং মমৈতচ্চ রুদ্রোঽপি শিববৎ সদা।
ন তত্র পরভেদো বৈ কর্ত্তব্যশ্চ মহামুনে॥
বস্তুতো হ্যেকধা ভিন্নং রূপং মে ত্রিজগত্যুত।
সুবর্ণস্য যথৈকস্য বস্তুত্বং নৈব গচ্ছতি॥

নহেন। এজন্য, হে ব্রহ্মন্, তুমি এইরূপ করিবে। আমি সকল ভূতেই একরূপ, অতএব তুমি এই রুদ্রের সম্মান করিবে। এই প্রকৃতির এক অংশ লক্ষ্মী হইবেন এবং অপর দুই অংশ ব্রহ্মাণী ও মহাকালী হইবেন। ইনি এক হইয়াও জগৎকার্য্যের নিমিত্ত বহু হইবেন। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিবেন, তুমি সরস্বতীকে অবলম্বন করিবে এবং আমি কালীকে গ্রহণ করিয়া বিশ্বের হিতজনক কার্য্যসকল করিব। চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমময় লোকের সৃষ্টি-পালনাদি ও অন্যান্য অনেক কার্য্য করিয়া তোমরা সুখ প্রাপ্ত হইবে। তোমরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া লোকসকলের হিতকারক হও। হে সনাতন বিষ্ণো, তুমি অদ্য এই

অলঙ্কারে কৃতে দেব নামভেদো ন বস্তুতঃ।
কারণস্যৈব কার্য্যে চ নিদানঞ্চ নিদর্শনম্॥
যথৈকস্যা মৃদো ভেদো নাম্নি পাত্রে ন বস্তুতঃ।
যথৈকস্য সমুদ্রস্য বিকারো নৈব বস্তুতঃ॥
এবং জ্ঞাত্বা ভবদ্ভ্যাঞ্চ ন দৃশ্যং ভেদকারণম্।
বস্তুতঃ সর্ব্বদৃশ্যঞ্চ শিবরূপং মতং মম॥
অহং ভবানয়ঞ্চৈব রুদ্রোঽয়ং যো ভবিষ্যতি।
একং রূপং ন ভেদোঽস্তি ভেদে চ বন্ধনং ভবেৎ॥
তথাপীহ মদীয়ং বৈ শিবরূপং সনাতনম্।
মূলভূতং সদা প্রোক্তং সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্॥
এবং ধ্যাত্বা সদা ধ্যেয়ং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা ত্বয়া।
বিশেষোঽত্র কথং লভেচ্ছ্রূয়তাং কথ্যতে ময়া॥
ভবন্তৌ প্রকৃতের্জাতৌ নায়ং বৈ প্রকৃতেঃ পুনঃ।
মদাজ্ঞা জায়তেঽপ্যত্র ব্রহ্মণো ভ্রূকুটেরহম্॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা।৪।৪১-৫৩।

লোকে মুক্তিদাতা হও। আমার দর্শনে যে ফল হইবে তোমার দর্শনেও সেই ফল হইবে। আমার হৃদয়ে বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর হৃদয়ে আমি বাস করি। যে আমাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ দর্শন না করে সে আমার প্রিয় হয়। সুখ লাভের জন্য তোমরা দুই জনে রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য বা মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত এই লিঙ্গ (১) সর্ব্বদা পূজা করিবে। ইহা ভিন্ন অন্যরূপ বিধান আমার প্রিয় নহে।' এই কথা বলিয়া ভগবান্ মহাদেব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন (২)। সেই অবধি এই লোকে

---

(১) শিবলিঙ্গ-মূর্ত্তি বর্ত্তমানে যাহা দেখা যায় তাহাতে যোনি ও লিঙ্গ একত্র করিয়া দেখান হইয়াছে। যোনি—উৎপত্তিস্থান, উপাদান, মাতা, (ইংরাজিতে matter), জড় এবং লিঙ্গ—পুরুষ, পিতা, (ইংরাজিতে spirit), চৈতন্য; অর্থাৎ জড় ও চৈতন্যে মিশ্রিত এই জগৎ ব্রহ্মের স্থূলতম বিকাশ বা রূপ। শিবলিঙ্গ এই ভাব-প্রকাশক সাঙ্কেতিক মূর্ত্তি।

(২) গুণেম্বপি চ য প্রোক্তস্তামসঃ প্রাকৃতো হরে।
বৈকারিকশ্চ বিজ্ঞেয়ো যোঽহঙ্কার উদাহৃতঃ ॥
নামতো বস্তুতো নৈব তামসঃ পরিচক্ষতে।
এতস্মাৎ কারণাদ্ব্রহ্মন্ করণীয়মিদং ত্বয়া ॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু পালয়েনং পিতামহ।
এতস্যাঃ প্রকৃতে লক্ষ্মী হ্যেতদংশা ভবিষ্যতি ॥
ব্রহ্মাণী চ তদংশা চ মহাকালী তদংশিকা।
ভবিষ্যতি পরা নূনং কার্য্যার্থেঽনেকতাং গতা ॥
ত্বঞ্চ লক্ষ্মীমুপাশ্রিত্য কার্য্যং কর্ত্তুমিহার্হসি।
ব্রহ্মন্ ত্বঞ্চ বরাং দেবীং কর্ত্তুং কার্য্যমনন্তকম্ ॥

লিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। লিঙ্গই দেবী ও মহাদেবী স্বরূপ এবং লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহেশ্বর (১)।"

মুনিদিগের অনুরোধে পুনরায় সূত বলিতে লাগিলেন, "এই ব্যাপারের পর ব্রহ্মা হংস-রূপ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিষ্ণু বরাহরূপ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই নিষ্কল ব্রহ্ম, যিনি সৃষ্টির জন্য বিকারাভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে বর দিলেন, 'তুমি গুণের উপর প্রাধান্য লাভ কর; সত্ত্বগুণ প্রভৃতি সকলই জড়, অতএব তুমি সকল লোকে মান্য ও পূজ্য হইবে। ব্রহ্মার নির্ম্মিত

অহং কালীং সমাশ্রিত্য করিষ্যে কার্য্যমুত্তমম্।
চতুর্ব্বর্ণময়ং লোকং তৎসংখ্যৈরাশ্রমৈ র্ধ্রুবম্॥
তদন্যৈ র্বিবিধৈঃ কার্য্যৈঃ কৃত্বা সুখমবাপ্স্যথ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্তা লোকানাং হিতকারকাঃ॥
মুক্তিদোঽত্র ভবানন্ত ভব লোকে সনাতন।
মদ্দর্শনে ফলং যদ্বৈ তদেব তব দর্শনে॥
মমৈব হৃদয়ে বিষ্ণু র্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ে হ্যহম্।
উভয়োরন্তরং যো বৈ ন জানাতি মতো মম॥
ইদং লিঙ্গং সদা পূজ্যং ভবদ্ভ্যাং সুখহেতবে।
রাজতং রত্নজাতং বা হৈমং বা পার্থিবং মুনে॥
এতস্মাচ্চ বিধেরন্যো বল্লভো ন মতো মম।
এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা।৪।৫৪-৬৪।

(১) তদাপ্রভৃতি লোকঽস্মিন্ লিঙ্গে পূজাবিধিঃ স্মৃতঃ।
লিঙ্গং দেবী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা।৪।৬৫।

লোকসকলে যখন দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখন তুমি সকল দুঃখের বিনাশে তৎপর হইও। তুমি লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত নানাবিধ অবতার গ্রহণ করিয়া সৎকীর্ত্তি বিস্তার করিও। রুদ্র আমার সগুণ রূপ। আমি রুদ্র-শরীর দ্বারা জগতের হিতকর কার্য্য করিব। তুমি আমার ধ্যেয় হইবে এবং আমি তোমার ধ্যেয় হইব। বিচার করিলে তোমাতে আমাতে অণুমাত্রও পার্থক্য নাই। তুমি স্বরূপতঃ এক হইয়াও বহুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। যে ব্যক্তি আমার ভক্ত হইয়া তোমার নিন্দা করিবে, আমি তাহার সকল পুণ্য নষ্ট করিয়া, তাহাকে নরকে পাঠাইব। তুমি এই লোকে মনুষ্যদিগের ভক্তিপ্রদ, বিশেষতঃ মুক্তিপ্রদ, ধ্যেয় ও পূজ্য। তুমি সকলের নিগ্রহ ও অনুগ্রহের বিধান কর (১)।' তিনি এই বলিয়া ব্রহ্মার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বিষ্ণুকে বলিতে লাগিলেন, 'সর্ব্বদা দুঃখেতে সহায় হও। তুমি দেবতাদিগের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ হও, ভুক্তি ও মুক্তি দাতা হও, সর্ব্বদা সকল কার্য্যের

---

(১) বিষ্ণবে চ বরান্ দত্বা গুণেষু মুখ্যতাং ব্রজ।
গুণাঃ সত্ত্বাদয়শ্চেতি তেঽপি সর্ব্বে বিমোহিতাঃ।
তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বলোকেষু মান্যঃ পূজ্যো ভবিষ্যসি॥
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতে লোকে যদা দুঃখং প্রজায়তে।
তদা ত্বং সর্ব্বদুঃখানাং নাশনে তৎপরো ভব॥
বিবিধানবতারাংশ্চ গৃহীত্বা কীর্ত্তিমুত্তমাম্।
বিস্তারয় হরে লোকতারণায় পরেশ্বর॥
গুণরূপোঽস্ম্যহং রুদ্রো হ্যনেন বপুষা পুনঃ।
কার্য্যং করিষ্যে লোকানাং সর্ব্বথা নাত্র সংশয়ঃ॥
মম ধ্যেয়ং ভবাংশ্চৈব তব ধ্যেয়মহং পুনঃ।
আবয়োরন্তরং নৈব হ্যণুমাত্রং বিচারতঃ॥

সাধক হও। আমার আজ্ঞায় তুমি সকলের প্রাপস্বরূপ হও। যাহারা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহারা আমারও আশ্রিত বলিয়া পরিগণিত হইবে। তোমার ও আমার মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহা যে মনে করিবে সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আয়ু একশত বৎসর অতীত না হয়, তাবৎ তুমি এই রূপের দর্শন করিবে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি যুগ সহস্রবার অতীত হইলে ব্রহ্মার এক দিন হয়, এবং ব্রহ্মার এক রাত্রিও ঐ পরিমাণ সময়। এই রূপে এক দিন-রাত্রি ধরিয়া, ব্রহ্মার মাস বৎসর প্রভৃতি ধরিতে হইবে। ব্রহ্মার একশত বৎসর কাল পর্য্যন্ত তুমি বিবিধ গুণের সাহায্যে সৃষ্টির কার্য্য করিবে। হে পুরুষোত্তম, গুণসকলের মধ্যে তোমারই প্রাধান্য, কারণ তুমি সত্বগুণাত্মক (১)।' এই সমুদায় কথা শুনিয়া বিষ্ণু মহাদেবের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, এবং কখনও যদি কোন প্রকারে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা দেখান হয়, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শম্ভু অন্তর্হিত হইলেন। বিষ্ণুর নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। তদনন্তর বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন।

বস্তুত্বে চাপ্যনেকত্বং চরতোঽপি তথৈব চ।
মদ্ভক্তো যো নরো ভূত্বা তব নিন্দাং করিষ্যতি ॥
তস্যাহং সকলং পুণ্যং ভস্মীকৃত্বাবিশেষতঃ।
নরকে পাতয়িষ্যামি তদ্দোষাৎ পুরুষোত্তম ॥
লোকেঽস্মিন্ ভুক্তিদো নৃণাং মুক্তিদশ্চ বিশেষতঃ।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ সর্ব্বেষাং নিগ্রহানুগ্রহং কুরু ॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা।৫।১৩-২০।

(১) ইত্যুক্ত্বা চৈব ব্রহ্মাণং হস্তে ধৃত্বা স্বয়ং হরিম্।
কথয়ামাস দুঃখেষু সহায়ো ভব সর্ব্বদা ॥

ব্রহ্মা জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অঞ্জলিপূর্ণ নিজ বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-সমন্বিত একটী অণ্ড জন্মিল। ব্রহ্মা স্বয়ং বিরাট্‌রূপ ধারণ করিয়া সেই অণ্ডকে জড়রূপে দর্শন করিলেন। তখন তিনি সন্দেহাকুলিত-চিত্ত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বিষ্ণুর ধ্যান পূর্ব্বক তপস্যা করিলেন। বিষ্ণু ব্রহ্মার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে ঐ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ-স্বরূপ হইয়া উহাতে চৈতন্য সঞ্চারের জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি অনন্তরূপে সেই অণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ বিশিষ্ট হইয়া, ভূমি সর্ব্বতোভাবে স্পর্শ পূর্ব্বক, সেই অণ্ড ব্যাপিয়া রহিলেন (১)। বিষ্ণুর প্রবেশে চতুর্দ্দশ ভুবন

সর্ব্বাধ্যক্ষশ্চ দেবেষু ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ।
ভব ত্বং সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধকঃ॥
সর্ব্বেষাং প্রাণরূপশ্চ ভব ত্বঞ্চ মমাজ্ঞয়া।
ত্বাঞ্চ সমাশ্রিতা যে বৈ মামেব সমুপাশ্রিতাঃ॥
অন্তরং যশ্চ জানাতি নিরয়ে পততে ধ্রুবম্॥
ইদং রূপং ত্বয়া তাবদীক্ষণীয়ং মদাজ্ঞয়া।
যাবচ্চ ব্রহ্মণোঽপ্যায়ুঃ শতবর্ষমুদাহৃতম্॥
চতুর্যুগসহস্রাণাং সমূহং দিনমুচ্যতে।
রাত্রিশ্চ তাবতী তস্য মানমেতৎক্রমেণ তু॥
তাবৎ সৃষ্টেশ্চ কার্য্যং বৈ কর্ত্তব্যং বিবিধৈ গুণৈঃ।
গুণেষু চ ভবান্ শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্বাত্মা পুরুষোত্তম॥

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা।৫।২১-২৭।

(১) অনন্তরূপমাস্থায় প্রবিবেশ হরিঃ স্বয়ম্॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা তদণ্ডং ব্যাপ্তবানিতি॥ ঐ।৫।৪৩-৪৪।

সচেতন হইল। ব্রহ্মা প্রথমে কতকগুলি মানস পুত্রের সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁহারা উর্দ্ধরেতা হওয়ায় তিনি অপর ঋষিদের সৃষ্টি করেন। তাঁহারাও সংসারবিরাগী হওয়ায় ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া রোদন করেন। সেই রোদন হইতে হর উৎপন্ন হয়েন। রোদন হইতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রুদ্র (১)। রুদ্র ব্রহ্মার সন্তোষ বিধানের জন্য, সৃষ্টি চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়া, কৈলাস-পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ভৃগু প্রভৃতি সাত জন ঋষিকে সৃষ্টি করিলেন, এবং তাঁহারা ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।"

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে বস্তু বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাকে শিবপুরাণে সর্ব্বব্যাপী ও অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মময় তেজ-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মহাদেব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গুণাবতার রুদ্রকে (যিনি বিশ্ব সংহার করেন তাঁহাকে) এই মহাদেবের সঙ্গে অভিন্ন বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকেও অবশ্য মহাদেব হইতে ভিন্ন বলা হয় নাই। বিষ্ণুভাগবতে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র বিষ্ণু বিদ্যমান ছিলেন এই কথা বলা হইয়াছে (২), এবং গুণাবতার বিষ্ণু (যিনি বিশ্ব পালন করেন তিনি) সেই আদি বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অবশ্য ব্রহ্মা ও শিবকে সেই

---

(১) তেনৈব রোদনং চক্রে ততশ্চৈবাভবদ্ধরঃ ॥
রোদনাদ্রুদ্রনামেতি প্রসিদ্ধো ভগবান্ ভবঃ ॥
শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ।৬।৬-৭।

(২) অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।২।৯।৩২।

বিষ্ণু হইতে বিভিন্ন বলা হয় নাই (১)। কিন্তু এই পরম পুরুষ বিষ্ণুর স্বরূপ কি ?

পরম পুরুষ বিষ্ণুর স্বরূপ লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ এই অনাদি ও সকলের আদি বিষ্ণুকে সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যাকার মূর্ত্তি বলেন এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহারই অঙ্গ-জ্যোতি এইরূপ বলিয়া থাকেন (২)। এরূপ বলার মূলে যুক্তি এই যে, জ্যোতি থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে উহা কোন বস্তুর জ্যোতি, এই জ্যোতির অন্তরালে কোন বস্তু আছে। সবিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুই সেই বস্তু। ইঁহাকে অন্যের দেখিবার সাধ্য নাই, কেবল ভক্তই ইঁহাকে দেখিতে

---

(১) অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥
আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।৪।৭।৪৭-৪৮।

(২) যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভাঃ
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আদি লীলা। প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানং সমৃদ্ধিঃ সম্পত্তির্যশশ্চৈব বলং ভগঃ।
তেন শক্তির্ভগবতী ভগরূপা চ সা সদা ॥ ১১।
যয়া যুক্তঃ সদাত্মা চ ভগবাংস্তেন কথ্যতে।
স চ স্বেচ্ছাময়ো দেবঃ সাকারশ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥

পান। এই যুক্তির অনুকূলে সূর্য্যকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় যে, সূর্য্যকে বাহিরে যেমন নির্ব্বিশেষ দেখা যায়, কিন্তু ঐ

তেজোরূপং নিরাকারং ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা।
বদন্তি চ পরংব্রহ্ম পরমানন্দমীশ্বরম্॥ ১৩।
অদৃশ্যং সর্ব্বদ্রষ্টারং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণম্।
সর্ব্বদং সর্ব্বরূপং তং বৈষ্ণবাস্তন্ন মন্যতে॥ ১৪।
বদন্তি চৈতে কস্য তেজস্তেজস্বিনা বিনা।
তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং ব্রহ্ম তেজস্বিনং পরম্॥ ১৫।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং সর্ব্বকারণকারণম্।
অতীবসুন্দরং রূপং বিভ্রতং সুমনোহরম্॥ ১৬।

... ...

অগ্নিদগ্নিবিশুদ্ধৈকপীতাংশুকসুশোভিতম্।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং রত্নভূষণভূষিতম্॥ ২০।

... ...

পরিপূর্ণতমং সিদ্ধং সিদ্ধেশং সিদ্ধিকারকম্।
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বদ্দেবদেবং সনাতনম্॥ ২২।

দেবীভাগবতম্।৯।২।

ভক্তগণের চিত্তকে প্রশান্ত ও একমুখীন করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদের ধ্যানের সুবিধার জন্য ভগবানের এই ভক্তমনোহর মূর্ত্তি, কিন্তু ভগবানের স্বরূপ পৃথক্ পদার্থ, ইহা স্বীকার করিলে বেদের সঙ্গে কোন বিরোধ থাকে না। তন্ত্রে যেমন দেবাদিদেব শিব বলিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম ধ্যানের প্রবোধের জন্য স্থূল ধ্যান, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছেন যে, শ্রীবিষ্ণুর স্থূল মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে মনকে ক্রমশঃ-

জ্যোতির ভিতরে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি রথ অশ্ব ও সারথী আছে, সেইরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অন্তরালে সবিশেষ ব্রহ্ম কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর শরীর আছে এবং তাঁহার লীলা চলিতেছে। এখন বিচারের বিষয় এই যে, শিবপুরাণে যে আদি ব্রহ্মময় তেজের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বা উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম সূর্য্যতেজ তুল্য দৃশ্য বস্তু কি না। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উহার মধ্যে সবিশেষ মূর্ত্তি থাকিবে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিয়াছেন, তাহাই আমরা এস্থানে উল্লেখ করিব ও তাহাই শেষ সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিব, কারণ ঐ দুইখানি গ্রন্থকে বৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞেয় ও আরাধ্য বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইনি সৎও নহেন অসৎও নহেন, সর্ব্বত্র ইহার হস্ত পদ চক্ষু মস্তক ও মুখ, ...ইনি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ইঁহাকে জানা যায় না, ইনি ভূত সমূহের সৃষ্টি স্থিতি ও পালন কর্ত্তা, ইনি অবিভক্ত হইয়াও ভূতসমূহে বিভক্তের ন্যায় অনুমিত হয়েন, ইনি জ্যোতিসকলেরও জ্যোতি-স্বরূপ, ইনি অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত, ইনি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য, ইনিই সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন (১)। এই

কেন্দ্রীভূত করিবে এবং অবশেষে নির্বিষয় করিবে। সুতরাং উভয় স্থলেই দেখা যাইতেছে, বৈদিক ব্রহ্মই চরম লক্ষ্য।

(১) জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষামি যজ্‌ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃ পানিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
... ...
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

পরম বস্তুকে জ্যোতি বলার উদ্দেশ্য কি? জড়-জগতে জ্যোতি বা আলো দ্বারা যেমন সকল বস্তু আলোকিত বা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ সকল বস্তুই তাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। তিনি অখণ্ড-জ্ঞানরূপী (১), আর জ্ঞানই সকলের দ্রষ্টা অতএব প্রকাশক, এই জন্য তিনি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম অর্থাৎ অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি যদি "আলো" (অন্ধকারের বিপরীত) হয়েন তবে ত দৃশ্য বস্তু হইলেন, কিন্তু তিনি তাহা নহেন, কারণ তিনি সাক্ষি-স্বরূপ, তিনি সকলের দ্রষ্টা। অবোধ লোকেরাই দ্রষ্টাকে দৃশ্য পদার্থ বলিয়া থাকে (২)। একটী দীপশিখাকে যেমন আর একটী দীপশিখা দ্বারা দেখিতে হয় না, সূর্য্যকে যেমন মশালের আলোকে দেখার দরকার হয় না, তেমনি দ্রষ্টা পরমেশ্বর স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহাকে অন্য কিছুর সাহায্যে দেখিতে হয় না। এই সব কারণে তাঁহাকে জ্যোতিস্বরূপ

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।১৩।১২-১৭।

(১) বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।২।১১।

(২) এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি॥
যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্ব্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১।৩।৩০-৩১।

বলা হইয়া থাকে। তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তিনি কাহারও অঙ্গজ্যোতি নহেন, বরং তাঁহা দ্বারাই সকল অঙ্গ প্রকাশিত হইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন বসুদেব ও দৈবকীর পুত্ররূপে দেহ ধারণ করিয়া ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সময় বসুদেব তাঁহার অলৌকিক রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "হে প্রভো, আপনাকে জানিতে পারিলাম, আপনি প্রকৃতির পরপারস্থিত পরম পুরুষ, আপনি কেবল অনুভব ও আনন্দ স্বরূপ, আপনি সকল বুদ্ধির সাক্ষী।...........আপনি সর্ব্ব-স্বরূপ, সকলের আত্মা এবং সর্ব্বব্যাপী পরমার্থ বস্তু, অতএব অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া আপনি কিছু দ্বারা আবৃত নহেন ও সেই হেতু আপনার বাহির ও ভিতর এরূপ কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি আত্মার দৃশ্য গুণসকলে অর্থাৎ দেহাদিকে আত্মব্যতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করে সে অজ্ঞ, কারণ যে দেহাদি পদার্থকে বিচার করিয়া দেখিলে বাক্যমাত্র ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া বোধ হয় না, সে ব্যক্তি সেই মিথ্যা পদার্থসকলকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছে। হে বিভো, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, নির্গুণ ও বিকার-রহিত আপনা হইতে এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে; আপনি ঈশ্বর ও ব্রহ্ম, সুতরাং আপনি নির্গুণ হইলেও আপনাতে সগুণের কাজ হওয়া অসম্ভব নয়; গুণসকল আপনারই আশ্রিত, এইহেতু গুণ সকলের কর্ম্ম যে সৃষ্টি পালন ও সংহার তাহা আপনাতে আরোপিত হইয়া থাকে (১)।" মাতা দেবকীও ভক্তিভরে স্তুতি করিয়া বলিয়া-

(১) বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্॥

ছিলেন, "বেদে যাঁহাকে আদি, অব্যক্ত, ব্রহ্ম, জ্যোতি (১), নির্গুণ, নির্ব্বিকার, সত্তামাত্র, নির্ব্বিশেষ এবং নিরীহ বলা হইয়াছে আপনি সাক্ষাৎ সেই বিষ্ণু; আপনি অধ্যাত্মদীপ অর্থাৎ আত্মরূপে বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশক। দ্বিপরার্দ্ধকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে, কালবেগে যখন সমস্ত ব্যক্ত বস্তু অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ করিবে, তখন 'শেষ' নামে একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকিবেন। হে প্রকৃতির বন্ধু বা প্রবর্ত্তক, নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিপরার্দ্ধ কালে অর্থাৎ বিশ্বের ব্যক্ত

অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে
সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ ॥
য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি
ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং
সম্যগ্ যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্ ॥
ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি ন বিরুধ্যতে
ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ।১০।৩।১১ ও ১৪-১৬।

(১) "জ্যোতি" শব্দে এখানে "চৈতন্য" বা "জ্ঞান" বুঝিতে হইবে, নচেৎ "আলো" বা "কিরণ" বুঝিলে অব্যক্ত, নির্গুণ, সত্তামাত্র, নির্বিশেষ নিরীহ এই সব বিশেষণ উহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। "অধ্যাত্ম-দীপ" এই শব্দ দ্বারা ঐ জ্যোতিটা কি রকমের জিনিস তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আবার উহাকে বিষ্ণু বলায় উহা সর্ব্বব্যাপক ইহাও বুঝাইতেছে।

অবস্থায় থাকা সময়ে, কালকর্ত্তৃক জগতের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহাই আপনার লীলা; আপনি মঙ্গলসমূহের আকর এবং ঈশান, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম (১)।" সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ কি অবস্থায় ছিলেন, সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়ে, এইরূপ উক্ত আছে:—"সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে জীবগণের আত্মস্বরূপ এবং প্রভু পরমাত্মা নানাবুদ্ধি দ্বারা উপলক্ষিত হয়েন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র ভগবদ্-রূপই ছিল। সে সময়ে একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন, দৃশ্য দ্রষ্টা বা দর্শন এ সব কিছুই ছিল না, সুতরাং সেই পরমেশ্বর দ্রষ্টৃস্বরূপ হইয়াও কোন দৃশ্য দেখিতে পান নাই। তখন তাঁহার মায়াশক্তি সুপ্ত থাকায়, দৃশ্য ও দর্শনের অভাবে, তিনি নিজেও যেন নাই এইরূপ মনে করিতেন, কিন্তু তাঁহার চিৎ-শক্তি

---

(১) রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥
নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে
মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে
ভগবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ॥
যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াং
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্। ।১০।৩।২১-২৩।

বিদ্যমান থাকা হেতু নিজে যে একেবারে নাই এরূপও বোধ করিতে পারেন নাই (১)।" জ্যোতিস্বরূপ বলিলে যে জ্ঞাতৃত্ব-ভাব বুঝায় তাহাও ইহা হইতে বেশ প্রমাণিত হয়। তাহা হইলেই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৈষ্ণবদিগের মতে সর্ব্বকারণের কারণ অর্থাৎ মায়ারও আদি যিনি বিষ্ণু বা কৃষ্ণ তিনি শিবপুরাণোক্ত আদি মহাদেবের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে এক। দেবীভাগবতে ভগবতীও বলিয়াছেন, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই আত্মস্বরূপে বিদ্যমান ছিলাম। আমার আত্ম-স্বরূপকে চিৎ, সংবিৎ ও পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। আমার সেই স্বরূপ কোন প্রকারে নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহা অনুমানাদি প্রমাণের বিষয়, তাহার সহিত কোন বস্তুরই তুলনা হয় না এবং তাহা সর্ব্বপ্রকার বিকার-রহিত। তাহারই কোন স্বতঃসিদ্ধা শক্তি মায়া নামে বিখ্যাতা (২)'। সুতরাং শাক্তপুরাণেও কোন মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম ও দশম অধ্যায়ে এবং তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম, ষষ্ঠ, দশম, দ্বাদশ ও বিংশ অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব সবিস্তর

(১) ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥
স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্ দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্। ।৩।৫।২৩-২৪।

(২) অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎসংবিৎপরব্রহ্মৈকনামকম্॥
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যমনৌপম্যমনাময়ম্।
তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা॥

দেবীভাগবতম্। ।৭।৩২।২-৩।

বর্ণিত হইয়াছে। রূপক (১) বাদ দিয়া সারাংশ গ্রহণ করিলে, উহা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যে সৃষ্টিতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই দাঁড়ায়। শিবপুরাণেরও সৃষ্টিতত্ত্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ এবং তাহাতে মহাদেবের মধ্যস্থতা ইত্যাদি গল্পাংশ বাদ দিলে এবং রূপক ভাঙ্গিলে, উহার সারভাগে ও এই গ্রন্থের পূর্ব্বোল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বে কোন ভেদ থাকে না। দেবীভাগবতের সর্গ ও প্রতিসর্গ শ্রীমদ্ভাগবতের সর্গ ও বিসর্গ হইতে পৃথক্ নহে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে, তাহাই পুরাণসমূহে বিস্তৃতভাবে উপাখ্যান ও রূপকের ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদের (paragraph) প্রথম পাদটীকায়, পুরাণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বেদে সৃষ্টি-বর্ণনাই পুরাণ নামে অভিহিত। স্মৃত্যুক্ত পুরাণ যখন বেদমতেরই সহজ ব্যাখ্যা, তখন পুরাণের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-বর্ণনা বেদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-বর্ণনা হইতে পৃথক্ হইতে পারে না।

সকল পুরাণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মই মানবের উপাস্য; তবে অবশ্য এক এক সম্প্রদায়ের পুরাণ ব্রহ্মের এক একটী পৃথক্ নাম দিয়াছেন—কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ভগবতী, কালী ইত্যাদি।

---

(১) পুরাণে অনেক স্থলে রূপক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রমাণস্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে, পঞ্চবিংশ হইতে উনত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত, পুরঞ্জনের বৃত্তান্ত এবং পঞ্চম স্কন্ধের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভরত কর্ত্তৃক ভবাটবীবর্ণনা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই দুই স্থানে পুরাণকার নিজেই রূপক ভাঙ্গিয়া দেখাইয়াছেন যে, কবিত্ব-পূর্ণ বর্ণনাবাহুল্যের মধ্য হইতে কিরূপভাবে আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিতে হয়।

ইহাদের প্রত্যেকেই জগৎ-স্থষ্টির পূর্ব্বে স্বরূপে ছিলেন, পরে বহু হইবার ইচ্ছা করিয়া সগুণ হইয়াছেন ও জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন, এইরূপই প্রায় পুরাণের মত। কাজেই এ বিষয়েও পুরাণগুলি উপনিষদের সহিত একমত।

পুরাণ ও তন্ত্র কথোপকথনের ছলে লিখিত। সে সময়ে গ্রন্থ লিখিবার প্রথা বোধ হয় এইরূপই ছিল; বর্ত্তমানে যেভাবে ঘটনা-পরম্পরা বা কোন লোকের জীবনী ইত্যাদি গদ্যে বর্ণনার ভাবে (narrative wayতে) লিখিত হয়, তখন বোধ হয় সেরূপভাবে লিখিত হইত না। এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর দ্বারা গ্রন্থ লেখা অনেক স্থলেই লিখিতব্য বিষয়গুলি অবতারণা করার একটা কৌশল মাত্র। এখনও পঞ্জিকায় বৎসরের ফলাফল লিখিবার সময় এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। কৈলাশ-পর্ব্বতের রমণীয় শিখরে উপবিষ্ট হইয়া, দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই বৎসরে কোন্ গ্রহ রাজা হইলেন, কোন্ গ্রহই বা তাঁহার মন্ত্রী হইলেন, তাহা বলুন, এবং এই বৎসরের অন্যান্য জ্ঞাতব্য ফলাফলগুলিও অনুগ্রহ করিয়া বলুন।" ভগবতীর কথার উত্তরে মহাদেব যাহা বলেন, তাহাই শুনিয়া আসিয়া পঞ্জিকা-কারগণ বৎসরের ফলাফল লিখিয়া থাকেন, তাহা নহে।

অনেক বর্ণনীয় বিষয় রূপকের আবরণ দিয়া লেখাও তখন অল্লাধিক চলিত ছিল। পুরাণসমূহেই যে শুধু এইরূপ দেখা যায় তাহা নহে, খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেও এই প্রকার রূপক (parables) অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। পুরাণে কোন কোন স্থানে পুরাণকর্ত্তা নিজেই ঐ রূপকের রহস্য বলিয়া দিয়াছেন, অনেক স্থলে তাহা দেন নাই, কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে সেই রূপকের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়। এ স্থলে ইহার দুই চারিটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে:—

(১) মহাভারতের আদি পর্ব্বে, তৃতীয় অধ্যায়ে, বর্ণিত আছে—

ধৌম্যনামক উপাধ্যায়ের (আচার্য্যের) শিষ্য উপমন্যু গুরুর আদেশ মত আহার বর্জ্জন করেন, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া একদিন আকন্দ-পত্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ হওয়ায় তিনি কূপে পতিত হয়েন। পরে গুরুর উপদেশ-অনুসারে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিয়া, উপমন্যু তাঁহাদের কৃপায় পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। এই উপাখ্যানে, উপমন্যু যে সুদীর্ঘ বেদমন্ত্র দ্বারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাধারণ ব্যাধিচিকিৎসাকারী কবিরাজ নহেন। জীবের দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামক সখারূপী দুই পক্ষী বাস করেন, ইঁহারা সন্তুষ্ট হওয়ায় উপমন্যুর মোক্ষসাধক দিব্যদৃষ্টি বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইল। জীব, অজ্ঞান-প্রভাবে অন্ধ হইয়া সংসারকূপে পতিত হইলে, তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশে যদি হৃদয়স্থ দেবতাকে সাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারে, তবে সে তত্ত্বজ্ঞানরূপ চক্ষু লাভ করিয়া, সেই কূপ হইতে উত্থিত হইতে সক্ষম হয়। ইহাই এই গল্পের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য।

(২) (মহাভারত, আদি পর্ব্ব, তৃতীয় অধ্যায়)। বেদ-ঋষির শিষ্য উতঙ্ক, শিক্ষা শেষ হইলে, গুরুপত্নীর আদেশে, পৌষ্যরাজার ধর্ম্মপত্নী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কুণ্ডলদ্বয়, গুরুদক্ষিণা স্বরূপে গুরুপত্নীকে দিবার জন্য, আনিতে যান। তিনি গমন সময়ে পথিমধ্যে এক বৃহৎ বৃষ ও তদুপরি এক বৃহৎকায় পুরুষ দেখিলেন, এবং ঐ পুরুষের আদেশে সেই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিলেন। তাহার পর, তিনি পৌষ্যরাজার রাণীর নিকট গিয়া প্রার্থনা জানাইলে, রাণী তাঁহাকে ঐ কুণ্ডল দুইটী দান করেন, এবং এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন যে, উহাতে নাগরাজ তক্ষকের লোভ আছে, পথিমধ্যে সে যেন উহা হরণ করিয়া না লয়। উতঙ্ক

প্রত্যাগমন-কালে এক জলাশয়ের তীরে যখন সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছিলেন, সেই সময় তক্ষক ঐ কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করে; উতঙ্ক তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, সে মৃত্তিকার ভিতরে সুড়ঙ্গ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে। উতঙ্ক বহুকষ্টে ভূগর্ভে তক্ষকের বাটীতে উপস্থিত হয়েন, কিন্তু নাগদিগকে নানাবিধ স্তব করিয়াও ঐ কুণ্ডল পাইলেন না। তখন তিনি চিন্তিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই ছয়টী শিশু দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে এরূপ দ্বাদশ অর-সংযুক্ত একটী চক্র, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্রদ্বারা বস্ত্র-বয়নকারিণী দুই জন স্ত্রীলোক, একজন পুরুষ ও একটী মনোহর অশ্ব দেখিতে পাইলেন। এই সময় তিনি ইন্দ্রের স্তব করেন। ইন্দ্রের অনুগ্রহে পরে তিনি সেই কুণ্ডল দুইটী লাভ করিয়াছিলেন, এবং যথাসময়ে গুরুপত্নীর চরণে ইহা দক্ষিণা-স্বরূপে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তে বৃহৎকায় বৃষ ও তদুপরিস্থিত পুরুষ, বস্ত্র-বয়নকারিণী স্ত্রীলোকদ্বয়, চক্র, মনোহর অশ্ব ও তন্নিকটবর্ত্তী পুরুষ দ্বারা কি কি বুঝাইতেছে তাহা মহাভারতের রচয়িতা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন (১)। কিন্তু মোট গল্পটীর তাৎপর্য্য টীকাকার নীলকণ্ঠ যাহা লিখিয়াছেন তাহারই ভাবার্থ এ স্থানে দিতেছি:—কুণ্ডলরূপ বস্তুতত্ত্ব তক্ষকরূপ পাষণ্ডী (বিধর্ম্মী) কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হইতে লব্ধ বিবেকরূপ বজ্রের সাহায্যে, পাষণ্ডীর মতরূপ গর্ত্তকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, উতঙ্করূপ

---

(১) বৃহৎকায় বৃষ—ঐরাবত, তদুপরিস্থিত পুরুষ—ইন্দ্র, বৃষভের পুরীষ—অমৃত, দুইটী স্ত্রীলোক—পরমাত্মা ও জীবাত্মা, দ্বাদশ-অর-সংযুক্ত চক্র—সম্বৎসর, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তু সকল—দিবা ও রাত্রি, ছয়টী কুমার—ছয় ঋতু, অশ্বটী—অগ্নি, তাহার নিকটবর্ত্তী পুরুষ—পর্জ্জন্য বা ইন্দ্র।

সাধক, অন্নময় মনোময় ইত্যাদি কোষ ভেদ করতঃ, মনোরম অন্তর কোষে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে সত্যসঙ্কল্পত্বাদি সম্পদ্ দৃষ্টে, তদভিমানী সর্পরূপ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতিকে অনুনয় বিনয় করিয়াও যখন তিনি তত্ত্ব-রত্ন পাইলেন না, তখন বিপদাপন্ন হওয়াতে, পূর্ব্বে সাঙ্গ বেদ যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহারই আলোচনা দ্বারা নিজেই তত্ত্বরত্ন লাভ করিলেন। উতঙ্ককে যিনি সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি উতঙ্কের জীবাত্মরূপ গুরুর সখা পরমাত্মরূপ ইন্দ্র বা পুরন্দর। ইনি স্বধর্ম্মানুরাগী সকল ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করেন, আর ধর্ম্মত্যাগী পাষণ্ডের কুলক্ষয় করেন।

(৩) (জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ)। মহারাজ পরীক্ষিৎ শমীক মুনির গলদেশে মৃতসর্প জড়িত করায়, শমীকপুত্র শৃঙ্গী অভিসম্পাত করেন যে, সাত দিনের মধ্যে তক্ষকদংশনে যেন পরীক্ষিতের জীবন নষ্ট হয়। এই অভিশাপ অবলম্বন করিয়া, তক্ষক সপ্তম দিবসে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আনীত ফলের ভিতর থাকিয়া পরীক্ষিতের নিকট গমন করে, এবং তাঁহাকে দংশন করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করে। ঐ দিবস কাশ্যপ নামক একজন মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ পরীক্ষিতের জীবন রক্ষা করিবার জন্য আসিতেছিলেন, কিন্তু প্রচুর অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, এই কার্য্য হইতে তক্ষক পূর্ব্বেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। পরীক্ষিতের দেহ-ত্যাগের পর তাঁহার পুত্র জনমেজয় রাজা হয়েন। ইহার কিছু কাল পর মহারাজ জনমেজয় তক্ষশিলা নামক নগর জয় করেন। উতঙ্ক নামক একজন ঋষি, গুরুপত্নীর প্রীত্যর্থে, পৌষ্য-রাজার পত্নীর নিকট হইতে যে কুণ্ডল ভিক্ষা করিয়া অনিতেছিলেন, তাহা তক্ষক হরণ করিয়া লইয়া যায়, ও তাহা উদ্ধার করিতে উতঙ্ককে অনেক বেগ পাইতে হয়। উতঙ্ক এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য, তক্ষক-দংশনে মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছিল

এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, জনমেজয়কে উত্তেজিত করেন এবং সর্পযজ্ঞ করিয়া নাগবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পরামর্শ দেন। অন্যায়ভাবে পিতার প্রাণনাশ-ব্যাপার স্মরণ করিয়া, মহারাজ জনমেজয় অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হয়েন, এবং নাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বহু সর্প এই যজ্ঞাগ্নিতে পড়িয়া নিহত হইলে, বাসুকি-নাগের ভগ্নী মনসাদেবী বা জরৎকারুর পুত্র আস্তিকমুনি যজ্ঞস্থানে আসিয়া, মহারাজ জনমেজয়ের নিকট নিজ আত্মীয় নাগদিগের প্রাণ ভিক্ষা করেন, এবং তাহাতেই হতাবশিষ্ট নাগদিগের জীবন রক্ষা হয়।

এই সর্পযজ্ঞে রূপকের অন্তরালে একটী ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লুক্কায়িত আছে। এই যজ্ঞে নিহত সর্পসকল সরীসৃপ নহে, উহারা নাগ-উপাধিধারী মনুষ্য। এখনও অনেক বংশের নাগ-উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। (সিংহ, ধনু, গুণ, হাতী প্রভৃতি উপাধিও দেখা যায়; সাহেবদের Hog, Wolf, Lion প্রভৃতি উপাধি আছে।) আধুনিক ইতিহাসে শিশুনাগ-বংশের রাজত্ব করার কথা শুনিতে পাই। যদি ঐ সকল নাগ বাস্তবিক সর্পই হইত, তাহা হইলে জরৎকারু-মুনি বাসুকিনাগের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে পারিতেন না। নাগবংশীয়েরা অসভ্য ছিল, সুতরাং আর্য্য-ধর্ম্মের বিরোধী ছিল। এই জন্য, মহাভারতে যে স্থানে তক্ষক কর্ত্তৃক উতঙ্ক মুনির নিকট হইতে কুণ্ডল চুরি করিবার চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থানে তক্ষককে "নগ্ন ক্ষপণক (১)" বলা হইয়াছে, এবং টীকাকার নীলকণ্ঠ 'ক্ষপণক' শব্দের অর্থ 'পাষণ্ড ভিক্ষুক' লিখিয়াছেন। 'ক্ষপণক' শব্দের অভিধানিক অর্থ 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসী' আর 'তক্ষক' শব্দের

---

(১) সোঽপশ্যদথ পথি নগ্নং ক্ষপণকমাগচ্ছন্তং
মুহুর্মুহুর্দৃশ্যমানমদৃশ্যমানঞ্চ। মহাভারতম্।১।৩।১২৬।

অর্থ ছেদক, সূত্রধর বা মিস্ত্রী। অতএব তক্ষক যে বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা অসভ্য বিধর্ম্মীদের বংশ, ইহা সহজেই বুঝা যায়। মহাভারতের সময়ও আর্য্য ও অনার্য্যদের মধ্যে বিবাদ সম্পূর্ণ থামে নাই। সেই নিমিত্ত, যাহাতে প্রবলপ্রতাপ আর্য্যদের হস্তে সমূলে বিনষ্ট হইতে না হয়, তাহা করিবার জন্ম নাগরাজ বাসুকি, সন্ধিস্থাপনের উপায়-স্বরূপে জরৎকারু মুনির সহিত নিজ ভগ্নীকে, বিশেষ উদ্যোগী হইয়া, বিবাহ দেন, এবং এই বাসুকির ভাগিনেয় আস্তিক মুনিই অবশেষে জনমেজয়ের কোপ হইতে নাগদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কুপিত শৃঙ্গী যখন অনার্য্য নাগবংশীয় তক্ষকের হস্তে প্রাণনাশ হউক বলিয়া পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত করেন, তখন কোন লোকমুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই হউক বা শৃঙ্গী কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াই হউক, তক্ষক দমনকারী শত্রু আর্য্য ক্ষত্রিয়রাজা পরীক্ষিৎকে বিনষ্ট করিতে প্রস্তুত হয়। কয়েকজন সহচরকে ব্রাহ্মণ-বেশে সজ্জিত করিয়া, এবং নিজে ফলের বাজরায় লুক্কায়িত হইয়া (১), অনায়াসে রাজা পরীক্ষিতের নিকট সে উপস্থিত হয় এবং সুযোগ বুঝিয়া সেই দিনই রাজার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া পলায়ন করে। রাজদরবারে আসিবার সময়, তাহার এই ষড়যন্ত্র জানেন এমন (কশ্যপ-নামধারী) এক জন মুনিকে সে দেখিতে পায়, এবং তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দ্বারা সে বশীভূত করিয়া ফেলে। এইরূপে নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অন্তরায় সে দূরীভূত করিয়াছিল। এই তক্ষক অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিল।

---

(১) মহারাষ্ট্রপতি শিবাজিও এইপ্রকার ফল-বিতরণের ছলনা করিয়া, ফলের বাজরার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, দিল্লীর রাজদরবার হইতে পলায়ন করেন। ইহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

সে পৌষ্যরাজার স্ত্রীর কর্ণের কুণ্ডল দুইটী লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিল, অবশেষে উতঙ্কমুনি পলায়মান তক্ষকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার ভূগর্ভস্থ বাটীতে উপস্থিত হয়েন। সে স্থানে তিনি দেখিলেন সুন্দর ও সমৃদ্ধ একটী নগর অবস্থিত আছে। সৌধাবলী, ক্রীড়াস্থান (১), ইত্যাদি সকলই আছে। (সরীসৃপ সর্প-জাতির বাসস্থানে তাহাদের জন্য এই সকলের প্রয়োজন কি?) নাগদিগকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও কুণ্ডল পুনঃ প্রাপ্ত না হওয়ায় তিনি নিরুপায় হয়েন; কিন্তু কোন দৈব সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি উহা পুনরুদ্ধার করিয়া কোন প্রকারে গুরুগৃহে প্রত্যাগত হয়েন। এই সর্পযজ্ঞ আরব্ধ হইবার কিছুকাল পূর্ব্বেই মহারাজ জনমেজয় পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলা নামক নগর জয় করেন। ঐ নগর সম্ভবতঃ ঐ সময় নাগরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। যাহাই হউক, তক্ষক কর্ত্তৃক (২), পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপীড়িত হওয়ায় উতঙ্কমুনি নাগবংশ সমূলে উৎপাটিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তিনি ইহার বেশ এক সুযোগও পাইলেন, সেটী আর কিছু নহে, সেটী হ'চ্ছে মহারাজ জনমেজয়কে উত্তেজিত করা। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। মহারাজ জনমেজয়, পিতার শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্রায় প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইলেন। তিনি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া, মন্ত্রবলে আকর্ষণ করিয়াই হউক, আর রাজদুর্গ আক্রমণের কোন প্রকার কারণ জন্মাইয়াই হউক, বা অন্য যে কোন উপায়েই হউক,

---

(১) তেনৈব বিলেন প্রবিশ্য চ তং নাগলোকপর্য্যন্তমনেকবিধ-প্রাসাদহর্ম্যবলভীনির্য্যূহশতসঙ্কুলম্ উচ্চাবচক্রীড়াশ্চর্য্যস্থানাবকীর্ণমপশ্যৎ।
মহাভারতম্। ।১।৩।১৩৩।

(২) সম্ভবতঃ তক্ষশিলার অধিবাসীদিগকেও তক্ষক বলিত।

নাগদিগকে আকর্ষণ করিয়া সমরানলে আহুতি দিতে লাগিলেন। নাগ-বংশের এই ঘোর বিপদের সময়, তাহাদের আত্মীয় ব্রাহ্মণ আস্তিকমুনি রাজসভায় আগমন করেন, এবং মহারাজ জনমেজয় ও তাঁহার মন্ত্রণাদাতা ব্রাহ্মণগণকে অনেক স্তুতি-মিনতি করিয়া, উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করেন, তবে অনার্য্য নাগবংশ রক্ষা পায়।

[রূপকের মধ্যে অনেক স্থলে এইরূপ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। ইহা স্বীকার না করিলে নাগকন্যা উলুপীর সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহ, হিড়িম্বানাম্নী রাক্ষসীর সঙ্গে ভীমসেনের বিবাহ, জাম্বুবান্ নামক ভল্লুকের কন্যা জাম্বুবতীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপার হাস্যোদ্দীপক প্রহসনে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, শ্রুতশ্রবা মুনির পুত্র সোমশ্রবা সাপিনীর গর্ভে (মহাভারত আদি পর্ব্ব, তৃতীয় অধ্যায় দেখুন), সত্যবতী মৎস্যের গর্ভে, ঋষ্যশৃঙ্গ হরিণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, এবং আরও অনেক ঋষি প্রভৃতির জন্ম ঐ ভাবে হইয়াছিল দেখা যায়। ইহার রহস্য কি? অসভ্য নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের গর্ভে যে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।]

৪। শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট পুরঞ্জনের পুরী-বর্ণনা ও ভরতের ভবাটবী-বর্ণনা সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, কারণ পুরাণকার নিজেই তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

৫। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে, পৃথিবী-বধার্থ বেণপুত্র রাজা পৃথুর উদ্যোগ ও কামধেনুরূপিণী পৃথিবীর দোহন-বিষয় লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ মৃত বেন-রাজার বাহুদ্বয় মন্থন করিলে একটী পুরুষ ও একটী রমণী উৎপন্ন হইল। ব্রাহ্মণেরা পুরুষটীকে বিষ্ণুর অংশ ও রমণীটীকে লক্ষ্মীর অংশ জ্ঞান করিলেন, এবং পুরুষটীর নাম পৃথু ও নারীটীর নাম অর্চ্চি রাখিবেন। পরে পৃথু

অর্চ্চিকে বিবাহ করেন। পৃথু, রাজ্য গ্রহণ করার পর, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাদের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং বিশেষ চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পৃথিবী ওষধি সকলের বীজ আপনার মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই জন্য শস্য উৎপন্ন হইতেছে না। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে বধ করিবার নিমিত্ত শরসন্ধান করেন। পৃথিবী ভয়বশতঃ গোরূপ ধারণ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াও পরিত্রাণ পাইলেন না, তখন তিনি পৃথুকে ভগবান্ জ্ঞানে স্তব করিলেন। তাহাতে পৃথু সন্তুষ্ট না হওয়ায়, পৃথিবী তাঁহাকে শস্য উৎপন্ন না হওয়ার হেতু বলিতে লাগিলেন। অব্রতধারী দুষ্টলোকেরা সমস্ত বিষয় ভোগ করিতেছিল, এবং পৃথুর ন্যায় মহামনা লোকপালগণও চৌরাদি নিবারণ ও যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন না। সকল লোকেই চৌর হইয়া উঠিতেছিল, এই জন্যই তিনি (পৃথিবী) সমস্ত ওষধি গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়স্বরূপে পৃথিবী পৃথু রাজাকে বলিলেন যে, উপযুক্ত দোগ্ধা দোহন-পাত্র ও বৎস সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দোহন করিলে, তিনি সমস্তই দিবেন। আর পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ অসমান ছিল তাহাও সমতল করিয়া দিতে বলিলেন। পৃথিবীর এই কথা শুনিয়া রাজা পৃথু মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বীয় হস্তরূপ পাত্রে ওষধিসকল দোহন করিলেন, এবং অন্যান্য ব্যক্তিরাও সেইরূপ পৃথিবীকে দোহন করিয়া তাহা হইতে সার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করিয়া, আপনাদের বাক্য মন ও শ্রবণরূপ পাত্রে, পৃথিবী হইতে বেদময় দুগ্ধ দোহন করিলেন। এইরূপে দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পক্ষিগণ, পর্ব্বতসকল, বৃক্ষসমূহ ইত্যাদি সকলেই যথাযোগ্যরূপে বৎস ও পাত্র কল্পনা করিয়া পৃথিবী দোহন করিলেন এবং আপনাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলেন। (চিরদিনই সকলে পৃথিবী হইতে যথাযোগ্য উপায় দ্বারা আপন আপন

অভীষ্ট বিষয় দোহন করিতেছে। এই জন্য পৃথিবীর গো-রূপ ধারণ পুরাণে কল্পিত হয়, এবং পৃথিবীর এক নাম গো।)

এক্ষণে, এই উপাখ্যান পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা যদি সে সরলপ্রাণে ও সততার সহিত অনুষ্ঠান না করে, এবং কেবল কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানের ভান করিয়া ও পরকে প্রবঞ্চিত করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের বা যশঃ লাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে জগতের কার্য্য চলিতে পারে না, সকল কার্য্যেই সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল উৎপন্ন হয় এবং লোকের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। আত্মজ্ঞানী, সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ রাজা যদি প্রত্যেককে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন, তাহা হইলে ক্রমে শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি, ধর্ম্ম ও শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, কোন অভাব থাকে না। (অথবা, ভগবানের অংশ-সম্ভূত পুরুষ বা ঈশ্বর কর্ত্তব্য-বিমুখ জগদ্বাসীদিগকে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ক্লেশের দ্বারা শাসিত করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যে নিয়োজিত করিলে জগতে আবার সুখ ও শান্তি আসে।)

৬। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে, দশম অধ্যায়ে, ভগবান্ শিব কর্ত্তৃক ত্রিপুর দাহ করার বৃত্তান্ত আছে। বিষ্ণুতেজে বর্দ্ধিত দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অসুরেরা ময়দানবের শরণাপন্ন হইলে, ময়দানব তাহাদের জন্য স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, ও লৌহময় তিনটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ পুরীগুলিতে গমনাগমন লক্ষ্য করা যাইত না এবং উহাদের পরিচ্ছেদও অনুমান করা যাইত না অর্থাৎ পুরীগুলি অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইত। এই তিন পুরীতে অলক্ষিতভাবে থাকিয়া অসুরেরা দেবতাদিগকে পীড়া দিতে লাগিল। দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে, তিনি শরনিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ সকল পুরী আবৃত করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং ঐ পুরত্রয়স্থ অসুর-সেনাপতিগণ বাণাঘাতে বিনষ্ট হইল। মায়াবীময় দানব সেই গতপ্রাণ অসুরগণকে

স্বীয় অমৃতময় কূপে নিক্ষেপ করায়, তাহারা পুনর্জ্জীবিত ও অত্যন্ত দৃঢ়-দেহ-সম্পন্ন হইল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বৎস করিয়া ও স্বয়ং গাভী হইয়া সেই ত্রিপুর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ঐ কূপের রসামৃত সমুদায় পান করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ভগবান্ হরি নিজ শক্তিস্বরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, তপস্যা, বিদ্যা ও ক্রিয়াদি দ্বারা শম্ভুর রথ, সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, বাণ, বর্ম্ম প্রভৃতি রচনা করিয়া দিলেন। তখন মহেশ্বর বর্ম্ম পরিধান করিলেন এবং ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে সেই পুরীত্রয় অনায়াসে ভেদ করিয়া ফেলিলেন। (ইহাই মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুরাসুর বধ জানিতে হইবে।)

এখন ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ঐ তিন পুরী জীবের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ। ঐ দেহত্রয় অবলম্বন করিয়াই কুবৃত্তিসকল সদ্বৃত্তিসকলকে পদদলিত করে বা করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রীগুরুরূপী ভগবানের কৃপায় সাধক যখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা, বিদ্যা প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত হইতে পারেন, তখন তিনি অনায়াসে এই ত্রিবিধ দেহ ভেদ করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন।

৭। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়ে, দেখা যায় যে, দেবর্ষি নারদ দক্ষ-প্রজাপতির হর্য্যশ্ব নামক সহস্র পুত্রকে রূপকের আবরণে চরম কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়াছেন। ঐ রূপকের প্রকৃত মর্ম্ম পুরাণকার নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই।

কোন কোন স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, এক পুরাণে একটী ঘটনা একভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক সেই ঘটনাই অন্য পুরাণে কিছু রূপান্তরিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ কয়েকটী ঘটনা এস্থলে

উল্লেখ করিয়া, কি ভাবে তাহার সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, তাহা দেখিতে চেষ্টা করা যাউক :—

(১) তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু-বৃত্তান্তে মহাভারত ও দেবীভাগবত বলেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করা উচিত বিবেচনায়, (ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে নহে), তক্ষক যাহাতে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারে, তজ্জন্য যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বিষ্ণু-ভাগবত বলেন যে, পরীক্ষিৎ তাহা করেন নাই, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া, গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক, অনাহারে থাকিয়া ভগবানের গুণকীর্ত্তন শ্রবণে নিযুক্ত ছিলেন। বিষ্ণু-ভাগবতে এরূপ করার একটা উদ্দেশ্য আছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন, কাজেই দেহ-রক্ষায় আর তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না ; কিন্তু নিজের যাহাতে সদ্গতি লাভ হয় তাহার প্রতি তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল, সেই জন্য তিনি অন্তিম সময়ে ভগবৎকথা শ্রবণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই ভাবটী দেখান এই পুরাণের লক্ষ্য। মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে থাকা সময়ে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তিনি জন্মাবধিই অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, সুতরাং আসন্ন মৃত্যু জানিয়া অনিত্য দেহ-রক্ষার চেষ্টা না করা এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করাটাই তাঁহার পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত দেখাইয়াছেন, এবং এই উপলক্ষ করিয়া বিষয়-বিরাগের ঔচিত্য, ভগবদ্ভক্তের ভাব, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবানের লীলাবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মশাপ ও তাহার ফলে ছদ্মবেশী তক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষিতের জীবন-নাশ বিষয়ে ঐ তিন গ্রন্থের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

(২) (মহর্ষি ব্যাসের পুত্র শুকদেবের বৃত্তান্ত।) মহাভারত ও

বিষ্ণু-ভাগবতের মতে শুকদেব চিরকুমার। দেবীভাগবতের মতে, বিদেহরাজ জনকের নিকট উপদেশ পাইয়া শুকদেব বিবাহ করেন। তাঁহার চারিটী পুত্র ও একটী কন্যা হইলে পর, তিনি নারদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া, কৈলাস-পর্ব্বতে তপস্যা করেন এবং পরমগতি লাভ করেন। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে শুকদেবের বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং নিবৃত্তির আদর্শ স্বরূপে তাঁহাকে দাঁড় করা হইয়াছে। বিষ্ণু-ভাগবতে তীব্র-বৈরাগ্য-প্রাপ্ত পরীক্ষিতের গুরুরূপে শুকদেবকে উপস্থিত করা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে চির বিরাগী ও পরম তত্ত্বজ্ঞানীরূপে বর্ণনা করা আবশ্যক হইয়াছে। দেবী-ভাগবত শক্তি-বিষয়ক পুরাণ। শক্তির প্রভাব বর্ণনই ইহার প্রধান কার্য্য (১)। শুকদেব যখন মায়ার রাজ্যে অবস্থিত ছিলেন, তখন আস্তে আস্তে বিষয়-ভোগের মধ্য দিয়া মায়া জয় না করিয়া প্রথমেই সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কোন মনুষ্যই আশ্রম-ত্রিতয়ের মধ্য দিয়া না আসিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারে

(১) শক্তিহীনস্তু নিন্দ্যং স্যাদ্বস্তুমাত্রং চরাচরম্।
অশক্তঃ শত্রুবিজয়ে গমনে ভোজনে তথা॥
এবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে।
সোপাস্যা বিবিধৈঃ সম্যগ্বিচার্য্যা সুধিয়া সদা॥
... ...
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যমন্যেষাং বচনং বুধৈঃ।
শক্তিরেব সদা সেব্যা বিদ্বদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ॥
প্রত্যক্ষমপি দ্রষ্টব্যমশক্তস্য বিচেষ্টিতম্।
অতঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু জ্ঞাতব্যা শক্তিরেব হি।
দেবীভাগবতম্।১।৮।৩৩-৩৪ ও ৫০-৫১।

না (১), এই যুক্তি দেখাইয়া দেবীভাগবত শুকদেবকে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারাশ্রম পালন করিতে বাধ্য করিয়াছেন। অতএব মহাভারত ও বিষ্ণুভাগবতের উদ্দেশ্য এক প্রকার, দেবীভাগবতের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। এই জন্যই শুকদেবের জীবনীও দুই প্রকার হইয়াছে। নচেৎ শুকদেব যে ব্যাসদেবের পুত্র, তিনি যে সংযমী ও জ্ঞানী ছিলেন এবং অন্তে পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

(৩) বিষ্ণুভাগবতের মতে প্রহ্লাদ জন্মাবধি ভগবানের ভক্ত ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ছিলেন। তিনি দৈত্য বালকগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিতেন। এমন কি স্বীয় গুরু ষণ্ড ও অমর্ককে এবং নিজ পিতা

---

(১) যদা সমুত্থিতং চৈতদ্ ব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাত্মকম্।
কর্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ॥
... ...
কামক্রোধৌ চ লোভশ্চ সর্ব্বে দেহগতা গুণাঃ।
দৈবাধীনাশ্চ সর্ব্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ॥
রাগদ্বেষাদয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেঽপি প্রভবন্তি হি।
দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চ তথা পুনঃ॥

দেবীভাগবতম্।৪।২।৩ ও ৯-১০।

অহঙ্কারাদ্ বন্ধকারী নান্যোঽস্তি জগতীতলে।
তেনেদং রচিতং বিশ্বং কথং তদ্রহিতং ভবেৎ॥
ব্রহ্মা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরহঙ্কারযুতাস্ত্বমী।
অন্যেষাঞ্চৈব কা বার্ত্তা মুনীনাং বসুধাধিপ॥

দেবীভাগবতম্।৩।১০।২২-২৩।

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি শিষ্টানুশাসনম্॥

দেবীভাগবতম্।১।১৮।২২।

হিরণ্যকশিপুকেও তিনি তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন (যদিও তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই)। ভগবান্ নৃসিংহ কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে, প্রহ্লাদ ভক্তি-গদ্গদ-চিত্তে ভগবান্কে স্তব করিয়াছিলেন, এবং ভগবান্ তাঁহাকে নানাবিধ বর দিতে চাহিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ অন্য বর লয়েন নাই; যাহাতে আর কামনার দাস না হইতে হয় এবং চিরদিন ভগবানে ভক্তি থাকে, কেবল তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হওয়ার পর আর যে কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিয়াছেন এমন কথা বিষ্ণুভাগবতে নাই। বরং, বিষ্ণু (বামনদেব) তাঁহার পৌত্র বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে (বলিকে) যখন সুতলে পাঠাইবার জন্য বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই সময় প্রহ্লাদ সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, বলির সম্পদ্-হরণও যে ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, দেবীভাগবতের মতে প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত। তিনি পিতার মৃত্যুর পর ধর্ম্মনিরত হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। একদিন তিনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে আগমন করেন, এবং সে স্থানে স্নান-দানাদি করার পর ধনুঃশরধারী নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে দেখিতে পান। অহিংসক মুনিদেরও হিংসাবৃত্তি আছে দেখিয়া, প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলে, তাঁহারা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। বহুকাল যুদ্ধ হওয়ার পর, নারায়ণ সেই স্থানে আগমন করিয়া, প্রহ্লাদকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করেন ও নিজ পুরীতে গমন করিতে আদেশ করেন। এইরূপে যুদ্ধ-নিবৃত্তি হয়। আবার মহর্ষি ভৃগু কিজন্য ভগবান্কে অভিশম্পাত দিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া, প্রহ্লাদ যে পিতৃরাজ্য লাভ করার পর স্বর্গরাজ্য লাভের নিমিত্ত দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত দেবতাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারও বর্ণনা দেবীভাগবত দিয়াছেন।

বিষ্ণুভাগবতের প্রহ্লাদ সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও প্রীতিসম্পন্ন এবং বিষয়-বাসনা-রহিত, কাজেই সেখানে বিবাদের নাম গন্ধও নাই, কারণ তাহা থাকিলে ঐ সকল গুণের বিরোধী ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দেবীভাগবতের মতে দেবগণও যখন গুণাধীন, তখন দৈত্য আর কোন ছার। তাই পরম বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদও পূর্ব্বপুরুষ কশ্যপের উত্তরাধিকারসূত্রে স্বর্গরাজ্য লাভের আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই; আর মহা তপস্বী ও বিষ্ণুর অংশ হইয়াও নর-নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয় যখন যুদ্ধ করিতে বিরত নহেন, তখন তাঁহাদের আশ্রম-বিরুদ্ধ আচরণ দর্শনে দৈত্যকুলজাত প্রহ্লাদের কোপ হওয়াটা খুব অসম্ভব ব্যাপার নহে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে দুই ভাগবতই স্বীকার করিতেছেন, প্রহ্লাদ ধার্ম্মিক ও বিষ্ণুভক্ত; কিন্তু বিষ্ণুভাগবত, সংযমের উৎকর্ষ দেখাইতে উদ্‌গ্রীব বলিয়া, প্রহ্লাদকে আর যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে ফেলেন নাই, এবং দেবীভাগবত, সকলেই যে শক্তির অধীন ইহা প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর বলিয়া, প্রহ্লাদকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

শাস্ত্র-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া আরও একটু অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, বেদে যে সকল সামান্য সামান্য রূপক আছে, তাহা যেন বেদরূপ ক্ষেত্রে বীজরূপে উপ্ত আছে, আর তাহাই পুরাণকাররূপ মালীর হাতে পড়িয়া, সুন্দর শাখা প্রশাখা পল্লব পুষ্প ফল প্রভৃতিতে সুশোভিত মহা মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে। বেদের ঐ সকল রূপকের অর্থ ব্রাহ্মণভাগে অনেক দেওয়া হইয়াছে। শতপথ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ তাহার দৃষ্টান্ত। প্রধান প্রধান উপনিষদ্‌গুলি যথাসম্ভব স্পষ্টভাষায় আরাধ্য বস্তু ও সাধনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বেদে আরাধ্য দেবতার বিভিন্ন নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন নামের সঙ্গে

ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শন সেই সকল নাম একই পরমাত্মার বাচক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বেদে যে সকল দেবতা ও অসুরের নাম এবং কর্ম্ম ও উৎপত্তির কথা অল্প ভাষায় লিখিত হইয়াছে, পুরাণকার সেই সকল দেবতা ও অসুরের পিতা-মাতার পরিচয়, জন্মের হেতু, রূপ, গুণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি পরস্পরের সঙ্গে বেশ সংশ্রব রাখিয়া, বিস্তারিতভাবে ও চমৎকারিতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ লোকদিগকে সুর বা দেবতা ও অবিদ্বান্ লোকদিগকে অসুর বলিয়াছেন (১)। সুতরাং 'দেবাসুরে যুদ্ধ' অর্থ 'তত্ত্বজ্ঞানী সাধু-প্রকৃতি লোকের সহিত দেহাত্ম-বোধ-সর্ব্বস্ব দুর্দ্দান্ত লোকের বিবাদ', আর আধ্যাত্মিক ভাবে ধরিলে 'মনের সুবৃত্তির সহিত কুবৃত্তির সংঘর্ষ'।

পৌরাণিক রূপক বা আখ্যায়িকার বীজ বেদে কি ভাবে নিহিত আছে, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) 'উমা' নামটী কেনোপনিষদে পাওয়া যায়। বিজয়-মদে গর্ব্বিত দেবগণের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম ঐ ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা ছাড়া সেখানে আর কিছু নাই। ইনি সে স্থানে কৈলাসবাসী শিবের স্ত্রী নহেন। গিরিরাজের গৃহে ইঁহার জন্ম, শিবের সহিত বিবাহ বা ইঁহার সন্তানাদি হওয়ার কথা উপনিষদে দৃষ্ট হয় না। "হৈমবতী" নামটীও ঐ কেনোপনিষদে আছে।

(২) 'শিব, নীল-লোহিত, রুদ্র, গিরিশ'—এই সকল নাম উপনিষদে পাওয়া যায়, কিন্তু এ সব নামই সেখানে পরম-দেবতা-বাচক। ঐ সকল নাম ব্যতীত শিবের উৎপত্তি, রূপ, বিবাহ, স্ত্রী-পুত্রাদির কোন কথা উপনিষদে দেখা যায় না।

---

(১) বিদ্বাংসো হি দেবা স্তদ্বিপরীতা অবিদ্বাংসোঽসুরাঃ।

শতপথব্রাহ্মণম্ ।৩।৭।৬।

(৩) মুণ্ডকোপনিষদে দেখা যায়, কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা ইত্যাদি অগ্নির সপ্ত শিখার নাম। ইহা ব্যতীত কালীর সম্বন্ধে উপনিষদে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

(৪) ছান্দোগ্য-উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ খণ্ডে লিখিত আছে, আঙ্গিরস ঘোর নামক ঋষি দেবকীর পুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ-যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন। এই পুরুষ-যজ্ঞ যিনি জানেন তিনি ১১৬ বৎসর জীবিত থাকেন। পুরুষের সমস্ত জীবনটাই একটা যজ্ঞ-স্বরূপ। তাঁহার জীবনের প্রথম ২৪ বৎসর ঐ যজ্ঞের প্রাতঃসবন, তৎপরবর্ত্তী ৪৪ বৎসর মাধ্যাহ্নিক সবন এবং শেষ ৪৮ বৎসর সান্ধ্য সবন বলা যায়। মানব-জীবন বিষয়-সুখ-ভোগের জন্য নয়, উহা ভগবৎকার্য্যে নিবেদিত পদার্থ, উহা ত্যাগের (১) আদর্শ। ভগবানের আদেশ পালনের জন্য জীবনের প্রাতঃকালে এক প্রকারের ত্যাগ, মধ্যাহ্নে অন্য প্রকার ত্যাগ এবং সায়াহ্নে পৃথক্ আর এক প্রকারের ত্যাগ। প্রথম ২৪ বৎসরে কোন মারাত্মক দুঃখ উপস্থিত হইলে পুরুষ এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন, "আমি প্রাণরূপ বসুগণের মধ্যে যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্‌যজ্ঞ, আমি যেন লুপ্ত না হই"; দ্বিতীয় ৪৪ বৎসরে হইলে এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন, "আমি প্রাণরূপ রুদ্রগণের মধ্যে যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্‌-যজ্ঞ, আমি যেন লুপ্ত না হই"; এবং শেষ ৪৮ বৎসরে হইলে এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন, "আমি প্রাণরূপ আদিত্যগণের মধ্যে যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্‌যজ্ঞ, আমি যেন লুপ্ত না হই"; তাহা হইলে তিনি ঐ সকল দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন ও নীরোগ হইবেন। উপনিষদে কৃষ্ণ সম্বন্ধে ইহার বেশী আর কিছু পাওয়া যায় না।

---

(১) যজ্ঞ শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ sacrifice, ত্যাগ।

(৫) কঠোপনিষদে "বামন-দেবের" উল্লেখ আছে। সে স্থানে তিনি জীবদেহস্থ আত্মা, তিনি প্রাণ ও অপানকে পরিচালিত করেন এবং সমস্ত দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার সেবা করেন (তাঁহার জন্য বলি বা উপহার আহরণ করেন)।

ঋগ্বেদের সবিতা-সূক্তে আছে, "বিষ্ণু তিন প্রকারে পদক্ষেপ করেন (১)।" সে স্থানে বিষ্ণু শব্দে সূর্য্য বুঝাইতেছে। নিরুক্তকার যাস্ক এবং বেদ-ভাষ্যকার শাকপুণি দুর্গাচার্য্য ও আচার্য্য সায়নের মতে আদিত্যই (সূর্য্যই) বিষ্ণু। তাঁহার তিন পাদ, যথা—দিক্‌পাদ, কালপাদ ও জ্যোতিঃপাদ। পূর্ব্ব দিক্, ঊর্দ্ধ গগন ও গয়শির (অর্থাৎ পশ্চিম দিক্)—এই তিনটী দিক্ পাদ; প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই তিনটী কাল পাদ; জ্যোতিই অগ্নিরূপে পৃথিবীতে ভূঃ, বিদ্যুৎ-রূপে অন্তরীক্ষে ভুবঃ ও আদিত্যরূপে স্বর্গলোকে স্বঃ—এই তিনটী জ্যোতিঃপাদ। সুতরাং বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য্যদেবের প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনে, মধ্যাহ্নে মধ্য গগনে এবং সায়াহ্নে পশ্চিম গগনে অবস্থানই তিন প্রকার পাদক্ষেপ; আর পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং স্বর্গে আদিত্যরূপে অবস্থিতিও তাঁহার ত্রিপাদক্ষেপ জানিতে হইবে। ইহা ব্যতীত বলিরাজার যজ্ঞে বামনদেব কর্ত্তৃক তপস্যার জন্য তিনপাদ স্থান ভিক্ষা করিয়া লওয়া, স্বর্গ ও মর্ত্ত দুই পদে আবৃত করা এবং তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করা, এরূপ কোন কথা বেদে দেখা যায় না।

সুতরাং ভিত্তি, উৎপত্তি, লক্ষণ, লক্ষ্য প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে যে, পুরাণগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কিছু নাই; কেবল

---

(১) ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নেদধে পদম্
সমূঢ়মস্য পাংশুলে। ঋগ্বেদে সবিতাসূক্তম্।

বর্ণনা-বাহুল্যের জন্য, অথবা সত্যের বিভিন্ন ভাবের দিকে লক্ষ্য থাকায়, কোথায়ও কোথায়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছে, নচেৎ উহাদের সারভাগ একই (১)। বেদে যেমন কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড আছে, পুরাণসমূহেও সেই প্রকার দুই ভাগ আছে; ঐতিহাসিক ঘটনা, রাজ-বংশ, সাধন-পদ্ধতি প্রভৃতির বর্ণনা এবং নৈতিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্বরূপে বিবিধ উপাখ্যান এক অংশ, আর

---

(১) মহাভারতের আদিপর্ব্বে, প্রথম অধ্যায়ে, ব্যাসদেব নিজে যেমন বলিয়াছেন যে, নদ নদী পর্ব্বত দেশ গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির বর্ণনা ও নীতিশাস্ত্র চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের কথাই মহাভারতে আছে, সেইরূপ পুরাণেও সব স্থলে ঠিক পঞ্চ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই, পঞ্চ লক্ষণের বাহিরেও অনেক জিনিস উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে (আবার কোন কোন পুরাণে পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে দুই এক লক্ষণাক্রান্ত বিষয় বাদ পড়িয়া গিয়াছে)। পূর্ব্বে, আজকালকার মত মুদ্রাযন্ত্র না থাকায়, গ্রন্থাদি হস্তে লিখিয়া লইতে হইত, কাজেই উহার প্রচার খুব কম হইত; এবং কোন লোক ইচ্ছা করিলে, প্রতিলিপি প্রস্তুত (copy) করিবার সময়, নিজের অভিপ্রায় মত উহার মধ্যে কিছু যোগ করিয়া বা বাদ দিয়া অনায়াসে লিখিতে পারিতেন। বিশেষতঃ ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে অনেক গ্রন্থের সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল। যেগুলি আংশিক নষ্ট হইয়াছিল, তাহা অন্যের হস্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে গিয়া, কোথায়ও অধিকতর সুন্দর কোথায়ও বা অধিকতর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই সব নানা কারণে কোথায়ও কোথায়ও অপরিহার্য্য অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, পুরাণের যে সব স্থান বেদসম্মত নহে তাহাতে আস্থা স্থাপন না করাই আমাদের উচিত।

উপনিষৎ-সম্মত পরমার্থতত্ত্বের বর্ণনা অপর অংশ। অনেক পুরাণেই কোন না কোন একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া বেদ ও উপনিষদের তত্ত্বগুলি কয়েকটী অধ্যায়ে স্পষ্টভাষায় ও পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়।

তন্ত্রসকলে ধর্ম্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের কথাই বিশেষভাবে লেখা হইয়াছে এবং পুরাণের তত্ত্বই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে; তবে মন্ত্রের বীজ ও দেবতার রূপ প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টাও উহাতে যথেষ্ট আছে। বিশেষতঃ কোন কোন তন্ত্রে (যেমন মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, কুলার্ণব তন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র) পরব্রহ্মের তত্ত্বও পৃথক্ ভাবে উত্তমরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব যে কিছু পার্থক্য তন্ত্রে দেখা যায়, তাহা বাহিরের জিনিস, ভিতরে সামঞ্জস্য আছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:*:—

বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয়।

পুরাণসমূহের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, ইহা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি। এক্ষণে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে কি প্রকারের সামঞ্জস্য আছে তাহাই দেখা যাউক।

হিন্দু-সম্প্রদায়সকলের মধ্যে বাহ্যতঃ অনেক বৈষম্য দেখা যায়, এবং তজ্জন্য ঐ সকল সম্প্রদায়ের কতক কতক লোকের মধ্যে যে বিদ্বেষের আভাস পাওয়া যায়, ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব তাহাদের জানা না থাকা এবং ধর্ম্মগ্রন্থে তাহাদের প্রবেশ না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ, বস্তুতঃ তাহাদের উপাস্য দেবতা যে একই তাহা প্রথম খণ্ডের "পঞ্চোপাসনা" নামক অধ্যায়ে এবং তৃতীয় খণ্ডের "পুরাণ-সমন্বয়" নামক অধ্যায়ে বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে এবং ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলি মানবসকলের একই গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে। একটী বৃক্ষের প্রধান প্রধান শাখাগুলি, যেমন পৃথক্ পৃথক্ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে একই কাণ্ডের উপর অবস্থান করে, একই মূলের রসে জীবন ধারণ করে ও বর্দ্ধিত হয় এবং একই প্রকার ফল প্রসব করে, সেইরূপ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম একই সনাতন ধর্ম্মের বিবিধ শাখা মাত্র। প্রকৃত শান্তিসুখ লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, ভগবানের দিকে মুখ ফিরাইয়া, তাঁহার ভজনায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, তাহা করিলে সাধকের হৃদয়ের কালিমা মুছিয়া যাইবে এবং তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া,

ভগবৎসত্তার অমৃতময় সাগরে অবগাহন করিয়া, আত্মহারা হইয়া যাইবেন, ইহাই সকল ধর্ম্মের মূল নীতি ও উপদেশ (১)। জগতের প্রধান চারিটি ধর্ম্ম লইয়া আমরা এক্ষণে সেই বিষয় আলোচনা করিব।

১। (হিন্দুধর্ম্ম।) অতি প্রাচীনকালে, যখন জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, সেই সময় ভারতের বৈদান্তিক ঋষিসম্প্রদায় মেঘগম্ভীর-নাদে জগৎকে শুনাইয়াছিলেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—"সদ্বস্তু ব্রহ্ম একমাত্র এবং অদ্বিতীয় (২)"। এই বিচিত্রতাময় বাহ্য জগতে শক্তির বহুবিধ বিকাশ দেখিয়া, গভীর গবেষণা ও সমাধিজ জ্ঞানের দ্বারা

---

(১) বিভিন্ন ধর্ম্মে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যে আরাধনা-প্রক্রিয়া আছে, তাহাতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, সকল ধর্ম্মেই সত্য কথা বলা, পরকে পীড়া না দেওয়া, পরহিতৈষণা, দয়া, সহানুভূতি, দান ইত্যাদি পুণ্য-কর্ম্মরূপে এবং মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, পরপীড়া, পরদারগমন ইত্যাদি পাপ-কার্য্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানেও সামঞ্জস্য আছে।

(২) ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর দ্বিতীয় বস্তু কিছু নাই। (ইংরাজিতে ইহাকে Pantheism বলা হয়।) পরিণামবাদ-অনুসারে এক ব্রহ্মই লীলার জন্য, স্বরূপে থাকিয়াই, অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে বিবিধরূপ ও নাম ধারণ করিয়াছেন; কারণই কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়, সুতরাং কারণ ও কার্য্য অভিন্ন; অতএব বিবিধ নাম ও রূপবিশিষ্ট বস্তুও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বিবর্ত্তবাদ-অনুসারে নাম ও রূপ মিথ্যা কল্পনা মাত্র, মায়া বা অজ্ঞানই ব্রহ্মে এই নাম ও রূপের তরঙ্গ তুলিয়াছে। বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে নানারূপ-বিশিষ্ট নানা তরঙ্গ উঠিলেও সেই সকল তরঙ্গ জল ব্যতীত কিছুই নহে; তরঙ্গরূপে উত্থিত হইবার পূর্ব্বেও উহা সমুদ্রের জলরূপেই ছিল, উহা পতনের পরও সমুদ্রের জলরূপেই দৃষ্ট হয়, কেবল মধ্যভাগে বায়ু-

তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, সকল বস্তুর ও সকল শক্তির অন্তরালে একই মহাশক্তি খেলা করিতেছেন, এবং সেই শক্তি যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্ফুরিত হইতেছেন তিনি স্বরূপে এক, লীলায় বহু। কঠিন বিষয়। বহু সাধনা ব্যতীত, দীর্ঘকালের গবেষণা এবং অবশেষে সমাধিজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ ব্যতীত ইহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। হিন্দু স্বরূপ ও লীলা দুইই গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষৎ স্বরূপের বাণী গাহিয়াছেন, পুরাণ ও তন্ত্র লীলার কাহিনী গাহিয়াছেন। কিন্তু, এই লীলা বর্ণনার মধ্য দিয়াও যে সুর বাজিতেছে, তাহার প্রতি যাঁহারা লক্ষ্য করেন, তাঁহারা স্পষ্টই শুনিতে পান যে, সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ধ্বনিই হইতেছে। প্রথম খণ্ডের "পঞ্চোপাসনা" নামক অধ্যায়ে ধ্যান, পূজা প্রভৃতির .বিষয় বলিবার সময় এবং তৃতীয় খণ্ডের "পুরাণ-সমন্বয়" নামক অধ্যায়ে ইহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। হিন্দু জীবাত্মাকে (পরা প্রকৃতিকে) "একমেবাদ্বিতীয়ম্"এর (পরমাত্মার) সহিত মিলিত করিবার জন্য সাধনা করেন, ইহা প্রথম খণ্ডের "যোগ"নামক অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিন্দুর ষড়্-দর্শনের মত বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইলেও তাহাদের লক্ষ্য একই, ইহাও তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। জড়জগৎ পরিবর্ত্তনশীল অতএব তজ্জাত সুখ অস্থায়ী ও দুঃখমিশ্রিত এবং জড় চৈতন্য দ্বারা পরিচালিত, সুতরাং নশ্বর জড় জগৎ নিকৃষ্ট, ইহা প্রতিপাদন করিয়া মানবের মনকে চৈতন্য-সত্তার দিকে আকর্ষণ করাই দর্শনসমূহের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বেদান্ত-

---

প্রভাবে উহা একটা রূপ ধারণ করে ও "তরঙ্গ" এই নামে কথিত হয়, কিন্তু তখনও উহা সমুদ্রের জল ব্যতীত আর কিছুই নহে ; তাহা হইলে স্বরূপে সমুদ্রের জলমাত্রই আছে, কেবল ক্ষণকালের জন্য বায়ু একটা নাম ও রূপের সৃষ্টি করে।

দর্শনের মায়াবাদমূলক ব্যাখ্যা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন যে, জড়জগৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হইলেও উহা স্বপ্নবৎ বা ইন্দ্রজাল-সম্ভূত বস্তুর ন্যায় মিথ্যা, এরূপ বলিয়াছেন। তথাপি লয়যোগ অভ্যাসের উপায় প্রদর্শন জন্য তাহাতে এ কথাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে ক্রমঃপ্রকাশ দ্বারা স্থূল জগৎ আবির্ভূত হয়, এবং স্থূল জগৎ আবার ধ্বংসের দিকে যাইয়া, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, শেষে পরম ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। এক কথায় এই বলা যায় যে, ক্ষুদ্র উপাধি যাহা জীবের নিখিল বন্ধন ও ক্লেশের কারণ, তাহা ত্যাগপূর্ব্বক পরমানন্দময় স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই হিন্দু সাধনার লক্ষ্য।

২। এক্ষণে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বৌদ্ধ-দিগের নাস্তিক বলিয়া একটী অপবাদ আছে। বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মমতের পোষণার্থ বেদের উক্তি প্রমাণ-স্বরূপে উল্লেখ করেন না, সুতরাং তাঁহারা বেদ মানেন না, অতএব তাঁহারা নাস্তিক। তাঁহাদের দ্বিতীয় অপবাদ এই,—"ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের ভজন করা উচিত" এরূপ কথা বৌদ্ধ মতে নাই, এই হেতু বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী, এবং তাঁহাদের সাধনার চরম ফল নির্ব্বাণ লাভ, এ নিমিত্ত তাঁহারা শূন্যবাদী। তাঁহাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ হইতেছে এই যে, বুদ্ধ বলিয়াছেন "আত্মা নশ্বর"। এক্ষণে একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক এই কথাগুলি কতদূর সত্য।

প্রথম কথা হইতেছে বৌদ্ধশাস্ত্রে "ঈশ্বর আছেন" ইহা প্রমাণ করিতে বা "ঈশ্বরের আরাধনা আবশ্যক" ইহা প্রচার করিতে চেষ্টা করা হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে যাহা আছে তাহা দ্বারা যে পরোক্ষ-ভাবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত ও ঈশ্বরের উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

বুদ্ধদেবের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাংসারিক সুখের পরাকাষ্ঠার মধ্যে লালিত-পালিত হইলেও, বাল্যকালেই তাঁহার প্রাণ জরা-মরণময় সংসারের জীবের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। কিসে মানব শান্তি লাভ করিতে পারে, সেই উপায় আবিষ্কারের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে লোকে কেবলমাত্র ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রের অনুশাসন লইয়াই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঐ সকল অনুষ্ঠানের ও অনুশাসন-বাক্যের ভিত্তি, যাহা ধর্ম্মের প্রাণ, তাহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আদৌ ছিল না। বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞাদি করিয়া তাহাতে পশু-হনন ও সোমরস পান, আর পরজীবনে স্বর্গসুখ কামনা এবং ইহজীবনে ভোগৈশ্বর্য্য লাভই তাৎকালিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে যে প্রকৃত শান্তি লাভ হয় না, তাহা তিনি বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। তিনি একদিন প্রশান্তমূর্ত্তি একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, ঐরূপ শান্তিময় জীবন যাপন করিতে প্রলুব্ধ হয়েন। সে জন্য তিনি রাজপ্রাসাদ ও রাজ্য-সুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মোক্ষকামী হইয়া তৎকাল-প্রচলিত উপদেশ গ্রহণ ও কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রাপ্ত উপদেশ বা সাধনার মূলে কোন গোলযোগ আছে মনে করিয়া, সেই বিষয় তিনি বিশেষরূপে অনুধাবন করেন, এবং তাহার ফলে কতকগুলি সত্য অনুভব করায় তাঁহার শান্তি লাভ হইয়াছিল। তখন তিনি সেই শান্তির বাণী ও সত্যের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব, ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবকে প্রকৃত শান্তির পথ দেখাইবার উদ্দেশ্যে, বিষয়সুখ লাভের কামনায় অনুষ্ঠিত কদাচারপূর্ণ যজ্ঞাদির অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, এবং তাহার স্থানে জীবরূপী শিবের

প্রেমপূর্ণ সেবা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বৈষ্ণব কবি গীতগোবিন্দে গাহিয়াছেন:—"হে কেশব, তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলে। বৈদিক যজ্ঞে পশু হনন দেখিয়া তোমার করুণাপূর্ণ হৃদয় জীবের দুঃখে গলিয়া গিয়াছিল। সেই জন্য তুমি বেদবিহিত যজ্ঞ-বিধির নিন্দা করিয়াছিলে (১)।" "অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম" এই উপদেশ নবীন সুরে, নব উদ্দীপনার নব রাগে রঞ্জিত করিয়া, সর্ব্বসাধারণের বোধের সুবিধার জন্য প্রচলিত ভাষায় প্রচার করায়, এবং সহস্র সহস্র মানবের জীবনে উহা প্রতি-ফলিত করায়, তিনি হিন্দুজগতে অবতার বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। জগতের সকল প্রাণীর মধ্যেই আত্মা-রূপে এক ভগবান্‌ই বাস করিতে-ছেন, সুতরাং কাহারও প্রতি হিংসা করিলে ভগবান্‌কেই হিংসা করা হয়। ইহাতে মানবের আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায় এবং সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের বীজই বপন করা হয়,—ইহা ব্যতীত তাঁহার ঐ উপদেশের মূলভিত্তি আর কি হইতে পারে?

ভারতের ধর্ম্ম বেদমূলক, কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁহার মত স্থাপনের নিমিত্ত বেদকে কোন স্থলে প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করেন নাই, বরং পশু-হিংসাদি-সমন্বিত বৈদিক যজ্ঞের নিন্দাই করিয়াছেন। জাতিভেদ-প্রথার অনুচিত পীড়নে পদদলিত মনুষ্যদিগের দুঃখে কাতর হইয়া, তিনি ঐ প্রথার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং নিজধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐ বৈষম্য থাকিতে দেন নাই। এই সব নানা কারণে, তাঁহার উদ্দেশ্য

---

(১) নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে॥ গীতগোবিন্দম্।

যতই ভাল হউক না কেন, তাঁহার কার্য্য যতই নির্দ্দোষ হউক না কেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কতকগুলি হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক কেবল তাঁহার মতের যেখানে যেখানে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা ধরিতে পারিয়াছিলেন, শুধু সেইটীকে প্রমাণ করিয়া লোকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্যগ্‌দর্শী ব্যক্তিগণ, তাঁহার গুণের আদর করিয়া ও তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিয়া, তাঁহাকে হিন্দুজগতে একজন অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ বুদ্ধদেব ধর্ম্মপদ জরাবগ্‌গে বলিয়াছেন, "দেহরূপ গৃহের নির্ম্মাণকর্ত্তাকে অন্বেষণ করিতে করিতে, তাঁহাকে না পাইয়া, কতবার জন্ম গ্রহণ করিলাম, কত সংসারই ঘুরিলাম! পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করা কি কষ্টের বিষয়! হে গৃহের নির্ম্মাণকর্ত্তা, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর দেহরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, তোমার সকল কাষ্ঠদণ্ড নষ্ট হইয়াছে, গৃহের অবলম্বন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণগত আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণার অবসান হইয়াছে (১)।"

এখন দেখিতে হইবে, এ অবস্থায়ও বুদ্ধদেব কেন "ঈশ্বর আছেন" প্রভৃতি কথা বলেন নাই। তিনি আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-দমন, বাসনা-বিসর্জ্জন, ন্যায়, সত্য, ক্ষমা, দয়া, অহিংসা এবং বিশ্বব্যাপী মৈত্রী-গুণে

---

(১) অনেক জাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনং॥
গহকারক, দিঠে ঠাহসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকুটং বিসঙ্খিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তনহানং খয়মজ্‌ঝগা॥

ধর্ম্মপদ জরাবগ্‌গ।

আত্মোন্নতি করিতে বলিয়াছেন, অষ্টাঙ্গিক পথ (১) অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনা দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে বলিয়াছেন, অথচ বেদ-বাক্যসকল প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করেন নাই কেন? এই উপায়গুলি ত বেদসম্মত, এবং বেদ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গ্রন্থ। "ত্রিবিদ্যা সূত্রে" ব্রাহ্মণ-যুবকদ্বয়ের প্রতি বুদ্ধের যে উপদেশ আছে, তাহাতে ব্রহ্মলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সব অবস্থায়ও বুদ্ধদেব ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা বেদ এ সকলের উল্লেখ করেন নাই, ইহার কারণ এই বলিয়া অনুমান হয় যে, যদি ঐ সমস্তের কথা উল্লেখ করেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার ভাবের বিশেষত্ব বুঝিবে না ও গ্রহণ করিবে না, এবং তিনি প্রচলিত ধর্ম্মই প্রচার করিতেছেন মনে করিয়া, তাহারা পূর্ব্ববৎ বাহ্য আড়ম্বরেই মোহিত হইয়া থাকিবে ও অধঃপতিত হইতে থাকিবে। এই জন্য ভ্রষ্ট নীতি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বরের নামে মদ্যপান পশুবধ প্রভৃতি করা অন্যায় তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে, ও তাঁহার প্রচারিত পন্থাটী নূতন এবং শ্রেষ্ঠ এই ভাব দেখাইয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ কবিবার জন্য, তিনি পুরাপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের পন্থা হইতে একটু পৃথক্ রকমের ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহাকে নাস্তিক বলা ঠিক নহে।

তাহার পর, নির্ব্বাণের কথা বলায় বুদ্ধদেব "শূন্যবাদী" হইয়া গিয়াছেন। তিনি যে অবস্থাকে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি বলিয়াছেন, আচার্য্য শঙ্কর, ধ্যাতা ধ্যেয় ও ধ্যান এই ত্রিপুটী নাশে নির্গুণ ব্রহ্মে লয় হওয়া দ্বারা, সেই অবস্থাকেই বুঝাইয়াছেন। সর্ব্ব প্রকার উপাধি বাদ দিয়া শঙ্কর যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাঁহাকে শূন্যই বল আর ব্রহ্মই বল

(১) ইহার বিষয় পরে বলা হইবে।

তাহাতে কি আসে যায় (১)? যে কোন নামই দাও না কেন, যেটী যে বস্তু আছে সেটী সে বস্তু ছাড়া আর কিছুই হইবে না। তোমার যে নামে তৃপ্তি বোধ হয় সেই নাম দাও তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সেই অবস্থাটী যে পরম শান্তিপ্রদ এ কথা বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন, শঙ্করও বলিয়াছেন। আর এক কথা, যদি একটা শান্তিময় অবস্থাই লাভ না হয়, তবে তাহার জন্য বৌদ্ধগণ সাধনা করেন কেন? বৌদ্ধমতেও সাধনা আছে, ধ্যান আছে, সমাধি আছে। এ সবের লক্ষ্য কি? একটা কিছু অবশ্যই আছে। যদি বল "শূন্য", সেটা "কিছু" না, তবে তাহা বাতুলের প্রলাপ। বুদ্ধদেব আপনাকে "তথাগত" বলিতেন, অর্থাৎ তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন এই কথা বলিতেন। "নির্ব্বাণ-লাভ" অর্থ যদি "কিছু না" হইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় তিনি "কিছু না" হইয়া গিয়াছিলেন। তবে তিনি নরদেহে থাকিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলেন কেমন করিয়া? বস্তুতঃ রাগ দ্বেষ ও মোহের নাশ হওয়ায় দেহাভিমানের নাশ হওয়াকেই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ (২) বলিতেন। তৃষ্ণার সম্যক্ রূপে নিবৃত্তি হওয়ার নাম নির্ব্বাণ (৩)। সংসারের সহিত নিজের সম্বন্ধ রাখিবার জন্য যে প্রবল ইচ্ছা তাহার নাম তৃষ্ণা; সেই তৃষ্ণার নাশ হইলে সংসারের নাশ হয়। ইহারই

---

(১) অপনীতেষু মূর্ত্তেষু হ্যমূর্ত্তং শিষ্যতে বিয়ৎ।
শক্যেষু বাধিতেষন্তে শিষ্যতে যৎ তদেব তৎ॥
সর্ব্ববাধেন কিঞ্চিচ্চেৎ যন্ন কিঞ্চিৎ তদেব তৎ।
ভাবা এবাত্র ভিদ্যন্তে নির্বাধং তাবদস্তি হি॥
পঞ্চদশী। ।৩।৩০-৩১।

(২) রাগদ্বেষমোহক্ষয়াৎ পরিনির্ব্বাণম্। রত্নকূটসূত্রম্।

(৩) তৃষ্ণায়া বিপ্রহানেন নির্ব্বাণমিতি কথ্যতে। রত্নমেঘম্।

নাম নির্ব্বাণ। এই অবস্থা লাভ হইলে, দেহনাশের পর পুনরাবর্ত্তন হয় না বা পুনর্জন্ম হয় না। হিন্দুধর্ম্মেও বিচারের ও সমাধিজ জ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ নিরুপাধি অবস্থা লাভ বা ব্রাহ্মী স্থিতিই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অবস্থা।

এক্ষণে, তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, কর্ম্ম-অনুসারে জীবাত্মা উচ্চ বা নীচ যোনিতে ভ্রমণ করে এবং নানাবিধ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে; এই জন্যই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন "অনিত্য দুঃখ আত্মন্" অর্থাৎ আত্মা দুঃখময় ও অনিত্য। বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম্মবাদ-প্রধান। কর্ম্মই জীবের উচ্চ বা নীচ যোনিতে ভ্রমণের কারণ এবং পবিত্র কর্ম্ম দ্বারাই জীবের মুক্তিলাভ হয়, এ বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সহিত একমত। হিন্দুধর্ম্মে (এবং খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মেও) এ কথা আছে সত্য যে, ভগবান্‌কে ভক্তি করিলে মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু তাহাতে কর্ম্মের প্রাধান্য অস্বীকৃত হয় নাই। দুষ্কার্য্যে আসক্ত লোক ভগবানের দিকে মন দিতেই পারে না; আর যখন সে ভগবানে মন দেয় তখন সে দুষ্কর্ম্ম ত্যাগ করিতে থাকে, এবং এইরূপে তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তবে ভগবান্ তাহাকে কৃপা করেন। ভগবদ্ভক্তি ও কর্ম্ম এইরূপে গাঁথা আছে। জগতে জড় বস্তু মাত্রেই নিয়ত পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইতেছে কিন্তু একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, ইহা জড়বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য। তথাপি উহা বিনশ্বর ও অনিত্য এরূপ বলা হয়। কর্ম্মানুসারে জীবাত্মার বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তি হয় দেখিয়াই বুদ্ধদেব উহাকে অনিত্য বলিয়াছেন, নচেৎ আত্মা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় এরূপ বলা তাঁহার অভিপ্রায় হইলে, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া আত্মা শেষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাঁহার এই নীতিমূলক সাধনার কোন মূল্যই থাকে না। অতএব, আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহা বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় ইহাই তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য।

এইরূপে প্রমাণিত হইল যে, বুদ্ধদেব প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক নিরীশ্বরবাদী বা বেদবিরোধী ছিলেন না।

হিন্দুশাস্ত্রে যেমন উক্ত আছে যে, অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, ভগবান্ বুদ্ধের মতেও সেই প্রকার অষ্টাঙ্গিক পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেই মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়।

বুদ্ধদেব সিদ্ধি লাভ করার পর ধর্ম্ম প্রচারার্থ কাশীধামে গমন করিলে যে পাঁচ জন শিষ্য তাঁহাকে পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহারা, তাঁহার সুন্দর গম্ভীর মূর্ত্তি ও অপূর্ব্ব প্রশান্ত ভাব দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত আদর সহকারে গ্রহণ করিল, কিন্তু পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া কেহ তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল, কেহ তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিল। তিনি তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, আমাকে সখা বলিয়াও সম্বোধন করিও না। 'তথাগত' এখন সম্বুদ্ধ হইয়াছেন, এবং দিব্য জ্ঞান লাভে তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আমার উপদেশ শুন। মনুষ্যেরা মোহবশতঃ হয় বিষয়-লালসা ও ভোগাসক্তিতে ডুবিয়া যায়, না হয় অনর্থক কঠোর তপস্যায় শরীর শোষণ করে। আমি মধ্য পথ আবিষ্কার করিয়াছি (১); আমার আবিষ্কৃত অষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিলে, তোমাদের ক্লেশ সমূলে উৎপাটিত হইবে, এবং তোমরা পরম শান্তি ও নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারিবে।"

---

(১) হিন্দুশাস্ত্র ভগবদ্গীতায়ও ঠিক এইরূপ কথাই আছে :—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৬।১৬-১৭।

তাঁহার কথায় সেই শিষ্যেরা মনোনিবেশ করিলে, বুদ্ধদেব যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহাই বৌদ্ধশাস্ত্রে "ধর্ম্ম-চক্র" নামে অভিহিত হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত চারিটী গভীর তত্ত্ব আছে :—

(১) সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। জরা, মরণ, জন্ম, প্রিয় বস্তুর বিয়োগ, অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ, সবই দুঃখময়।

(২) বিষয়-তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ।

(৩) এই বিষয়-তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত করাতেই দুঃখ-নিবৃত্তি।

(৪) দুঃখ-নিবৃত্তির অষ্টাঙ্গিক পথ আছে, সেই পথ অবলম্বন করিলেই শান্তি লাভ হয়।

সেই অষ্টাঙ্গিক পথ যথা :—

(১) সম্যক্ দৃষ্টি।

(২) সম্যক্ সঙ্কল্প (সঙ্কল্প ঠিক রাখা)।

(৩) সম্যক্ বাক্য (সত্য, সরল ও প্রিয় বাক্য বলা)।

(৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত (সদাচরণ)।

(৫) সম্যক্ আজীব (সর্ব্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধু জীবিকা অবলম্বন)।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম (আত্মসংযম প্রভৃতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ-সাধন)

(৭) সম্যক্ স্মৃতি (ধারণা ঠিক রাখা)।

(৮) সম্যক্ সমাধি (জীবনের সুগভীর তত্ত্বসকলের ধ্যান, মনন ও নিদিধ্যাসন)।

এই পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে ক্রমে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, বিচিকিৎসা প্রভৃতি যে কয়েকটি সংযোজন অর্থাৎ বন্ধন আছে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, এবং সাধক মোক্ষ লাভ করেন। হিন্দুমতেও দুঃখের কারণ ও মুক্তির সাধনা প্রায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারই কি নয়? এইরূপ করিলে জীবভাব নষ্ট

হয় ও জীব ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ইহাই প্রকৃতি (১) পুরুষের মিলন, ইহাই বিষয়জাত দুঃখের চির নিবৃত্তি বা বিষয়জাত সুখভোগের লালসায় চঞ্চল যে প্রাণ তাহার নিত্য-স্থির-শান্ত অবস্থা লাভ।

৩। (খ্রীষ্টানধর্ম্ম।) অতি পূর্ব্বকালে বাণিজ্য-উপলক্ষে গ্রীস, মিসর ও আরবের সহিত ভারতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। এই কারণে আর্য্যদেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি ঐ সব দেশে প্রাচীন সময়ে প্রচলিত ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সম্রাট্ অশোকের আদেশসমূহে (Edicts য়ে) প্রকাশ যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, সাইরিন্ এবং ইপাইরস্ নামক পঞ্চ যবন-রাজ্যে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। মোজেস্ (Moses) মিশর হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া আসিয়া তাহাই আরবে প্রচার করেন, ইহা মোজেসের লিখিত গ্রন্থ (পুরাতন বাইবেলের—Old Testamentয়ের—প্রথম ভাগ) হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। মোজেসের গ্রন্থে লিখিত "দশ আজ্ঞা" (Ten commandments) মিশরধর্ম্মের ৪২টী অনুশাসনের সংক্ষেপ মাত্র। তিনি মিশরধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরগুলি বাদ দিয়া, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যে ভাবগুলি আবশ্যক, তাহাই মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতীয় ধর্ম্মের সহিত যে খ্রীষ্টানধর্ম্মের সংশ্রব আছে এ কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

এই ধর্ম্মের একজন প্রধান প্রচারক জন (John)। জন সন্ন্যাসী

---

(১) ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৭।৪-৫।

ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সার তত্ত্বগুলি তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল, কারণ তৎকালে সিরিয়াদেশে বৌদ্ধ প্রচারকগণ তাঁহাদের মত ঐ দেশবাসীদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেছিলেন। সেই জনের মন্ত্রশিষ্য মহাত্মা যিশু। মহাত্মা যিশু পূর্ব্ব প্রচলিত ইহুদিধর্ম্মে নবীন প্রাণের সঞ্চার করেন (১), ইহা ভিন্ন তিনি কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই (২)। চিত্ত শুদ্ধ হইলে যে সকল উদার ভাব মানবের চরিত্রে প্রকাশ পায় সেই গুলিই ইহুদিধর্ম্মে শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং যিশুও তাহাই উপদেশ দিতেন। চেষ্টা করিয়া ঐ সকল উদার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিলে এবং ঐ উদার ভাবের কার্য্যগুলি বাহিরে অনুষ্ঠান করিলে

---

(১) Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth :

But I say unto you, that ye resist not evil : but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. Mathew, Chap. V, verses 38 & 39.

Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.

Bus I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you.

That ye may be the children of your Father which is in heaven : for He maketh His son to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Mathew, Chap. V, verses 43-45.

(২) Think not that I am come to destroy the law, or the prophets, I am not come to destroy, but to fulfil.

Muthew, Chap. V, verse 17.

চিত্ত ক্রমে বিশুদ্ধ হইয়া স্থির ও শান্ত ভাব অবলম্বন করিবে, ইহাই বোধ হয় ঐ প্রকার শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্নিহিত ভাব। নচেৎ কি প্রকারে ইন্দ্রিয় সংযম ও মন স্থির করিতে হয়, সেই সাধনবিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ এই ধর্ম্মে বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধর্ম্মের উচ্চ স্তরের কথা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, ভগবৎসাক্ষাৎকার (realisation of God) প্রভৃতির কথা খ্রীষ্টানগণের ধর্ম্মগ্রন্থে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। মোজেস্ ভগবানের আদেশ শুনিতেন এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎও হইত, এরূপ কথা মোজেসের গ্রন্থে পাওয়া যায় (১)। জনলিখিত সুসমাচারে আছে, ভগবান্ চৈতন্যস্বরূপ, ভগবান্‌কে পূজা করিতে হইলে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে ও চৈতন্যে

---

(১) And when the Lord saw he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said here am I.

And he said, Draw not nigh hither : put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.

Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jakob. And Moses hid his face : for he was afraid to look upon God. Exodus, Chap. III, varses 4-6.

And God said unto Moses, I am that I am : and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you.

Exodus, Chap. III, verse 14.

(ইহা জ্যোতিঃদর্শন ও দৈববাণী-শ্রবণ বলিয়া মনে হয়।)

অর্থাৎ আত্মায় তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে (১)। প্রভু যিশু বলিতেন, ভগবান্‌কে পাইতে হইলে মানবকে ভগবানের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে (২)। তিনি সময়ে সময়ে এরূপ কথাও বলিতেন যে, তিনি ও ভগবান্ এক (৩)। কিন্তু এই সব কথা তিনি বড় প্রচার করিতেন না, কারণ যে স্থানে তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইয়াছিল সে স্থানে ইহা বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার লোক তখন্ ছিল না বলিলেই হয়। নিতান্ত অশিক্ষিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না এমন লোকদের মধ্যেই তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইয়াছিল, কাজেই তিনি আকার-ইঙ্গিতে কোন কোন সময় ভগবৎসামীপ্য বা ভগবদ্দর্শনের কথা বলিলেও সে দিকে তেমন ঝোঁক দিতে পারেন নাই। তিনি ভগবানের প্রেমে মত্ত হইয়া এরূপ কথাও বলিয়াছেন যে, তিনি যাহা করিতেন তাহা সম্পূর্ণ ভগবানের কার্য্য ও তাহা ভগবানের শক্তিতেই নিষ্পন্ন হইত, এবং তিনি যাহা বলিতেন তাহা তাঁহার কথা নহে, তাহা

---

(১) God is a spirit : and they that worship Him must worship Him in spirit and truth.

Saint John, Chap. IV, verse 24.

(২) Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Mathew. Chap. V, verse 48.

(৩) I and my Father are one....But if I do, though ye believe me not, believe the works : that you may know, and believe, that the Father is in me and I am in Him. Saint John, Chap. X, verses 30 & 38.

বেদেও ঐরূপ কথাই আছে—"অহং ব্রহ্মাস্মি"।

ভগবানেরই কথা (১)। ভগবৎসত্তায় নিজ সত্তা ডুবাইতে না পারিলে এরূপ হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার পন্থাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার সেই উচ্চতম ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার উপদেশের বাহ্য ভাবেই ডুবিয়া আছেন। তিনি যদি দীর্ঘ-দিন ইহ জগতে থাকিতেন, তবে তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণ যতই শিক্ষিত ও উপযুক্ত হইয়া উঠিত, ততই অধিক পরিমাণে তিনি তাঁহার অন্তরের উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী তাহাদের নিকট প্রচার করিতেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে, ইহুদিদিগের ষড়যন্ত্রে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার পরে তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত কোন মহাপুরুষ, তাঁহার উপদেশের গুহ্য রহস্য ও সেই রহস্য ধারণা করিবার উপযুক্ত সাধনা, প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় না।

বস্তুতঃ, প্রভু যিশুর জীবনে যাহা দেখা যায়, তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি আত্মসত্তা ভগবৎসত্তায় ডুবাইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের বা জীব ও পরমের মিলন নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতেন।

---

(১) Then answered Jesus and said unto them: verily, verily, I say unto you, the son can do nothing of himself, but what he doeth the Father doeth: for what thingsoever he doeth these also doeth the son likewise.

Saint John, Ch. V, verse 19.

And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.

Then said they unto him, where is thy Father? Jesus answered, ye neither know me, nor my Father: if you had known me you should have known my Father also. Saint John, Chap. VIII, verses 16-19,

তিনি ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী সাধকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

খ্রীষ্টানগণের মত এই যে, প্রভু যিশু নিজ রক্তে জগতের পাপীদের পাপ ধৌত করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার ক্রূশে বিদ্ধ হইয়া জীবন ত্যাগ করাটা মানবের পরম কল্যাণের জন্য আত্মবলিদান। যিনি তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন তিনি পরিত্রাণ পাইবেন অর্থাৎ মুক্ত হইবেন। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, প্রভু যিশু ভগবানের পুত্র, অর্থাৎ তিনি পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা, তিনি স্বরূপতঃ ভগবান্ (God the father) হইতে ভিন্ন নহেন। যে সাধক তাঁহাতে (অর্থাৎ হৃদ্গত প্রত্যগাত্মায়) নিয়ত মন প্রাণ নিয়োজিত রাখিবেন, তাঁহার উপাধি ক্রমশঃ নাশ হওয়ায় তিনি ভগবান্‌কে লাভ করিবেন অর্থাৎ পরম ভাব প্রাপ্ত হইবেন। হৃদ্গত প্রত্যগাত্মার ভজনা দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা হিন্দুধর্ম্মেরও মত।

বাইবেলে (১) বর্ণিত য়্যাডাম্ ও ইভের বৃত্তান্তে দেখা যায় যে, তাহাতে দ্বিবিধ জ্ঞানের কথা আছে, ইন্দ্রিয়জাত বা মায়িক জ্ঞান এবং পরম বা অধ্যাত্ম জ্ঞান। য়্যাডাম্ ও ইভ্ পরম জ্ঞান লইয়াই জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা ভেদজ্ঞানরহিত হইয়া কেবল স্বর্গীয় বিমল আনন্দই উপভোগ করিতেন, কিন্তু মায়িক জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদন করায় যেই মায়িক জ্ঞান আসিল অমনি তাঁহাদের মনে ভেদজ্ঞান জন্মিল। এই ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায়, ইভ্ লজ্জা-রূপ বস্ত্র গ্রহণ করিয়া নিজের

(১) হিন্দুদের ধর্ম্মগ্রন্থ চতুর্ব্বেদ যেমন বিভিন্ন ঋষি দ্বারা অনুভূত সত্যের সংগ্রহ, খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলও সেই প্রকার বিভিন্ন মহাপুরুষের অনুভূত সত্যের সংগ্রহ।

নগ্নতা আবৃত করিলেন। মোজেসের ধর্ম্মে পরম জ্ঞানকে (innocence) দোষশূন্যতা বলা হইয়াছে। বাস্তবিক ভেদজ্ঞানরহিত পরম জ্ঞানীকে জ্ঞানশূন্য মূঢ় বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত শুকদেবের বৃত্তান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে মোজেস-বর্ণিত স্বর্গের (paradiseয়ের) বিষয় বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। যুবক শুকদেবকে দেখিয়াও যে সকল স্ত্রীলোক উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করিতেছিলেন তাঁহারা কোনরূপ লজ্জা বোধ করেন নাই, তাঁহারাই কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাসদেবকে দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, শুকদেব ভেদজ্ঞানরহিত পরম জ্ঞানী ছিলেন আর ব্যাসদেবের ভেদবুদ্ধি কিছু ছিল।

মানবের ভেদবুদ্ধি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাহার অহংজ্ঞান থাকে, ততক্ষণই তাহার জীবত্ব। এই অহংজ্ঞান ঘুচিয়া গেলে মানুষ ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, এইভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন বা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয়। ইহাই সাধনার চরম ফল। অহংজ্ঞান আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভেদজ্ঞান আসে এবং ব্রহ্মভাব ছুটিয়া যায়। মায়িক জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে য়্যাডাম্ ও ইভের অহংজ্ঞান ও ভেদজ্ঞান আসিয়াছিল। ইহাই য়্যাডাম্ ও ইভের পতন বলিয়া বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে। সেই জন্য প্রভু যিশু দেখাইয়াছিলেন যে, ভগবানের সত্তায় আত্মসত্তা ডুবাইয়া দিলে অহংজ্ঞানের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় ও ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়া যায়। ইহাই ত পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন।

ভক্তগণ ভগবানের সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা শক্তি-উপাসক তাঁহারা যেমন ভগবান্‌কে মাতৃভাবে ভজনা করেন, মহাত্মা যিশুও সেইরূপ ভগবান্‌কে পিতৃভাবে ভজনা করিতেন।

৪। অবশেষে মুসলমানধর্ম্ম সম্বন্ধে দেখা যাউক। মুসলমানগণের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম কোরাণ। "কোরাণ" শব্দ "করয়্" ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং ইহার অর্থ "সংগ্রহ"। অতএব ঐ ধর্ম্মগ্রন্থের নাম হইতে ইহাই মনে হয় যে, বেদ ও বাইবেল যেমন সংগ্রহ সেইরূপ উহাও সংগ্রহ। খ্রীষ্টানধর্ম্মের সঙ্গে মুসলমানধর্ম্মের বিশেষ সংশ্রব আছে। খ্রীষ্টানদের মতে য়্যাডাম্ ও ইভ্ মানবজাতির আদি জনক-জননী, এবং মুসলমানদের মতে আদম্ ও হাওয়া আদি মানবদম্পতী। উভয় ধর্ম্মের শাস্ত্রে অনেক নাম প্রায় একই প্রকার উচ্চারিত হয়, যথা :--যোসেফ্--উসুফ্, মেরী--মরিয়ম্, জ্যাকব্--ইয়াকুব্, স্যাটান্—সয়তান্, ডেভিড্--দাউদ্ ইত্যাদি।

জীব ও পরমের মিলনরূপ মহাসাধনার কথা এ ধর্ম্মেও আছে। কোরাণশরিফের প্রথম সুরায় একটী আয়াত বা বচন আছে (১) তাহার বঙ্গানুবাদ এই—"পরম দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি"। এই আয়াতের টীকায় মৌলানা সাহ্ আবদুল্ আজিজ্ সাহেব বলিয়াছেন,—'নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, তওরাত্, জবুর্, ইঞ্জিল্ (Bible) প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থসকলের সমস্ত ভাব কোরাণমুজিদে সন্নিবেশিত হইয়াছে; কোরাণের সমস্ত অভিপ্রায় ফাতেহা সুরায় সুস্পষ্ট বিবৃত আছে, ফাতেহা সুরার সমস্ত মর্ম্ম "বেছ্ মেল্লা"র মধ্যে নিহিত আছে, এবং "বেছ্মেল্লা"র সমস্ত তাৎপর্য্য "বেছ মেল্লা"র "বে" অক্ষরে বিরাজ করিতেছে।

আরবি ব্যাকরণ-অনুসারে কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তুর মিলন হওয়াই "বে" অক্ষরে বুঝায়। এখানে খোদাতাল্লার সহিত মিলিয়া যাওয়াই "বে" অক্ষরে বুঝাইতেছে। খোদাতাল্লার সঙ্গে সম্মিলনই সমস্ত বিদ্যা ও জীবনের শেষ ফল এবং জ্ঞানের চরম সীমা।'

---

(১) বেছ্মেল্লা হের্‌রহমা নের্‌রহিম্। কোরাণশরিফ্। প্রথম সুরা।

কোরাণশরিফের শেষ খণ্ড এখ্‌লাছ্‌ সুরায় ভগবানের তত্ত্ব এইরূপ বর্ণিত আছে :—তুমি বল তিনি (আল্লা) অদ্বিতীয় (১)। আল্লা (কাহারও) মুখাপেক্ষী নহেন (২)। না জন্মিয়াছে, না জন্মিবে (আল্লা অনাদি, অনন্ত, তিনি সনাতন বস্তু) (৩)। এবং তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই (৪)। এবং যাহা কিছু আস্‌মানে ও জগতে আছে সমস্তই খোদাতাল্লার জন্য নির্দ্দিষ্ট, এবং খোদাতাল্লা প্রত্যেক বস্তু বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী) (৫)।

কি করিয়া ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধেও সাধনপদ্ধতি এই ধর্ম্মের চারিটী স্তরে দেওয়া আছে। শরিয়ৎ, তরিকৎ, হকিকৎ ও মারফৎ এই চারিটি স্তর (৬) পর পর আছে। রোজা, নামাজ, হজ্জ ও জাকাৎ শরিয়ৎ স্তরের কার্য্য। ইহা নিম্নস্তরের অর্থাৎ বিধিমার্গের সাধনা। চিত্তশুদ্ধির জন্য এই সব করিতে হয়। দ্বিতীয় স্তর তরিকৎ। ইহাতে হজরৎ মহম্মদ যে ভাবের আচার-ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দ্বারা পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিতেন, এবং যে ভাবে ভগবানের

---

(১) কুল্‌হো আল্লা হো আহাদ্‌। কোরাণ। এখ্‌লাছ্‌ সুরা। ১ আয়াত।

(২) আল্লা হোছ্‌ ছামাদ্‌। কোরাণ। এখলাছ্‌ সুরা। ২ আয়াত।

(৩) লাম্‌ ইয়ালেদ্‌ ওয়ালাম্‌ হউলাদ্‌। কোরাণ। এখলাছ্‌ সুরা। ৩ আয়াত।

(৪) ওয়ালাম্‌ ইয়াকুল্লাহু কফুওয়ান্‌ আহাদ্‌। কোরাণ। এখলাছ্‌ সুরা। ৪ আয়াত।

(৫) ওয়ালীল্লাহে মাফিছ্‌ ছামাওয়াতে ওয়া মাফিল্‌ আরুজে ওয়াকান্নাল্লাহো বেকুল্লে শাইয়েম্মোহিতা। নেসা সুরা। ১২৬ আয়াত।

(৬) হিন্দুধর্ম্মেও স্থূল, প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ—চারিটী স্তর আছে।

উপাসনা করিতেন, তাহারই অনুকরণে কার্য্য ও উপাসনা করিতে হয়। তাঁহার চরিত্রের অনুকরণ করায় চিত্ত সম্পূর্ণ ভগবন্মুখীন হয়। তৎপর তৃতীয় স্তর হকিকৎ। ইহার সাধনা হক্ কথা কহা, হক্ আচরণ করা ও হকের দিকে মন-প্রাণ নিয়োজিত রাখা। ইহা সত্যের সাধনা। এক ভগবান্ই সত্য বস্তু। সমস্ত কার্য্যে তাঁহার স্মৃতিই জাগরূক রাখিতে হয়। এইরূপ করায়, যখন ভগবান্ কি বস্তু সে বিষয়ে বেশ ধারণা জন্মে, তখন সাধক মারফৎ নামক চতুর্থ স্তরে আরোহণ করেন। তখন সাধক দেখেন "আল্লা (অর্থাৎ ভগবান্) প্রত্যেক বস্তু বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন" (নেসা সুরা, ১২৬ আয়াত)। তখন ভগবান্‌কে অন্বেষণ করিতে দূরে যাইতে হয় না; সাধনা দ্বারা আপনার মধ্যেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাধক কৃতার্থ হয়েন। তাঁহার জীবভাব দূরীভূত হয়, পরমাত্মায় তাঁহার নিজ সত্তা ডুবিয়া যায়। তখন তাঁহার শাশ্বত শান্তি ও বিমল আনন্দ লাভ হয়।

মারফৎ স্তরের সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা মন্সুর বলিতেন, "আমিই খোদা, আমিই আল্লা" (১)। এই মহাপুরুষের উচ্চ ভাব সাধারণ মানুষ বুঝিতে পারিয়াছিল না।

মুসলমানদের মতে পয়গম্বর মহম্মদ খোদার দোস্ত অর্থাৎ সখা ছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ ভাবের সাধনা আছে, সেইরূপ পয়গম্বর সাহেব ভগবান্‌কে সখারূপে জানিয়া ভজনা করিতেন। ইহা সখ্যভাবের ভজন।

যেমন বেদান্তের উপদেশে হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য বুঝা যায়, তেমনি মুসলমানগণের সুফিসম্প্রদায়ের উপদেশে মুসলমানধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য

---

(১) "আনাল্ হক্"। "ম্যায়্ খোদা হুঁ।" বেদেও আছে, "সোঽহং।"

জানিতে পারা যায়। সুফিশ্রেষ্ঠ সাম্‌ছে তেব্‌রিজের একটী কবিতার বঙ্গানুবাদ এই স্থানে দেওয়া গেল। ইহার ভাব অনেকাংশে আচার্য্য শঙ্করের "আত্মষট্‌কের" ভাবের ন্যায়।

"হে মুসলমান, উপায় কি? আমাকে আমি চিনি না। আমি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা ইহুদি না (১)। আমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, জল ও স্থল কোথায়ও না। আমি ইরাকেরও না, খোরাসানেরও না (২)। আমি অগ্নিও না, জলও না, বায়ুও না, মৃত্তিকাও না। আমি আদম্‌ও না, হাওয়াও না, ফেরদৌস্‌-ভেস্তের বাগানও না (৩)। আমার "মাকান্‌ লা মাকান্‌" অর্থাৎ আমার যে যায়গা তাহার উপর কোন যায়গা নাই, আমি নিরাকার। আমার শরীরও নাই, প্রাণও নাই,

---

(১) চেতদ্‌বির আয়মছল্‌ মানান্‌
কেমান্‌ খোদ্‌রা নামিদানাম্‌।
নাতরছাঁও ইহুদিয়াম্‌
নাগাব্‌রাম্‌ না মুসল্‌মানান্‌॥

(২) নাশের্‌ কিয়াম্‌ নাগাব্‌রিয়াম্‌
নাবাহ্‌রিয়াম্‌ না বার্‌রিয়াম্‌।
না আজ্‌মল্‌কে ইরাকিয়াম্‌
না আজ্‌খাকে খোরাছালাম্‌॥

(৩) না আজখাকাম্‌ না আজ্‌আবাম্‌
না আজ্‌বাদাম্‌ না আজ্‌ আতাসাম্‌।
না আজ্‌আদম্‌ না আজ্‌হাওয়াঁ
না আজ্‌ ফের্‌দৌসে রেজ্‌ওয়ালাম্‌॥

আমি কোন প্রাণের প্রেমিকও না (৪)। সেই প্রথম, সেই শেষ, সেই প্রকাশিত, সেই অস্পষ্ট। তাহাকে ছাড়া কাহাকেও জানি না (৫)। যখন "দুই নাই" (অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু কিছু নাই) করিলাম, দুই জগতে একই দেখিলাম। একই দেখি, একই অনুসন্ধান করি, একই পড়ি, একই জানি (৬)। হে সাম্‌ছে তেব্‌রিজ্, সতর্ক হও। কেন এ পৃথিবীতে এত মাতলামি কর ? আমি মত্ত এবং অজ্ঞান হওয়া ছাড়া কিছুই জানি না অর্থাৎ তাহার প্রেমে পাগল হওয়া ছাড়া আর কিছুই জানি না (৭)।"

---

(৪) মা কানাম্ লা মা কাঁ বাসাদ্
নেশানাম্ বে নেশা বাসাদ্।
না তন্ বাশাদ্ না জান্ বাশাদ্
না বাশাদ্ এসস্কে জানানাম্॥

(৫) হুয়াল্ আউয়াল্ হুয়াল্ আখের্
হুওয়াজ্জাহের্ হুয়াল্ বাতেন্।
বোজোজ্ ইয়াহু ও ইয়ামানহু
দেগার্ চিজে নামিদানাম্॥

(৬) দুয়ীবা চুঁ বদর্ কারদাম্
একে দিদাম্ দুয়ালাম্‌রা।
একে বিনাম্ একেজুইয়াম্
একে খানাম্ একেদানাম্॥

(৭) আলাইয়া সাম্‌ছে তেব্‌রিজ্
চেরামস্তি দরি আলম্।
বোজজ্ মছ্‌তি ওমাদহুসি
দেগার্‌চিজে নামিদানাম্॥

অতএব ইহা বেশ বলা যাইতে পারে যে, ভেদজ্ঞান দূর হইলে পরম শান্তি লাভ হয়, ইহা মুসলমানধর্ম্মেরও অভিমত।

এইরূপে পৃথিবীতে যে চারিটী প্রধান ধর্ম্ম আছে, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা গেল, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য এক এবং পরিণামও এক। নিম্নস্তরে বিভিন্ন ধর্ম্মের সাধন-প্রণালী বিভিন্ন প্রকার, এবং তজ্জন্য লোকে সাধারণ-দৃষ্টিতে দেখে যে, ইহাদের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। বস্তুতঃ, যতদিন প্রকৃত সাধ্য বস্তুর উদ্দেশ না পাওয়া যায়, যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, ততদিন লোকে এইরূপই ভাবিয়া ও বুঝিয়া থাকে। আর, এই সকল ধর্ম্মের নিম্নস্তরে সাধন-প্রণালী এক প্রকার হইতেও পারে না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে এই সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল (১)। সুতরাং উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণতি যখন এক, তখন অবস্থাভেদে আচার-ব্যবহার ও সাধন-পদ্ধতির যে পার্থক্য আছে, শুধু তাহার জন্য পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ করা উচিত নহে। সাধকগণ সরলপ্রাণে সাধনা করিয়া ক্রমশঃ যদি উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, তাঁহারা ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইয়া অবশেষে একই পরমানন্দময় অবস্থায় মিলিয়া যাইতেছেন।

---

(১) একই সময়ে, একই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ মিল নাই, এবং একই ভাষা বলেন এ প্রকার বিভিন্ন-জেলাবাসী লোকদের কথ্য ভাষায় অনেক পার্থক্য আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। একই স্থানে পূর্ব্বকালের এবং পরবর্ত্তী কালের আচার-ব্যবহারের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায়, বহুকালের ব্যবধানে ও বিভিন্ন স্থানে, যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে সকলের আচরণে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে?

সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি না আসিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না, সুতরাং পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। যে ব্যক্তির স্বজাতীয় জীবের প্রতি অর্থাৎ মানুষের প্রতিই সমদর্শন আসে নাই, তাহার আবার সর্ব্বজীবে সমদর্শন কোথা হইতে আসিবে? ধর্ম্মের মূল সূত্র ধরিয়া বিচার করাতে, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছি যে, স্বরূপতঃ সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এবং পরিণতি এক। এইরূপভাবে চিন্তা করিলে সকল মানবের মধ্যে অকপট মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে, এবং যদি তাহা হয়, তবে সর্ব্ব ভূতে সমদর্শন লাভ করার পথ সুগম হয়। এইরূপে, যখন বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনে সর্ব্ব প্রকার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়, তখনই সাধকের পরা শান্তি লাভ হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:•❀•:—

পল্লী শান্তি।

ফাল্গুন মাস, পূর্ণিমার রাত্রি। চাঁদের অমিয়-কিরণমালা গায়ে মাখিয়া, মলয়-সমীরণ-রূপ নিশ্বাস-পবনে নব-বিকশিত কুসুমরাশির সুগন্ধ-ভাণ্ডার দিগ্‌দিগন্তে বিতরণ করিতে করিতে, মা বসুমতী আজ প্রাণ খুলিয়া নীরব হাঁসির ছটা ছড়াইতেছেন। চতুষ্পার্শ্বে হরিৎ বর্ণের পোষাক-পরা তরু-লতা-ঘেরা গ্রামগুলি ঘুমের ঘোরে সুখের স্বপন দেখিতেছে, আর মধ্যস্থলে শ্যাম-শষ্প-মণ্ডিত জ্যোৎস্না-ধৌত বিশাল প্রান্তর প্রশান্ত বক্ষঃস্থল পাতিয়া দিয়া, নীরবে যেন চাঁদের পানে চাহিয়া, শুইয়া আছে। এমনি সময়, যাঁহার হৃদয় পুণ্যসলিলা গঙ্গার মত পবিত্র,—যাঁহার হৃদয়ে পরপীড়নের প্রবৃত্তি, ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থ ও জঘন্য-ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার লালসা, দেখা দেয় নাই—এমন কোন দেবচরিত্র মানব আসিয়া যদি এই প্রান্তরের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়েন, তখন তাঁহার প্রাণে কি ভাবের সঞ্চার হয়? তিনি ভাবেন, তিনি যেন কোন স্বপ্ন-কল্পিত রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে প্রকৃতি-দর্পণে তাঁহারি হৃদয়ের শান্ত নির্ম্মল সুখময় ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। ভিতরে শান্তি বাহিরে শান্তি, ভিতরে আলো বাহিরে আলো, ভিতরে সৌরভ বাহিরে সৌরভ, ভিতরে সৌন্দর্য্য বাহিরে সৌন্দর্য্য, ভিতরে নীরবতা বাহিরে নীরবতা—ভিতরে বাহিরে মিলিয়া সব যেন এক হইয়া গিয়াছে! তিনি যে কি, তিনি যে কে, তিনি কোথায় আসিয়াছেন, তিনি আছেন কি নাই, এসব কিছুরই যেন বোধ নাই। আছে কেবল আনন্দের অনুভব,—সুনির্ম্মল আনন্দ—ভিতরে আনন্দ, বাহিরে আনন্দ—কোথায়ও নিরানন্দের ছায়া মাত্র নাই। কত দিন যাইবে

কত রাত্রি যাইবে, কত মাস যাইবে কত বৎসর যাইবে, কিন্তু এই শান্তির—এই আনন্দের—মধুময় চিত্র তাঁহার চিত্ত-পটে চিরদিন একইরূপে অম্লানভাবে প্রকটিত থাকিয়া, তাঁহার আনন্দ অফুরন্ত করিয়া রাখিবে।

সাধক, এ চিত্র কি দেখিলে? তুমিও ত চলিয়াছ ঐরূপ চির-আনন্দময় রাজ্যে বাস করিবার জন্য। তোমার ভিতরে কোলাহল বাহিরে কোলাহল, ভিতরে কালিমা বাহিরে কালিমা, তোমার প্রাণ অস্থির, তুমি চাও চির শান্তি। দেখ, ভিতরের গোল না থামিলে বাহিরের গোল থামিবে না, ভিতরের কালিমা না গেলে বাহিরের কালিমা মুছিবে না। নিজে শান্ত হও, সব শান্ত হইয়া যাইবে। তোমার ইন্দ্রিয়সকল মাংসাশী পশুকুলের ন্যায় দুর্দ্দান্ত, তাহারা কলুষিত বিষয়সুখ ভোগের জন্য চঞ্চল, তাহারা তোমাকে স্থির হইতে দিতেছে না। তুমি যদি তা'দের কথা শোন, তা'দের কথামত কাজ কর, তবে আর রক্ষা নাই; তাহারা চিরদিনের তরে তোমাকে কেনা গোলাম করিয়া রাখিবে, তোমার সমস্ত ধন অপহরণ করিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার দিন যাইবে। তোমারই দেহের মধ্যে ওদের বাস, ওরা যে তোমারই প্রজা। তুমি রাজাধিরাজ পরমাত্মার সন্তান, তুমি রাজপুত্র, তুমি দুর্ব্বল নও। উহাদিগকে আর বিদ্রোহাচরণ করিতে দিও না, সবলে উহাদিগকে দমন করিয়া উহাদিগকে প্রজার উপযুক্ত কাজে লাগাইয়া দাও, তোমার সাধনার সহায়তা করিবার জন্য উহাদিগকে নিযুক্ত কর। এরূপ করিলে, ক্রমশঃ তোমার সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইবে, জ্ঞানালোক চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া দেহাত্মবুদ্ধি-রূপ অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিবে, তোমার মন ও বুদ্ধি উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া অবশেষে তোমাকে আনন্দময় ব্রহ্মসত্তায় বিলীন করিয়া দিবে।

সাধক, তুমি ভোক্তা ও জগৎ তোমার ভোগ্য, এ জ্ঞান ত্যাগ কর। চক্ষু ভিতরের দিকে ঘুরাও, অন্তরাত্মার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াও। সেই অনন্ত আনন্দের খনি পশ্চাতে ফেলিয়া, দিগ্‌দিগন্তব্যাপী আঁধারের দিকে কোথায় ছুটিয়াছিলে? বাহিরে যে বহু,—অজ্ঞান-সমুদ্রে অসংখ্য তরঙ্গ উঠিয়া কি কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে! জন্ম, মৃত্যু, শোক, তাপ, ব্যাধি, বাসনা, বাসনার নাশে বিষাদ ও ক্রোধ, তাহার ফলে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ও বিবাদ—এরাই না বাহিরে প্রবল-প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে! ছোট বড় কত তরঙ্গ অবিরাম উঠিতেছে—পরস্পরকে প্রহার করিতেছে—ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! আবার উঠিতেছে—আবার ঘাত-প্রতিঘাতের পর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! আঁখি ফিরাও, অন্তর-রাজ্যে দৃষ্টিক্ষেপ কর, অন্তরাত্মার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তিনি যে কোটি সূর্য্য জিনিয়া সমুজ্জল, কোটি চন্দ্রের সুধা ধারার ন্যায় সুশীতল, অচঞ্চল, চির-স্থির আনন্দ-নিকেতন! তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তাঁহার শোক নাই, তাপ নাই, ক্ষয় নাই! সেই সমুজ্জ্বল অকলঙ্ক চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া থাক,—সকল ক্ষুধা, সকল তৃষ্ণা, সকল জ্বালা, সকল অভাবের নিবৃত্তি হইবে। তাঁহাকে নয়ন ছাড়া করিও না, দেখিবে তোমার দেহে আরোপিত ক্ষুদ্র 'আমিত্ব'জ্ঞান-রূপ উপাধি, যাহা সংসারের ক্ষণিক সুখের চমক দেখাইয়া তোমাকে বাঁধিয়াছিল--তোমাকে ক্ষুদ্র করিয়া সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল—তাহা দূর হইয়াছে। আগে যাহা বাহির মনে করিতে এখন একবার সে দিকে চাও, দেখিবে সেখানে সকল বস্তুর ভিতরে সেই একই চিদানন্দময় সত্তা ভাসিতেছে। ক্রমে দেখিবে চক্ষু আরও পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে, দেখিবে বহু জীব ও বহু বস্তু রূপে যাহা বোধ হইতেছে তিনিই সে সব হইয়াছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নাই; স্থূল বল, সূক্ষ্ম বল, কারণ বল, কারণাতীত বল সবই তিনি! এইরূপে অসামঞ্জস্যের

মধ্যে সামঞ্জস্য, বহুত্বের মধ্যে একত্ব, উপলব্ধি করিতে করিতে দেখিবে একই সমুদ্রপৃষ্ঠে জলরাশির কিয়দংশ লহরীলীলায় ফুটিয়া উঠিয়া ক্ষণকাল খেলার পর সেই সমুদ্রের বক্ষেই ঘুমাইয়া পড়িতেছে! সাধনার বলে চোখের ময়লা কাটিয়া গেলে, চোখে যখন সব ঠিক ঠিক দেখিতে পাইবে, তখন দেখিবে আগে নানা জিনিস নানা ভাব তোমার হৃদয়ে জাগাইয়া দিত, এখন সে নানাত্ব দূর হইয়াছে, এখন সকলেই এক ব্রহ্ম-সত্তারূপে, এক ব্রহ্মের বিভূতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে! তুমিও সেই সত্তারই একাংশ, সুতরাং তুমিও পৃথক্ বস্তু নহ। বহুত্বের এই একত্বে পর্য্যবসানে ভয় ও দুঃখ সকলই বিদূরিত হওয়ায়, এখন এক আনন্দ ছাড়া আর কিছু নাই। আগে যাহা দুঃখ দিত, এখন তাহার গভীর তলদেশ হইতে ব্রহ্মসত্তা-বোধ-রূপ এক আনন্দ-তরঙ্গ উঠিয়া, তাহা আনন্দময় করিয়া তুলিতেছে।

সাধক যতক্ষণ ত্রিগুণের অতীত অবস্থায় না পৌছেন ততক্ষণ এই অবস্থা আসে না। জীব যতক্ষণ গুণের অধীনে আছে ততক্ষণ তাহার সুখ ও দুঃখ অনিবার্য্য। আত্মার ধ্যানে প্রগাঢ়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধকের সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের প্রভাব মন্দীভূত হইতে থাকে, অবশেষে তিনি শুদ্ধ আত্মরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে, ইহারা আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন তাঁহার আসক্তির নাশের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনের ধারণা একেবারে মুছিয়া যায়, তিনি দেখেন যে, তিনি নিজের স্বরূপজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, তাই তিনি আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়া দুঃখ পাইতেছিলেন, নচেৎ তিনি চিরদিনই শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। ভ্রান্তি তিরোহিত হওয়ায় তিনি তখন কেবল দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থিত হয়েন। সাগরতীরে দণ্ডায়মান দর্শক যেমন সাগরপৃষ্ঠে উত্তাল-তরঙ্গমালার খেলা দেখিয়া আনন্দিত হয়েন, তেমনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত ব্যক্তি ব্রহ্মসমুদ্রে ব্রহ্মের লীলা-লহরীরূপে জগদ্ব্যাপার-

সমূহ দর্শনে পুলকিত হয়েন। তত্ত্বজ্ঞানের বিমল আলোকে তিনি সকলই এক অভিনব ভাবে মণ্ডিত দেখেন। যাহা কিছু দেখেন, যাহা কিছু অনুভব করেন, সবই আনন্দময় ব্রহ্ম (১) বলিয়া প্রত্যক্ষ করেন। এই জ্ঞানের তিরোধান তাঁহার কখনও হয় না, সুতরাং তাঁহার শান্তির কখনও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ইহাই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখের চিরনিবৃত্তি—ইহাই পরা শান্তি। ইহার জন্যই সাধনা। ইহাই সাধনার অমৃতময় চরম ফল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

---

(১) শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে বলিয়াছিলেন :—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। মধ্যলীলা। অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অভিমত।

—:০:—

১। বঙ্গমাতার সুসন্তান, "গীতায় ঈশ্বরবাদ" "বেদান্তপরিচয়" ইত্যাদি গ্রন্থপ্রণেতা, ব্রহ্মবিদ্যা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্. এ. বি. এল্, লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ প্রণীত 'চক্ষুদান বা সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য' পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার মহাশয় সদ্গুরুর শিষ্য। তাঁহার গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহারই উপদিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া, তিনি এই গ্রন্থে সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার উদ্যম নিষ্ফল হয় নাই।

গ্রন্থকার বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন যে, জগতের অশেষ বৈষম্যের মধ্যে সাম্য স্থাপনই প্রকৃত দর্শনের লক্ষ্য এবং তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারাই ঐরূপ দর্শন লাভ হওয়া সম্ভব। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থখানি এই উদার সমন্বয়ের ভাবে ভাবিত। ষড়্দর্শনের সমন্বয়, তন্ত্রপুরাণের সমন্বয়, বেদবেদান্তের সমন্বয়—অধিকন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়—বহু পাণ্ডিত্য ও গবেষণার প্রয়োগ করিয়া, গ্রন্থকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সাধনাঙ্গের আলোচনায়, ব্রহ্মচর্য্য, কর্ম্ম, উপাসনা, ভক্তি, পঞ্চমকার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য কথা নিবদ্ধ হইয়াছে। স্বরূপ জ্ঞানের প্রসঙ্গে উপনিষদের ঋষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার ব্রহ্ম, মায়া, জীবাত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি চরম তত্ত্বের সরল অথচ সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। ফলতঃ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়া বাংলার দার্শনিক সাহিত্যের সম্পৎ-পুষ্টি করিয়াছে। সেইজন্য আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

২। দিনাজপুর জজ্কোর্টের স্বনামখ্যাত উকিল সাধকশ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আপনার রচিত বৃহৎ পুস্তক আপনার সম্মুখেই দেখিয়াছি এবং প্রীতিলাভ করিয়াছি। স্থানে স্থানে দুই চারিটী কথা ও বচন-প্রমাণ সংযোগ করিয়া দিবার স্বাধীনতাও আপনি আমাকে দিয়াছিলেন। আর্য্যধর্ম্মের স্বরূপ ও তত্ত্ব বহু শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম হয় না। সকলের পক্ষে তাহা সহজ নহে, একারণ পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি ঐ প্রকার গ্রন্থের আরও প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনার এই গ্রন্থ দ্বারা অনেক পরিমাণে ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। আপনি অনন্যমনে যেরূপ চিন্তা ও গবেষণার সহিত এই সারগর্ভ গ্রন্থ সুশৃঙ্খলভাবে রচনা করিয়াছেন সেরূপ চিন্তা ও গবেষণা করিবার ধৈর্য্য, সুবিধা ও প্রবৃত্তি সুধীগণের মধ্যেও দুর্লভ। গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। যাঁহার সমগ্র পুস্তক পাঠের সময় বা সুবিধা হইবে না, তিনিও এই বিবরণ পাঠ করিলে গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে বুঝিতে পারিবেন।

আপনার এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি-গণের বিশেষ উপকার হইবে, তজ্জন্য আপনি সকলের ধন্যবাদার্হ। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি এই গ্রন্থ এবং আরও পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া সংসারের হিতসাধন ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হউন।

৩। অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ও সাধকাগ্রগণ্য ধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বনিধি মহাশয় কাশীধাম হইতে লিখিয়াছেনঃ—

শ্রীমন্নিত্যানন্দ চৈতন্যঘন শ্রীসাধু মহারাজের শিষ্য ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ কৃত "চক্ষুদান" বা "সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য" নামক গ্রন্থখানি পাঠে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। বহুদিন যাবৎ প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এ

দেশের লোকের অনেকেরই ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা আছে বলিয়া বুঝিয়াছি এবং ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে যে বিদ্বেষের আভাস পাইয়াছি, তাহা দূরীকরণার্থ ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য বিবৃত করিয়া এক খানা গ্রন্থ লেখা আমার নিজেরই অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, ইহা দ্বারা আমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, সুতরাং আমার আর লিখিবার প্রয়োজন থাকিল না। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সরল ভাষায় অল্প কথায় এত স্পষ্টভাবে ও নির্ভীকহৃদয়ে প্রকাশ করিতে কাহাকেও বড় দেখি না। সত্যের আলোকে সকল ধর্ম্মের সার ও মূলতত্ত্ব ধরিয়া, সমুদয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কেই মিত্রতায় এক সাধারণ ক্ষেত্রে মিলিত করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ সাধনের বিষয়ও ইহাতে বিশেষ-ভাবে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার একজন শিক্ষিত, নিরভিমান ও সাধনপরায়ণ লোক। তিনি এক সময়ে কোন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; কিছুদিন হইল সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক কাশীধামে আসিয়া তিনি তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চায় আনন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে মিশিয়াছেন, সেই বহুদর্শিতার ফল তাঁহার গুরূপদেশের সারাংশের সহিত যুক্ত হইয়া এই গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভাব অমার্জ্জিতবুদ্ধি নিম্নস্তরের লোককে কিঞ্চিৎ সাহায্য করে সত্য, কিন্তু দীর্ঘদিন উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে তাহার বুদ্ধি ঐ ভাবে ভাবিত হইয়া যায়, আর উচ্চস্তরের গবেষণায় তাহার প্রবৃত্তি আসে না বা সামর্থ্য থাকে না। তজ্জন্য এ দেশে এই ধরণের গ্রন্থ যত প্রচারিত হইবে ততই মঙ্গল। গ্রন্থকার তাঁহার ভাবসমূহ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আশা করি, দেশের কল্যাণের জন্য ভবিষ্যতে তিনি ধর্ম্মের রহস্যসকল লোকসমাজে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিবেন।

৩। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত নড়রা গ্রামনিবাসী প্রবীণ সাধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদুর্ল্লভ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিশারদ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

সংসারবিরাগী সাধকপ্রবর শ্রীমদ্ ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণ প্রণীত "চক্ষুদান" প্রকৃতই চক্ষুদান। ইনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভের যে উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য এবং যোগমার্গ-পরিচালিত গুরুগণের সিদ্ধান্তসম্মত। বিশেষতঃ, উপনিষৎ দর্শন পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে একই রহস্যে বিজড়িত, একের উপাসনাই যে সকলে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রণালীতে করিতেছেন, একেরই স্বরূপ যে নানা লীলায় নানাপ্রকার হইয়া রহিয়াছেন, তাহা ইনি বেশ সুসিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, যিনি যে সম্প্রদায়েরই হউন, তাঁহার সমস্ত ধাঁধা বা সংশয় মিটিয়া যাইবে। তন্ত্রের মত, পুরাণের মত, ইনি কোন বিশেষ কাম্যসাধন কথার সিদ্ধান্ত করেন নাই, তাহা খণ্ডন বা মণ্ডন কিছুই করেন নাই, কেবল যাহা বলিবার, যাহা ঋষিগণের গন্তব্য নিষ্কাম নির্ব্বাণপন্থা, তাহাই ইনি বলিয়াছেন। ভারতের ধন সব, পরম রত্ন সব, কোথায় পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল, ইহা ইনি বেশ বুঝিতে পারিয়া, আর্য্য ঋষিগণের পন্থা পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য, এই পুস্তকের অবতারণা করিয়াছেন।